যখন পুলিস ছিলাম

ধীরাজ ভট্টাচার্য

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৩৬১

দ্বিতীয় মুদ্রণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২

তৃতীয় সংস্করণ—অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪

ডিসেম্বর, ১৯৫৭

প্রকাশক

জে. এন. সিংহ রায়

নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ

২২, ক্যানিং স্ট্রীট

কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট

অজিত গুপ্ত

মুদ্রক

রণজিৎকুমার দত্ত

নবশক্তি প্রেস

১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড

কলিকাতা-১৪

তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

দু'চার কথা

মামুলী ভূমিকা এ নয়। কাহিনী পড়বার আগে আমার কয়েকটি কথা সুধী পাঠকদের জানিয়ে রাখতে চাই। 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশের সময় থেকে এখন পর্যন্ত বহু কৌতূহলী পাঠকের চিঠি আমি পেয়েছি ও পাচ্ছি। সবার ঐ একই জিজ্ঞাসা—এত দীর্ঘদিন বাদে এ কাহিনী আমি কেন লিখতে গেলাম। আমি বলতে চাই—এর আগে ইচ্ছা বা অবসর থাকলেও পুলিস সম্বন্ধে ভেতরের ও বাইরের এত কথা আমি অকপটে ও এত সহজে লিখতে পারতাম না। কোনো পরাধীন দেশের লেখকের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। আর একটা কথা এখানে বলা দরকার—পুলিসকে সাধারণের চোখে হেয় বা অপদার্থ প্রতিপন্ন করবার উদ্দেশ্য নিয়েও এ কাহিনী আমি লিখিনি। কর্মক্ষেত্রে সর্ব স্তরেই ভালো-মন্দ লোক আছে-ই—সেই ভালো-মন্দের মাঝে আমি যে কতবড় অযোগ্য অপদার্থ—এক কথায় মিস ফিট—এইটেই হলো আমার কাহিনীর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা—এটা নিছক গল্প না সত্যি? সবার অবগতির জন্য তাই জানাই 'যখন পুলিস ছিলাম' আমার জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ কাহিনী। হয় তো অজান্তে কল্পনার রঙ একটু আধটু লেগেছে—তাতে কাহিনীর আকর্ষণ বেড়েছে না কমেছে সে বিচারের ভার সুধী পাঠকের ওপর।

রাতারাতি সাহিত্যিক খ্যাতি লাভের দুরাশা নিয়েও এ কাহিনী আমি লিখিনি। এটি লেখবার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। বন্ধুবর সাহিত্যিক শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে ছুটির দিনে প্রায়ই আড্ডা জমতো এবং এখনও জমে। বহু নাম-করা সাহিত্যিক ও রসিক জন-সমাগমে সরগরম সেই আড্ডায় বেমানান হলেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাকে উপস্থিত থাকতে হতো—এবং রস পরিবেষণের খানিকটা অংশও নিতে হতো। সেই আসরে আমার পুলিসি অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে কয়েকটা গল্প বলতাম।

সবাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন প্রশংসায় ও আমাকে লেখবার জন্য বারবার অনুরোধ করতেন। সাহস বা অবসরের অভাবে ইচ্ছা থাকলেও এতদিন হয়ে ওঠেনি। আজ সাহস না থাকলেও প্রচুর অবসর—তাই ভয়ে ভয়ে তিন চারটে পরিচ্ছেদ লিখে ফেললাম এবং একদিন 'দেশ' পত্রিকার প্রাণ পরম স্নেহাস্পদ শ্রীসাগরময় ঘোষকে চুপি চুপি বাড়িতে ডেকে এনে শুনিয়ে দিলাম। পড়া শেষ করে কোনো কথা না বলে লেখাটি পকেটে পুরে তিনি বললেন—আপনি বাকিটা লিখতে শুরু করুন—আমি 'দেশ' পত্রিকায় ছাপবো।

এত বড় একটা জটিল সমস্যা এত সহজেই সমাধান হয়ে গেল —প্রথমটা বিশ্বাস করতেই পারিনি—তারপর কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। ভগবান সাগরকে দীর্ঘজীবী করুন।

আজ আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন, তাই আমার হিতৈষী বন্ধুবান্ধব, শিল্পী, সাহিত্যিক সবাইকে জানাই আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা। আর একজনের কথা এখানে উল্লেখ না করলে আমার বক্তব্য অসমাপ্ত থেকে যাবে। সে হচ্ছে আমার অকৃত্রিম হিতৈষী উদীয়মান সাংবাদিক শ্রীমান সরোজ চক্রবর্তী। তার উৎসাহ ও পরিশ্রম বাদ দিলে এত শীঘ্র আমার বই প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। মুখের শুকনো ধন্যবাদ দিয়ে ঋণ শোধ করবার চেষ্টা না করে ওর কাছে তাই আমি ইচ্ছে করেই ঋণী হয়ে রইলাম।

তাং ১লা আষাঢ়,
—ললিত স্মৃতি—
৭২ হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রীট,
কলিকাতা-২৫

ধীরাজ ভট্টাচার্য

আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব—

৺ললিত মোহন ভট্টাচার্যের

পুণ্য শ্রীপাদপদ্মে—

বাবা—

ভাগ্যিস আমায় জোর করে পুলিসে ঢুকিয়ে ছিলেন—

আপনার ভাগ্যবান ছেলে

"ধীউ বাবা"

যখন

ছিলাম

রাত জেগে স্কুলের পড়া পড়তে পড়তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পরিষ্কার স্বপ্ন দেখলাম, লণ্ডনে বেকার স্ট্রীটে রবার্ট ব্লেকের ড্রয়িং রুমে বসে স্মিথের বোকামির জন্য তিরস্কার করছি। পাশের দরজার ফাঁক দিয়ে মিসেস বার্ডেল একটু উঁকি দিয়ে বোধহয় জানিয়ে দিয়ে গেল যে, সে সবই শুনছে। পায়ের কাছে বিরাটকায় টাইগার চোখ বুজে শুয়ে আছে ; সে যে ঘুমোয়নি, মাঝে মাঝে ল্যাজ নেড়ে তা জানিয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ রাত্রির বুক চিরে বাইরের কলিং বেলটা আর্তনাদ করে উঠলো। নিমেষে টাইগার লাফিয়ে উঠে কান খাড়া করে দাঁড়ালো, স্মিথের ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো। আর আমি নিঃশব্দে ড্রয়ার খুলে রিভলবারটা হাতে তুলে নিলাম। বেচারি বার্ডেল ভয়ে ভয়ে সবে মাত্র দরজা খুলে দিয়েছে এমনি পরম মুহূর্তে ঘুম ভেঙে গেল, ইস্!

চোখ মেলে দেখি মা কাছে দাঁড়িয়ে বকেই চলেছেন। ছোট ভাইবোনগুলো ঘুম-ফুলো চোখে পরম আনন্দে তা উপভোগ করছে। শুধু বাবা নির্লিপ্তভাবে বাইরের রকে পায়চারি করছেন। মায়ের বকুনি কোনোদিন আমাকে বিশেষ দমাতে পারেনি ; একটু ভালো করে চেয়ে দেখি মা'র হাতে রয়েছে পাঠ্যপুস্তকের নিচে লুকিয়ে রাখা দীনেন্দ্র রায়ের রহস্যলহরী সিরিজের 'বুদ্ধির যুদ্ধ', এবার সত্যিই লজ্জা পেলাম আর দমেও গেলাম। পরীক্ষার পড়ার ছুতোয় ছোট ভাইবোনদের এমনকি মাকেও কম যন্ত্রণা দিইনি। পড়ার সময় কাউকে ঘরেই ঢুকতে দিতাম না। তাছাড়া দোকান বাজার ফাই ফরমাশ সব খেটেছে ছোট ভাইবোনেরা। রাত জেগে পড়ার জন্য উঠতে দেরি হবেই—কাজেই সকাল থেকে আমার ঘরের আশেপাশে কারু জোরে কথাটি পর্যন্ত বলবার উপায় নেই।

আজ বোধহয় সুদ সুদ্ধ পেয়ে গেলাম। মা বলে চলেছেন, 'আর কাজ নেই লেখাপড়া শিখে, অনর্থক পয়সা নষ্ট। পরীক্ষার তিনদিনও নেই আর রাত জেগে হতভাগা পড়ছে বটতলার ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস?'

রহস্যলহরী যে বটতলার চেয়ে অনেক উঁচুদরের উপন্যাস এ প্রতিবাদ তখন করতে সাহস পাইনি।

এরই ফাঁকে ছোট বোনটা বলে উঠলো, 'জানো মা, কাল রাত্তে ইংরেজি পড়াটার একটু মানে করে দিতে যেই দাদাকে বলেছি, কি বকুনিটাই···।' সে আরো হয়তো বলতো, মা এক ধমকে থামিয়ে দিলেন—যা যা, হাত মুখ ধুয়ে পড়তে বসগে যা, একজন তো লেখাপড়া শিখে আমাদের রাজা করলো, এখন তোমরা বাকি।

তারপর মায়ের যত আক্রোশ পড়লো গিয়ে নিরীহ বাবার উপর—কতদিন বলেছি, একটু শাসন করো, অতো আস্কারা দিও না। তা তো হবে না, এখন ভোগো।

বেলা বেড়ে উঠতে লাগলো, আমার দিক থেকে কোনও প্রতিবাদ না পেয়ে মা গজ্ গজ্ করতে করতে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ছোটভাই বাজারের থলি ও কয়েকটা টাকা খাটের উপর রেখে নামতার মতো কি কি আনতে হবে না-হবে বলে গেল। প্রতিবাদ করে কোনও ফল নেই। আমি জানি পরীক্ষার ফল না বেরুনো পর্যন্ত এ নির্যাতন আমাকে সইতেই হবে। শুধু এতেই শেষ হলো না। রাত জেগে পড়তে বসলেই মা প্রবলভাবে বাধা দিয়ে বলতেন, 'মিছিমিছি আর তেল পুড়িয়ে কাজ নেই—শুয়ে পড়ো।'

তবু সব হজম করে রাত জেগেই পড়তাম। অন্য সময় আমার পড়া হতো না। এরই মধ্যে একদিন বাবা সন্ধ্যেবেলায় কাছে এসে বসলেন, বুঝলাম নিশ্চয়ই কিছু বলতে এসেছেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বাবা বললেন, 'ধীউবাবা, (আমাকে বাড়িতে সবাই ধীরু বলে ডাকতো, শুধু বাবা ডাকতেন, ধীউবাবা বলে) বাইরের নাটক নভেল পড়তে আমি বারণ করিনে, ওতে জ্ঞান বাড়ে, কিন্তু পরীক্ষার সময় এগুলো নাই বা পড়লে। এরপরে অঢেল সময় পাবে।'

সেইদিন শুধু বলেছিলাম, 'রোজ আমি পড়ি না বাবা, ঐ বইটা তারপরদিন ফেরত দিতে হবে বলে...' আর বলতে পারলাম না। এতদিনের জমে ওঠা অভিমান ভিড় করে গলার কাছে এসে আমার বাক্‌রোধ করে দিলে। সস্নেহে আমার গায়ে কিছুক্ষণ হাত বুলিয়ে বাবা বলেছিলেন, 'জানি, নইলে প্রতি পরীক্ষায় তুমি প্রথম বা দ্বিতীয় ছাড়া হওনি। একি শুধু বাইরের উপন্যাস পড়ে হয়? মায়ের কথা মনে করতে নেই।'

সেদিনকার কথা আমি জীবনে ভুলতে পারবো না।

এর পরের ছ' তিন বছরের ঘটনা যেমনি সংক্ষিপ্ত তেমনি বৈচিত্র্যহীন। মধ্যবিত্ত সংসারের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একঘেয়ে ইতিহাস; তার সঙ্গে আমার বক্তব্যের বিশেষ যোগ নেই বলে এড়িয়ে গেলাম।

ভালোভাবে ম্যাট্রিক পাশ করে আশুতোষ কলেজে আই. এস-সি. ক্লাশে ভর্তি হলাম। মা-বাবার আন্তরিক ইচ্ছা হয় ডাক্তার নয় ইঞ্জিনীয়ার হবো। বলা বাহুল্য রহস্যলহরীর এখন আমি নিয়মিত গ্রাহক। আর লুকিয়ে পড়বার দরকার হয় না।

এই সময় এমন একটা ঘটনা ঘটলো, যা আমার ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। আমার বড়দা দৌলতপুর কলেজে বি-এ. (ফোর্থ ইয়ারে) পড়ছিলেন। পরীক্ষার বিশেষ দেরি নেই, আমারও সেকেণ্ড ইয়ারের টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষার ফিজ পর্যন্ত জমা দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ বড়দা বাড়ি চলে এলেন। বললেন, 'আজ আট দশ দিন যাবৎ জ্বর, মোটেই রেমিশন হয় না।' যথারীতি এখানকার ডাক্তার দেখানো হলো, কিন্তু সে জ্বর আর রেমিশন হলো না। ঠিক পঁচিশ দিনের দিন বড়দা মারা গেলেন। আমার জীবনে সব কিছুর আদর্শ ছিলেন আমার বড়দা, তাঁর বিষয়ে বিশদ লেখার স্থান এ নয়, আমিই এগিয়ে যাই।

মা শোকে শয্যা নিলেন। আমরাই জোর করে তাঁকে খাওয়াই, শুধু বাবার বাহ্যিক কোনো পরিবর্তন দেখতে পেলাম না। বড়দা মারা যান ভোরে, সব কিছু ব্যবস্থা করে আমরা যখন শব

নিয়ে শ্মশানে গেলাম তখন বেলা সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে। ফিরে এসে শুনি বাবা নিয়মিত এগারোটায় স্কুলে গিয়ে ছেলেদের পড়িয়েছেন ঠিক নিয়মিত হাসিগল্পের মধ্য দিয়ে। বেলা একটার সময় হেডমাস্টার মহাশয় খবরটা কার কাছ থেকে শুনে হন্তদন্ত হয়ে এসে দেখেন বাবা ক্লাশে পড়াচ্ছেন। খানিক অবাক হয়ে থেকে তিনি বললেন, ললিতবাবু, আপনি আজও স্কুলে এলেন ?'

হেসে বাবা জবাব দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, যার জিনিস তিনি নিয়েছেন, এতে দুঃখ করবার কী আছে। তাছাড়া বাড়ি বসে হা হুতাশ না করে ছেলেদের নিয়ে বেশ ভুলে আছি। এতে অবাক হবার কি আছে ?'

বাবা ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিউশনের বাংলা সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন।

এর পরে বাড়ি আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠলো। রাতদিন মায়ের কান্না, ছোট ভাইবোনদের বিষণ্ণ মুখ, বাবার মৌন স্তব্ধতা সব মিলে আমাকে কেমন করে দিলো। বড়দার জন্যে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার ফুরসৎ আমি পেলাম না। কলেজ বন্ধ, সময় কাটানো দুষ্কর হয়ে উঠলো। ঠিক করলাম, আর পড়বো না। ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। রাত্রে ফিরে যাহোক কিছু খেয়ে শুয়ে পড়ি। ঘুমোতে পারি না, কি অসহ্য অবস্থা।

এরই মধ্যে একদিন এক বন্ধু বায়োস্কোপ দেখাতে নিয়ে গেল এম্প্রেস্ থিয়েটারে (বর্তমান রূপালী সিনেমা)। ম্যাডান কোম্পানির তোলা নির্বাক ছবি 'Tara the dancer'। যেমন জঘন্য গল্প তেমনি বিচিত্র তার চিত্ররূপ এবং ফটোগ্রাফি। আমার জেদ চেপে গেল ছবিতে অভিনয় করবার। শুনে সঙ্গের বন্ধুটি তো হেসেই খুন। একে তখন বিশ্রী রোগা চেহারা তার উপর ছবির অভিনয় সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। কাজেই তাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সে গিয়ে আরো জানা অজানা সবার কাছে খবরটা রাষ্ট্র করে দিলো। ফলে ব্যাপারটা খুব জটিল হয়ে পড়লো। আমি যেন সবার কাছে একটা হাস্যকৌতুকের উৎস হয়ে উঠলাম। জেদ আরো বেড়ে গেল। কি করি, বাড়িতে তো

কিছুতেই মত দেবে না। আর তখনকার দিনে সতেরো আঠারো বছরের ছেলে বায়োস্কোপ করে শুনলে লোকে আঁতকে উঠতো। তারপর ঘৃণা ও অবজ্ঞার এমন একটা চাউনি দিতো যা সহ্য করে সমাজে বাস করার চেয়ে জেল খাটা শ্রেয় মনে হতো।

স্কুলে পড়বার সময়ে খাবারের পয়সা জমিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি তুলি। অনেক চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর সেগুলো তখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় সাপ্তাহিক "সচিত্র শিশির"-এ ছাপা হয়। সেই হলো একমাত্র ছাড়পত্র বা প্রশংসাপত্র। ম্যাডান কোম্পানিতে তখন পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম বাংলা ছবি তুলছেন—'সতীলক্ষ্মী'। খবরটা অতিকষ্টে সংগ্রহ করে একদিন ঐ একমাত্র প্রশংসাপত্র "সচিত্র শিশির" সঙ্গে করে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। কি জানি কেন ছবিগুলো দেখে তিনি তাঁর ছবিতে একটা বদমাশ চরিত্র বিনোদের ভূমিকা আমাকে দিলেন।

চরিত্রটি যা বুঝিয়ে দিলেন তা হচ্ছে—বিনোদ অতি নীচ ও জঘন্য স্বভাবের যুবক। বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে সে সতীলক্ষ্মী বন্ধু-স্ত্রীর উপর কদর্য দৃষ্টি দেয় ও কিসে তার সতী নাম ঘুচিয়ে পাপের পঙ্কিল পথে টেনে আনবে, তারই চিন্তায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে। বিনোদের সারা জীবনটাই এই ধরনের কার্যকলাপে পূর্ণ। শেষ পরিণতি দেখা যায়—একটা নিষ্পাপ সরলা বালিকা, যাকে যৌবনে বিনোদ প্রলোভনের ফাঁদ পেতে সর্বনাশের পথে টেনে এনেছিল, যার ফলে শেষ পর্যন্ত সে পাগল হয়ে যায়। সেই বালিকাই হঠাৎ একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে এসে দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার ধারে বিনোদকে একা পেয়ে তার চুল টেনে ধরে মাটিতে ফেলে তার বুকের উপর বসে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে পা ধরে টানতে টানতে গঙ্গার জলে ফেলে দেয়।

ভীষণ দমে গেলাম। প্রথম নেমেই এমন একটা চরিত্র! বাবা মা দূরের কথা, চেনাশোনা কেউ যদি এ চরিত্রে আমাকে পর্দায় দেখে, তাহলে···। আর ভাববার সময় পেলাম না। জ্যোতিষবাবু বললেন, 'এখনই ঠিক করে ফেলতে হবে। কাল থেকে সুটিং। আপত্তি থাকে তো এখনই বলুন, স্টেজের অনেক অভিনেতা এ ভূমিকাটির ওপর লুব্ধ দৃষ্টি দিয়ে বসে আছে।'

যা থাকে কপালে, রাজী হয়ে গেলাম।

রোজ সকালে বেরিয়ে যাই আর বাড়ি ফিরি সন্ধ্যে সাতটা আটটায়। এইভাবে প্রায় দশ বারো দিন স্যুটিং হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ একদিন মা জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'রোজ সকালে উঠে কোথায় যাস?'

আমতা আমতা করে আসল কথাটা এড়িয়ে সেদিনকার ফাঁড়া কাটালাম, পরদিন রাত্রে বাবাও জিজ্ঞাসা করে বসলেন। বিপদ হলো সেখানেই, বাবার কাছে আমি মিথ্যা বলতে পারতাম না। একটু ইতস্তত করে সবই খুলে বললাম। সব শুনে বাবা গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছু বললেন না। পরদিন থেকে মা হাঙ্গার স্ট্রাইক করে বসলেন। বড়দার শোক এ ক'দিনে যা একটু কমে এসেছিল, আমার সিনেমায় ঢোকায় তা আবার দ্বিগুণ হয়ে উঠলো। রাত্রে শুনি মা বাবাকে বলছেন, 'তুমি কী? তুমি কি মানুষ? এক ফোঁটা ছেলে, ঐসব বাজারের মেয়েদের সঙ্গে রঙ মেখে নেচে কুঁদে বেড়াবে আর তুমি অম্লান বদনে তাতে মত দিলে? বেঁচে থেকে আমি এসব দেখতে পারবো না। আর ক'টা দিন সবুর করো আমি মরি, তারপর তোমাদের যা ইচ্ছা তাই করো।' উত্তরে বাবা কী যে বলেছিলেন শুনতে পাইনি।

সকালে বাবা ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'যা হবার হয়েছে, আর তুমি স্যুটিং করতে যেও না।'

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'এতখানি কাজ এগিয়ে গিয়েছে যে, এখন স্যুটিং বন্ধ করলে ওরা মহা বিপদে পড়বে। আর তা ছাড়া ক্ষতিপূরণের দাবি দিয়ে মামলাও করতে পারে।' অনেক চিন্তার পর ঠিক হলো, এই ছবিটার পর আর আমি কোনো ছবিতে অভিনয় করবো না, একথা মায়ের পা ছুঁয়ে বলতে হবে। তাই হলো। অগত্যা মা অন্নজল গ্রহণ করলেন, আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

'সতীলক্ষ্মী' ছবি বেরুলো। বাবা একদিন লুকিয়ে দেখে এসে তিন চারদিন গম্ভীর হয়ে রইলেন। কারো সঙ্গে ভালো করে কথা কইলেন না। বহু আত্মীয়স্বজন অযাচিতভাবে এসে মাকে ও বাবাকে তিরস্কার করে গেলেন, যথা—জেনে শুনে ছেলেটাকে পড়া বন্ধ

করিয়ে উচ্ছন্নের পথে ঠেলে দিলে। এর পর সমাজে তোমাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো কষ্টকর হবে সেটা ভেবে দেখেছো ? যেন মরমে মরে গেলাম। সবচাইতে দুঃখ, বাবা তিরস্কারের উত্তরে একটি কথাও উচ্চারণ করলেন না। নিজের বাড়িতেই যেন আমি একঘরে হয়ে গেলাম।

ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের (আই. বি.) একজন বড় সি. আই. ডি. অফিসারের বালবিধবা মেয়েকে বাবা গীতা এবং আরও কি সব ধর্মগ্রন্থ পড়াতেন। একদিন পড়িয়ে বাড়ি ফিরলেন একটু সকাল সকাল। অনেকদিন পরে প্রথম সেদিন বাবাকে একটু প্রফুল্ল দেখলাম। রাত্রে বাবার ঘরে ডাক পড়লো। গিয়ে দেখি মাও সেখানে বসে আছেন। বাবা কোনোরকম ভূমিকা না করেই বললেন, 'ধীউবাবা, তোমাকে পুলিসে ঢোকাবার সব ব্যবস্থা করে এলাম।'

হঠাৎ কথাটা শুনে কেমন হকচকিয়ে গেলাম। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মা একেবারে জ্বলে উঠলেন, 'ভেবেছো বায়োস্কোপ করে বেড়াবে ? তা হবে না। নয়তো ফের তোমাকে কলেজে ভর্তি হতে হবে।'

বাবা স্নিগ্ধ হাস্যে মাকে চুপ করতে বললেন। তারপর আমাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'তাই করো তুমি। আর এ বয়সে এত খাটতে আমি পারি না। তুমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারো তাহলে আমার মস্ত লাভ।'

দ্বিধা আমার তখনও রয়েছে, সিনেমা থেকে পুলিস ? বাবা বললেন, 'আর পুলিস লাইনটাকে অতো খারাপ ভাবছো কেন ? পুলিসে কি ভালো লোক নেই ?'

সম্মতি দিলাম। আর না দিয়েও কোনো উপায় ছিলো না আমার। কোনো কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকা আর সহ্য হয় না!
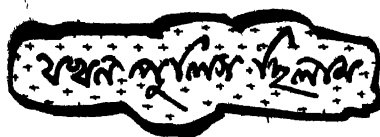
এখন আমি পুরোপুরি পুলিস, আই. বি-তে (এই ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কাজ হলো যারা স্বদেশী করে তাদের উপর কড়া নজর রাখা) রীতিমতো watcher বা ডিটেক্‌টিভ। রোজ সাড়ে দশটায় একবার আপিসে যাই (১৩ নং লর্ড সিংহ রোড)। সেখানে ডিউটি কী এবং কোথায় সব জেনে বেরিয়ে পড়ি। মাঝে মাঝে সিনেমা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে রবার্ট ব্লেক ও রিভলবার দেখে হতাশ হয়ে যেতো। মনের মধ্যে বেশ খানিকটা গর্বও অনুভব করতাম। আগেই বলেছি, ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের আমি ছিলাম পোকা। ছেলেবেলায় বই পড়ে সম্ভব অসম্ভব কত কল্পনাই যে করেছি! আজ হাতে হাতে তার পরীক্ষা দেবার সুযোগ পেয়ে আনন্দে ও গর্বে কেমন দিশেহারা হয়ে গেলাম। ভাবলাম বাংলাদেশেও যে রবার্ট ব্লেকের চেয়ে বড় ডিটেক্‌টিভ হতে পারে, ভগবান বোধহয় আমাকে দিয়েই তা প্রমাণ করবেন।

আমাদের প্রথম ডিউটি পড়লো কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের পাশে একটি প্রসিদ্ধ খদ্দরের দোকানে। দোকানটির উপর অনেকদিন ধরেই পুলিসের নজর ছিলো। সেখানে নাকি বড় বড় সব স্বদেশী চাঁইরা এসে মিলিত হতো এবং বঙ্গমাতাকে ইংরাজের শাসনমুক্ত করার শলাপরামর্শ চলতো। আমার সঙ্গে আরও তিনজন ছিলো। দোকানের উল্টোদিকের ফুটপাথের উপর আমরা নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে পায়চারি করে দোকানে কে আসে যায় নজর রাখতাম। আর বিশেষভাবে বলা ছিলো যে, যদি পুলিসের তালিকাভুক্ত কোনো বিশেষ নেতা আসেন তাহলে তাঁকে যেভাবে হোক অনুসরণ করতে, কোনোক্রমেই যেন তিনি নজর এড়িয়ে না যেতে পারেন। তিন চারজনকে একসঙ্গে দেওয়ার উদ্দেশ্যই হলো যাতে দু'-একজনের চোখে ধুলো দিলেও সবাইকে ফাঁকি দিতে না

পারে। আমাদের উপরওয়ালার নির্দেশ ছিলো যেন কোনোক্রমেই অপর পার্টি (Suspect) বুঝতে বা চিনতে না পারে যে, আমরা পুলিসের লোক তাদের ওপর নজর রেখেছি। বলা বাহুল্য আমাদের পোশাক-আশাক সাধারণ ধুতি, সার্ট বা পাঞ্জাবি, শুধু কোমরে কাপড়ের নিচে থাকতো একটা ছ'ঘরা গুলীভর্তি রিভলবার আর মাদুলির মতো ছোট্ট একটা কৌটয় ছোট্ট একখানা কাগজ (Detective Warrant), বিশেষ বিপদে না পড়লে এর অস্তিত্ব সাধারণ পুলিসকে পর্যন্ত জানতে দেওয়া নিষেধ ছিলো। যদি কোনো লোককে অনুসরণ করতে হতো তাহলে বেশ কিছু দূরত্ব রেখেই তার পিছনে পিছনে যাওয়াই ছিলো আমাদের প্রতি নির্দেশ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে যদি সে আমাদের কোনোক্রমে চিনতে পারে তাহলেও যাতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে আক্রমণ করতে না পারে, অথবা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভালো করে চিনে নিতে না পারে। যদি কেউ ট্র্যামে উঠে পড়ে, আমাদের যেতে হতো সেকেণ্ড ক্লাশে। অর্থাৎ তার সঙ্গে এক গাড়িতে যাবার উপায় নেই। ট্যাক্সিতে গেলে ট্যাক্সি, যদি পাওয়া যায়। পাওয়া না গেলে অগত্যা ট্যাক্সির নম্বরটা টুকে নিয়ে পরদিন রিপোর্টের সঙ্গে দিয়ে দিতাম।

এ যেন এক নতুন জীবন। প্রথম প্রথম বেশ লাগতো। কাজ কিছুই নেই শুধু দাঁড়িয়ে বা বসে গল্প করে সময় কাটিয়ে দেওয়া। রাত্রি আটটা সাড়ে আটটার সময় একজন উপরওয়ালা অফিসার সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়ে দেখে যেতেন আমরা আছি না পালিয়ে গিয়েছি। পরদিন বেলা এগারোটার সময় আপিসে গিয়ে আগের দিনের রিপোর্ট দিয়ে খানিকক্ষণ গল্প-গুজব করে বেলা আড়াইটে তিনটে নাগাদ আবার ডিউটিতে বেরিয়ে যেতাম। সাধারণতঃ এক জায়গায় ডিউটি সাতদিনের বেশি দেওয়া হতো না। কেননা তাতে চিনে ফেলবার সম্ভাবনা বেশি। সেইজন্য সাতদিন অন্তর লোক বদলে দেওয়া হতো। কলেজ স্ট্রীটের ডিউটিই ছিলো খুব শক্ত। ওখানে দু'-এক ঘণ্টার মধ্যেই চিনে ফেলতো যে, আমরা আই-বি'র লোক। সেইজন্য বেছে বেছে সবচেয়ে ওস্তাদ লোককেই সেখানে পাঠানো হতো। আমি একেবারে নতুন, কাজেই ওদের সঙ্গে থাকলে কাজ শিখতে পারবো, আর বিপদ আপদের ভয়টাও একটু

কম থাকবে এইজন্যেই প্রথমে ওদের সঙ্গে আমাকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো।

প্রথম দু'দিন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলো না। তৃতীয়দিন বেলা প্রায় চারটা হবে। হঠাৎ দেখি আমার সঙ্গী তিনজন তিনদিকে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল। হতভম্বের মতো চারদিকে চাইছি। এমন সময় দেখি ঐ খদ্দরের দোকান থেকে ২৫।২৬ বছরের খদ্দর পরা একটি লোক আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমাদের প্রতি কর্তৃপক্ষের উপদেশ মনে পড়ে গেল। কখনো সামনা সামনি পড়বে না যাতে ভালো করে চিনে নিতে পারে বা দরকার হলে উত্তম মধ্যম দিতে পারে। কিন্তু তখন সে উপদেশ আমার কোনো কাজেই লাগলো না। লোকটা একেবারে কাছে এসে পড়েছে। তবুও ভয়ে ভয়ে এক পা দু' পা করে পশ্চিমদিকে হটতে লাগলাম। লোকটা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সামনের পানের দোকানে দু' পয়সার পান দিতে বলে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলো —এইসব শালা টিকটিকিগুলোর জন্য অস্থির হয়ে গেলাম। দেবো একদিন ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে···। আরও বিড় বিড় করে অনেক কথাই বললে, শুনতে পেলাম না। তখন আমি বেশ খানিকটা দূরে পিছিয়ে গিয়েছি, অন্ততঃ ইট মেরে মাথা ফাটাবার গণ্ডির বাইরে। একটু পরেই দেখি আমার সঙ্গীরা যেন ম্যাজিকের মতো এধার ওধার থেকে হাজির হলো। অন্যমনস্ক হয়ে ঐ লোকটার সামনে পড়বার জন্য প্রথমে একটু তিরস্কার বর্ষিত হলো। তারপর আমার অবস্থা দেখে পিঠ চাপড়ে বললে, 'এতেই ঘাবড়ে গেলে ভাই? এর চেয়েও অনেক ভীষণ ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটে গিয়েছে।' দৃষ্টান্তস্বরূপ বললো তাদের মধ্যে কবে কে ডিউটি করতে গিয়ে কতরকম বিপদে পড়েছে। এমন কি বেদম মার খেয়ে রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছে, তারপর পুলিস এসে গাড়ি করে হাসপাতাল নিয়ে গিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও মজার কথা এই যে, ঐ মারধোর খেয়ে কোথাও নালিশ করা চলবে না। এক যদি বেমালুম হজম করে যেতে পারো ভালো, নইলে আপিসের উপরওয়ালারা শুনলে অকর্মণ্য, অপদার্থ এইসব উপাধিতে ভূষিত হয়ে সবার বিদ্রূপের খোরাক যোগাবে। এই সব সহ্য করে চাকরি

করতে পারো ভালো, না হলে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। কী ভীষণ অবস্থা! উৎসাহ আমার অনেকটা নিবে গেল।

পরদিন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলো না, খুব সজাগভাবে দূরে দূরে থেকে সে দিনটা কাটিয়ে দিলাম। অঘটন ঘটলো পরের দিন।

আগেই বলেছি, বড় বড় স্বদেশী নেতাদের সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য কি। বেলা প্রায় পাঁচটা হবে হঠাৎ আমার একটি সঙ্গী আমার হাত ধরে একটু টান দিলে। তার দিকে তাকাতেই চোখ ইশারায় আমায় ডাকলে। বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে বললে, 'চিনতে পারেন কি?' অমুক নেতা এইমাত্র দোকানে ঢুকেছেন, তাঁর নাম বলতে চিনতে পারলাম। বিখ্যাত লোক। সবাই জানে। উত্তেজনায় আমার সঙ্গীর গলা কেঁপে উঠলো। বললো, 'জানেন ধীরাজবাবু, আজ ছ'মাস আমি এখানে ডিউটি করছি। কিন্তু কোনোদিন ওঁকে এই দোকানে ঢুকতে দেখিনি। আজ নিশ্চয়ই কোনো গোপন মিটিং আছে। আজ যেভাবেই হোক ওঁকে 'ফলো' করতেই হবে।' বলা বাহুল্য আমার এই সঙ্গীটি সমস্ত ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে নামকরা। বহু কাজ করে বহু পুরস্কার পেয়েছে সে। তাকে এরকম উত্তেজিত হতে কোনোদিন দেখিনি। আমার সঙ্গীটি জাতিতে মুসলমান। আসল নাম বলবো না, ধরুন হানিফ। কি বলবো না বলবো ভাবছি, হানিফ হঠাৎ বললে, 'ধীরাজবাবু, আপনি দূরেই থাকবেন। যা করতে হয় আমরাই করবো। কেননা, আজ ওঁকে মিস করলে আর রক্ষে থাকবে না।'

চারদিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখি আমার আর দু'জন সঙ্গী বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে নোটবুক বার করে কি দেখছে। বললাম, 'ওরা'? হানিফ হেসে বললে, 'ওদের ভাবনা ওদের, আমি শুধু ভাবছি আপনার কথা। আমাকে বিশেষ করে রতিলালবাবু (বাবার সেই পরিচিত ব্যক্তি) বলে দিয়েছেন, যাতে আপনি কোনো বিপদে না পড়েন।' লজ্জায় অপমানে হানিফের সামনে যেন এতোটুকু হয়ে গেলাম। আমার এতোদিনের 'রহস্যলহরী' পড়ার অভিজ্ঞতার কোনো মূল্যই রইলো না এই অশিক্ষিত হানিফের কাছে। কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। খানিক বাদে হানিফ বললে, 'আপনি আমার কাছ থেকে সরে যান, আজ

আমরা এক সঙ্গে সবাই থাকবো না। দূরে ঐ থামটার পাশে গিয়ে দাঁড়ান। ওঁকে আমরা 'ফলো' করে নিয়ে গেলে, আরও আধ ঘণ্টা কাছাকাছি থাকবেন। যদি কোনো অফিসার আসেন, বলবেন আমরা অমুককে নিয়ে গিয়েছি। ব্যস, তারপর সোজা বাড়ি চলে যাবেন। কাল আপিসে একটু সকাল সকাল আসবেন, রিপোর্টটা সবাই এক সঙ্গে বসে লিখে তারপর জমা দিয়ে দেবো।"

হ্যাঁ, না, কিছু না বলে থামটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

রাত তখন সাড়ে সাতটা বেজে গিয়েছে। সজাগ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি খদ্দরের দোকানটির ওপর। হঠাৎ দেখি, দীর্ঘাকৃতি এক বিরাট পুরুষ দোকান থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে সামনের ফুটপাথে দাঁড়ালেন। তাঁকে ঘিরে দোকানের প্রায় সমস্ত লোকই দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মুখেই কেমন একটা সম্ভ্রমের ভাব। লোকটিকে ভালো করে দেখে নিলাম। লম্বায় প্রায় সাড়ে ছ' ফুট, খুব কালো না হলেও বেশ কালো রঙ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, দাড়ি গোঁফ কামানো। মুখে একটা বিরাট গাম্ভীর্য বিরাজ করছে। পরনে খদ্দরের ধুতি, গায়েও খদ্দরের পাঞ্জাবি। সত্যিই নেতা বলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে। নামটা গোপন করেই গেলাম।

কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের মোড় থেকেই ট্র্যামটা ছেড়ে বেশ একটু জোরেই চলেছে! হঠাৎ দেখি, দীর্ঘাকৃতি নেতাটি অনায়াসে চোখের নিমেষে ট্র্যামের পাদানিতে লাফিয়ে উঠলেন। ভাববার অবসর নেই, আমিও এক লাফে ঐ ট্র্যামের সেকেণ্ড ক্লাশের পাদানির ওপর লাফিয়ে উঠলাম। তারপর কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল বুঝতে পারলাম না। শুধু শুনতে পেলাম একটা হৈ হৈ চিৎকার—রোখকে—বাঁধকে···

ব্যাপারটা যখন পুরোপুরি বুঝতে পারলাম তখন আমার চার পাশে বেশ ভিড় জমে গিয়েছে। ট্র্যামটিও থেমেছে আর অসংখ্য উৎসুক চোখের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ক্ষতবিক্ষত দেহে পথের উপর শুয়ে শুনতে পেলাম অযাচিত সমবেদনা ও তিরস্কার সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে আমার উপর।

একজন বললে—নিছক গোঁয়াতুর্মি, চলতি ট্র্যামে ওঠা অভ্যেস নেই, নেই বা উঠলে বাপু?

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আর একজন বলে উঠলো—কি যা তা বলছেন মশাই। দেখেননি ট্র্যামের পাদানিতে কাপড়ের কোঁচাটা আটকে গিয়েছিলো বলেই বেচারা পড়ে গিয়েছে।

মাথার কাছে কে একজন গম্ভীর গলায় বললেন—দয়া করে আপনারা একটু চুপ করুন আর পারেন তো খানিকটা বরফ এনে দিন। এই নিন পয়সা।

কৌতূহল হলো। কষ্ট হচ্ছিলো, তবুও আস্তে আস্তে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। যা দেখলাম তা লিখে বোঝাতে পারবো না, শুধু মনে হচ্ছিলো—মা ধরণী, দ্বিধা হও, আর সেই ফাটলে এই অভাগাকে একটু আত্মগোপনের সুযোগ দাও।

সেই দীর্ঘাকৃতি স্বদেশী নেতা, যাঁকে আমি 'ফলো' করে সবার কাছে বাহাদুরি নেবো ভেবেছিলাম, রাস্তার উপর তাঁরই কোলে মাথা রেখে অজ্ঞান দেহে শুয়ে আছি আর তিনি সস্নেহে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই বোধ হয় তিনি বললেন, 'চাকরি, চাকরি। তা সে যাই হোক। লজ্জা পাবার কিছু নেই। তবে আমি তোমার অনেক বড়। উপদেশ দেবার অধিকার আছে তাই বলছি, এ লাইন তোমার নয়। পারো তো এ চাকরি ছেড়ে দিও।'

পকেট থেকে police token, রিপোর্টের খাতা খুচরো পয়সা সব ছড়িয়ে পড়েছিলো চারিদিকে। ধীরে ধীরে সেগুলো কুড়োতে কুড়োতে বললেন, 'তুমি আমার অনুসরণ করছিলে কেন? আমি কোথায় যাই না-যাই, কার সঙ্গে কথা কই, এই সব জেনে রিপোর্ট দেবার জন্যে? বেশ, তোমার নোট বই-এ টুকে নাও, আমি সব বলে যাই। কাল আই. বি. আপিসে রিপোর্ট দিও!'

শুধু নির্বাক বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছি দেখে তিনি আবার শুরু করলেন, 'ভয় নেই, মিথ্যে কথা বলবো না। তুমি নির্ভয়ে রিপোর্ট দিতে পারো।'

বরফ এসে গেল। সমস্ত বাঁ পা'টা ছড়ে গিয়েছিলো। দেখে মনে হচ্ছিলো, কে যেন ধারালো ছুরি দিয়ে ছালখানা চেঁচে নিয়েছে। খানিক বাদে বেশ একটু সুস্থ হয়েছি দেখে তিনি ভিড়ের মধ্যে একজনকে ডেকে বললেন, 'একখানা ট্যাক্সি।'

আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে পকেট থেকে একখানা পাঁচ টাকার নোট বের করে আমায় দিতে গেলেন। এতক্ষণ একটা কথাও বলিনি, এবার আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। গলা ধরে গিয়েছিলো, তবু বললুম, 'তার চেয়ে সবাইকে ডেকে আমার সত্যি পরিচয় জানিয়ে দিন···।'

আর বলতে পারলাম না। নোটখানা পকেটে রেখে তিনি ট্যাক্সিওয়ালাকে ইশারা করলেন, ট্যাক্সি ছেড়ে দিলো।

রতিলালবাবু ছিলেন আই. বি-র একজন দুঁদে নামকরা অফিসার। আমাদের কাজের রিপোর্ট সংগ্রহ করা এবং কার কোথায় ডিউটি সব ভার ছিল তাঁর উপর। এদিকে তিনি আবার ছিলেন বাবার পুরাতন ছাত্র। কলেজ স্ট্রীটের ঘটনার পরদিনই বাবা তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এলে সটান তাঁকে উপরে আমার শোবার ঘরে নিয়ে এসে বললেন, 'দেখো, ছেলেটার কি অবস্থা তোমরা করেছো একবার দেখো। তোমরা সবাই আছো বলেই ছেলেটাকে ওখানে ঢুকিয়েছিলাম কিন্তু এই যদি তোমাদের কাজের নমুনা হয়, দরকার নেই আমার ছেলের চাকুরির।'

বাবা উত্তেজিতভাবে ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন আর রতিলালবাবু চুপ করে আমার খাটের পাশে বসে রইলেন। আমার অবস্থা দেখে ও শুনে তিনি খুব দুঃখিত হয়েছেন বলে মনে হলো না। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। বাবাই আবার একটু নরম সুরে শুরু করলেন, 'একটা উপযুক্ত ছেলে হঠাৎ মরে গেল। এও পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে কোথায় বায়োস্কোপ করতে শুরু করলো। তাই ভাবলাম, গভর্নমেণ্ট সার্ভিস, লেগে থাকলে কালে হয়তো উন্নতি করতে পারবে আর আমারও কিছু সাহায্য হবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর···'

রতিলালবাবু আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বললেন, 'আপনি মিছিমিছি বিচলিত হচ্ছেন

স্যার। কালকের ঘটনার জন্য দায়ী ও নিজেই। আমি বার বার করে সবাইকে বলে দিয়েছি, তাছাড়া হানিফও কাল ওকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছিলো, যেন ও ফলো না করে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করুন তো ও কেন একা চলন্ত ট্র্যামে সাসপেক্টকে ফলো করতে গেল? কাল আমাদের যে ক্ষতি হয়েছে তা আপনাকে কি বলবো স্যার। একটা জরুরী মিটিং ছিলো কাল। তাতে সব বড় বড় সাসপেক্ট-এর যোগ দেবার কথা ছিলো। ও যদি কাল চুপ করে বাড়ি চলে আসতো, তাহলে আজ আমাদের আর পায় কে?'

আমার কাছে বাবা শুধু একতরফাই শুনেছিলেন। রতিলালবাবুর কাছে সব শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'রতি, তাহলে ও এখনও তোমাদের মতো পাকা হয়ে ওঠেনি, দিনকতক ওকে সহজ সহজ ডিউটি দিলে ভালো হয়।'

রতিলালবাবু তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন, বললেন, 'ওকে এখন দিনকতক টেলিফোন ডিউটি দেবো। আপিসে কাজ—দশটা পাঁচটা। কোনও ঝক্কি নেই।

অগত্যা তাই ঠিক হলো।

একতলার চওড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেই সামনে পড়ে একটা প্রকাণ্ড বারান্দা। বারান্দার দু'দিকে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ছোট ঘর, আর ঠিক মাঝখানে চার-পাঁচখানা চেয়ার। দক্ষিণের দেওয়ালের গা ঘেঁষে একখানা গোল টেবিল। তার উপর রেডিওর মতো প্রকাণ্ড একটা বাক্স বসানো। তাতে ইলেকট্রিক সুইচের মতো অসংখ্য ছোট ছোট চাবি। প্রত্যেকটিতে নম্বর দেওয়া। পাশে একটা টেলিফোনের রিসিভার আর একখানা টেলিফোন গাইড। এই হলো আমার কার্যস্থল। প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। ঐ অসংখ্য চাবি অপারেট করে কি করে ঠিকমতো কানেকশন দেবো! আমার আগে যার ডিউটি ছিলো, সে আশ্বাস দিয়ে বললে, 'কিছুই না, দিন দুই একটু অসুবিধা হবে, পরে দেখবেন জল। এ আবার একটা কাজ নাকি?'

একখানা সাদা কাগজ নিয়ে সে আমায় বোঝাতে বসলো—ধরুন আপিসে তিনজন এস. এস. আছেন (Special

Superintendent, S.S. 1, S.S. 2, S.S. 3,—এঁরা হলেন আই. বি-র মাথা)। কেউ যদি টেলিফোনে এস. এস. ২কে চায় তাহলে 3 down 5 up 7 down (সুইচের মতো যে চাবিগুলো রয়েছে তাতে নম্বর দেওয়া আছে—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ইত্যাদি) ব্যস, কানেকশন হয়ে গেল। তেমনি ধরুন, যদি এস. এস. ৩কে চায় তাহলে 2 down 8 up 9 down।

এই বলে সে সাদা কাগজে সব পরিষ্কার করে লিখে দিলে। আরও বলে দিলে—কথা শেষ হয়ে গেলে আর্দালি এসে বলে যাবে অথবা নিজে গিয়ে দেখে আসতে হবে কথা শেষ হয়েছে কিনা। তারপর লাইন নরম্যাল করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকুন বা বই পড়ুন, যা খুশি। মোদ্দা কথা, শুধু আপ আর ডাউনের কাজ।

তিন চারদিন সত্যই একটু অসুবিধা হলো। প্রথমতঃ এমন জড়িয়ে ইংরেজি কথা বলতো যে, বুঝতেই পারতাম না কাকে চায়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বেশ অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। দিব্বি আরামে দশটায় খেয়েদেয়ে একখানা দীনেন্দ্র রায়ের বা ঐ ধরনের মুখরোচক নভেল সঙ্গে নিয়ে যেতাম আর পাঁচটার মধ্যে সেখানা শেষ করে বুক ফুলিয়ে বাড়ি চলে আসতাম। টেলিফোন ডিউটিতে আরেকটা মস্ত সুবিধা ছিলো, কেউ জানতে পারতো না কোথায় কাজ করি। তখন গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের যুগ। পুলিসে বিশেষ করে আই. বি-তে ওয়াচারের কাজ করি, শুনলে ঘেন্নায় কেউ কথা বলতো না। এমনিতেই কানাঘুষো শুনে আমার সহপাঠী অনেকেই আমার সঙ্গে আলাপ বন্ধ করে দিয়েছিলো।

আমাদের আপিসের ঠিক পাশের বাড়িটাই ছিলো এস. বি. আপিস। সেটা পুরো ক্যালকাটা পুলিসের অধীনে। সেখানে অন্যান্য সব জটিল ব্যাপারের ভিতর স্বদেশী ডাকাত ধরাতেও ওদের অধিকার আমাদের চেয়ে কম ছিলো না। ওদের বলতো এস. বি. অর্থাৎ স্পেশাল ব্রাঞ্চ। দরকার হলে ওদের সঙ্গে আমাদের ডিউটি পড়তো। দুটি আপিস আলাদা হলেও দরকার পড়লে দুই ভাই লাঠি উঠিয়ে দাঁড়াতো। এদিকে আবার রেষারেষিরও অন্ত ছিলো না। আমরা একটা ভালো শিকার পাকড়াও করেছি জানতে পারলে ওরা জ্বলে পুড়ে মরতো।

টিফিনের সময় ওদের আপিসে প্রায়ই যেতাম। সবাই ধরে বসতো, গল্প বলো। আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি তখন রহস্যলহরীর কৃপায় ভর্তি। তার ভিতর থেকে বাছা বাছা গল্প বলে শোনাতাম, আর, বলতাম, 'ছোঃ! এসব কি একটা কাজ নাকি? ওদের দেশে পুলিস আজ কত এ্যাডভান্স, কতরকম বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ওরা ক্রাইম ডিটেকশন করে, যদি কোনোদিন সুযোগ পাই, দেখিয়ে দেবো কি করে বড় বড় অপরাধীকে পাকড়াও করতে হয়!'

সবাই 'হা' করে কথাগুলো গিলতো, হয়তো ভাবতো—সত্যিই একটা অদ্ভুত জিনিয়াস পথভুলে ওদেশে না গিয়ে এই পরাধীন দেশের আই. বি. ডিপার্টমেন্টে ছিটকে এসে পড়েছে। এমনিভাবে দিনগুলো বেশ কাটতে লাগলো।

আগেই বলেছি, বারান্দার দু'পাশে দুটো কাঠের পার্টিশন করা ঘর। প্রায়ই খালি থাকে। দু'-একজনকে জিজ্ঞাসা করেও কোনো সদুত্তর পাইনি। একদিন বুঝতে পারলাম।

স্বদেশী বড় বড় সাসপেক্ট অথবা ডেটিনিউ যাদের আটক রাখা হতো, মাঝে মাঝে তাদের আপিসে এনে ঐ ঘরে বসিয়ে রাখা হতো। তারপর বড় বড় হোমড়া-চোমড়া অফিসারের দল এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করে যেতেন। শুনতাম, কোনো কোনোদিন বেলা দশটা এগারোটায় এনে রাত্রি বারোটা একটা পর্যন্ত জেরা চলতো। এর মধ্যে খাবারও প্রচুর খাওয়ানো হতো। মূল উদ্দেশ্য হলো পার্টির ভিতরের খবর সব বের করে নেওয়া এবং প্রচুর প্রলোভন দেখিয়ে দলে ভিড়িয়ে নেওয়া যাতে দলের ভিতর থেকেও সে লুকিয়ে সব খবর এঁদের জানাতে পারে। সোজা কথায় যাকে বলে স্পাই। লোক বুঝে মাসে মাসে দু' শ' থেকে পাঁচ শ' টাকা পর্যন্ত ব্যবস্থা ছিলো। টাকার প্রলোভনে শেষ পর্যন্ত অনেকেই টোপ্ গিলতো। আবার গিলতোও না এমন দু'-একটিও যে না ছিলো তা নয়। তবে দেখতাম ও শুনতাম, বেশির ভাগই টোপ্ গিলেছেন।

আপিসে তিনজন এস. এস-এর মধ্যে দু'জন ছিলেন খাঁটি ইংরেজ আর এস. এস-৩ ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালী। নিজের অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার জোরে তিনি সাধারণ কনস্টেবল থেকে এস. এস-৩ হয়েছিলেন। এঁদেরও নিজস্ব স্পাই ছিলো এক একজন নামকরা

স্বদেশী নেতা। এইসব তথাকথিত নেতারা জেল খাটতেন, খদ্দর পরতেন, বাংলা মায়ের বন্ধন দশা ঘোচাবার জন্য মিটিং-এ কুম্ভিরাশ্রু বর্ষণ করতেন। আবার গোপনে সব সংবাদ সরবরাহ করতেন আই-বি. আপিসে। তার জন্য এঁদের মাসোহারা বন্দোবস্ত ছিলো পাঁচ সাত শ' টাকা। চমৎকার ব্যবস্থা! এঁদেরই বক্তৃতা শুনে দেখেছি হাজার হাজার নরনারী গায়ের গয়না, কাপড় অম্লান বদনে খুলে দিয়েছে। এইসব নেতারা মোটরকার চড়তেন, আড়াই শ' তিন শ' টাকার ভাড়ার বাড়িতে থাকতেন। অথচ কোনো চাকরি করতেন না বা দেশে জমিদারিও ছিলো না। কারা এই টাকাটা যোগাতো? দরিদ্র দেশ না বৃটিশ গভর্নমেন্ট?

এস. এস-দের নিজেদের মধ্যে একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা রেষারেষির ভাব ছিলো। কে কত জরুরী খবর সংগ্রহ করতে পারে এবং কে কত বড় বড় স্বদেশী রুই কাতলা জেলে পুরতে পারে, এই ছিলো তাদের কর্মজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য।

একদিনের ঘটনা। টেলিফোন ডিউটিতে বসে একখানা ইংরেজি ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ছিলাম। পাশের পার্টিশনের ওধার থেকে উত্তেজিত কণ্ঠ শুনতে পেলাম—

—কেন মিছিমিছি নিজেও ভুগছেন আর আমাদেরও ভোগাচ্ছেন। রাজী হয়ে যান। কিছু করতে হবে না, শুধু মাঝে মাঝে মিটিং-এর স্থান কাল আমাদের জানিয়ে দেবেন। ব্যস্ মাসে মাসে মোটা টাকা পাবেন, রাজার হালে থাকবেন। আমাদের এস. এস-২কে জানেন না, অমন ভালো লোক এ ডিপার্টমেণ্টে নেই···। প্রশ্নকর্তা হয়তো প্রভুর আরো গুণগান করতেন, কিন্তু একটা গম্ভীর গলার চাপা হাসিতে আর বাকি কথাগুলো চাপা পড়ে গেল।

—খালি হাসেন কেন বলুন তো? আজ চার পাঁচদিন ধরে ঐ একটা কথা আপনাকে বোঝাচ্ছি, শুধু হেসেই উড়িয়ে দিতে চান?

এবার উত্তর শুনতে পেলাম। সতেজ গম্ভীর গলা; একটা প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের হাসি তার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

—হ্যাঁ, হেসেই উড়িয়ে দিতে চাই। যদি সম্ভব হতো, আপনাদের এই আই-বি. ডিপার্টমেণ্টটাই হেসে উড়িয়ে দিতাম।

এর পর কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। বই পড়া বন্ধ করে অধীর উৎকণ্ঠায় কান খাড়া করে চেয়ারে বসে আছি। আবার ভেসে এল সেই হাসি, এবার একটু জোরে—

—আপনাদের তূণে যতগুলো অস্ত্র ছিলো, সবগুলোই তো এ ক'দিনে প্রয়োগ করেছেন আমার ওপর। আর কেন?

নিম্নস্বরে প্রশ্নকর্তা কি যেন বললেন, শুনতে পেলাম না। শুনতে পেলাম সেই হাসি, আরও জোরে—

—আমি কি ভাবছি জানেন? আপনাদের মতো উজবুক সব লোক নিয়ে আপনাদের হবুচন্দ্র এস. এস-২ এই ডিপার্টমেণ্ট চালাচ্ছেন কি করে? তাঁকে বলে দেবেন, এক ফরমুলায় সব অঙ্ক কষা যায় না।

ঠিক এমনি সময়ে এস. এস. ৩-এর আর্দালি এসে আমাকে জানালো, সাহেব সেলাম দিয়েছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে গেলাম। ফিরে এসে দেখলাম, পার্টিশনের পাশে গভীর নিস্তব্ধতা। বুঝলাম কেউ নেই। হয়তো ভদ্রলোককে কাল আবার নিয়ে আসবে। আবার হয়তো ঐ একই প্রশ্নের একঘেয়ে কচকচানি শুরু হবে। অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। নভেলখানা খুলে পড়তে শুরু করলাম।

টেলিফোন ডিউটিতে বেশ আরামে আছি। দশটায় আসি। মাঝে এক ঘণ্টা এস. এস. প্রভুদের 'লাঞ্চ'-এর ছুটি, আমারও ছুটি। তারপর পাঁচটায় সাহেবরা চলে গেলে, ব্যস্ একদম বাড়ি। টেলিফোনের অগুন্তি চাবিগুলি এখন আর ভয়ের উদ্রেক করে না। বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছে এই ক'মাসে। এখন চাবিগুলোর দিকে না চেয়েই কনেকশন দিতে পারি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু ঘটেনি। সেই নিত্যনৈমিত্তিক বাঁধাধরা রুটিন ওয়ার্ক।

পুজো প্রায় এসে গিয়েছে। দেশের বাড়িতে প্রতি বছর তিনদিন অভিনয় হয়। বলা বাহুল্য, ঐ তিনদিনই আমাকে নাম-ভূমিকায় বা বড় ভূমিকায় নামতে হয়। এবার ঠিক হয়েছে, "সাজাহান", "চণ্ডীদাস" ও "মিশরকুমারী"। সময় বেশি নেই, রোজ একখানা করে নাটক সঙ্গে নিয়ে টেলিফোন ডিউটিতে বসে পাঠ

মুখস্থ করি। সেদিন সাজাহানের ভূমিকা খুব মন দিয়ে তৈরি করছিলাম। যেখানটায় সাজাহান উন্মাদের মতো জাহানারাকে বলছে,—দেবো লাফ? দিই লাফ?

তন্ময় হয়ে বন্দী বৃদ্ধ সাজাহানের কথাগুলো চাপা গলায় বেশ ভাব দিয়ে আউড়ে যাচ্ছি, এমন সময়—ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই একটা অস্পষ্ট চাপা গলায় কে একজন এস. এস.-কে চাইলে। বইটির দিকে চেয়ে মুখস্থ করতে করতেই চাবিগুলো টিপে 7 down 2 up 4 down করে কনেকশন দিয়ে আবার পুরো উদ্যমে পরের সিনটা শুরু করলাম।

খেয়াল নেই, কতক্ষণ পরে দেখি তিন চারজন আর্দালি ও দু' তিনজন বাঙালী অফিসার হন্তদন্ত হয়ে আমার দিকে ছুটে আসছে। ব্যাপার কি? ভীষণ ব্যাপার। এস. এস. আমাকে তলব করেছেন। অপরাধীর মতো ভয়ে ভয়ে এস. এস.-এর কামরায় ঢুকলাম।

সত্যিকার গোলাপখাস আম দেখেছেন? চেয়ে দেখি এস. এস-এর গালের দুটো পাশ ঠিক সেইরকম লাল হয়ে গিয়েছে। রাগে ইংরেজ-প্রভু নিজের চুল ছিঁড়ে ফেলেন আর কি! আমাকে দেখেই তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে এক সঙ্গে কি যে কতকগুলো বলে গেলেন তার একবর্ণও বুঝলাম না। পাশের একজন বাঙালী অফিসার বললেন, 'করেছেন কি মশাই? সাহেবের একজন স্পেশাল স্পাই, যাকে মাসে মাসে বহু টাকা সাহেব গোপনে দিয়ে থাকেন, তার একটা বিশেষ দরকারী খবর আপনি এস. এস-২কে দিয়েছেন?'

আমি তো অবাক। কি জবাব দেবো ভাবছি। এমন সময় রতিলালবাবু ঘরে এসে আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে বললেন, 'টেলিফোন ডিউটি খুব সোজা নয়! সব সময় সজাগ না থাকলে এক মুহূর্তের ভুলে অনর্থ ঘটে যেতে পারে। টেলিফোনটি ছিলো এস. এস. ১-এর আর খুব গোপনীয়। একটা গোপন মিটিং-এর খবর। যার উপর নির্ভর করে এস-এস. রাত্রে চার পাঁচজন স্বদেশী নেতাকে গ্রেপ্তার করতেন।'

বুঝলাম ব্যাপার সত্যিই গুরুতর। আরো মজার কথা শুনলাম,

এই স্পাইটিকে নিজের স্পেশাল স্পাই করার জন্য এস. এস-২ বহুদিন ধরে চেষ্টা করছেন কিন্তু পারেননি। এবং সে যে বহুদিন আগেই এস. এস. ১-এর টোপ্ গিলে বসে আছে তাও জানতেন না। বুঝলাম, চাকরি এবার সত্যিই গেল।

রতিলালবাবু বললেন, 'বাড়ি চলে যাও, টেলিফোন ডিউটি তোমাকে আর দেওয়া হবে না এটা ঠিক। দেখি সাহেবের হাতে পায়ে ধরে অন্য ডিউটিতে দিয়ে যদি তোমার চাকরিটা কোনোরকমে রাখতে পারি।'

রতিলালবাবুর চেষ্টায় চাকরিটা আমার রয়েই গেল, তবে ডিউটি গেল বদলে। এবার আমার ডিউটি পড়লো ভবানীপুরে। রসা রোড থেকে যে জায়গায় ট্র্যামটা ঘুরে বালিগঞ্জমুখো গিয়েছে সেই চৌমাথায়। শুনলাম সাসপেক্ট থাকে প্রতাপাদিত্য রোডে। বিকেল তিনটা থেকে পাঁচটার মধ্যে সে সাইকেলে বেরিয়ে পড়ে, তারপর এদিক সেদিক ঘুরে কোথায় যে সরে পড়ে কেউ তা জানে না। আজ তিন বছর ধরে ওকে ফলো করা হচ্ছে, কিন্তু অতি হুঁদে ওয়াচার পর্যন্ত হার মেনে গিয়েছে। ডিউটিতে আমরা তিনজন, তার মধ্যে একজনের সঙ্গে শুধু একখানা ভালো বাইসাইকেল। যদি কোনোদিন সাইকেলে না উঠে ট্র্যামে বা ট্যাক্সিতে বেরোয় এইজন্য আমরা বাড়তি দু'জন। রতিলালবাবু বিশেষ করে সঙ্গের দু'জনকে বলে দিয়েছেন যে, আমি যেন কোনো মতেই ঐ বিশেষ মূল্যবান শিকারটিকে ফলো না করি। কাজেই তিনটের সময় গিয়ে চৌমাথায় ঘাসের উপর আরামে বসে পড়ি, আর সঙ্গী দু'জনের সঙ্গে রবার্ট ব্লেক থেকে শুরু করে ওদেশের সব জাঁদরেল ডিটেকটিভের গল্প ফেঁদে বসি। সঙ্গী দু'জন আমার কথাগুলো হাঁ করে গিলতো। আমাদের শিকার বাড়ি থেকে বেরোলেই ওরা জানতে পারতো। নিমেষে তিনজনে তিনদিকে ছিটকে পড়তাম, শুধু সাইক্লিস্ট সঙ্গীটি দূরে থেকে অনুসরণ করতো। এরপর আমরা দু'জন একেবারে নিশ্চিন্ত, খালি খোস গল্প আর পরনিন্দা এই করে রাত ন'টা পর্যন্ত

কাটিয়ে দিতাম। আমাদের শিকারটির চেহারার একটু বর্ণনা এখানে দিয়ে রাখি।

নাম ধরুন—রবি চৌধুরী, বয়েস চব্বিশ-পঁচিশ। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, কালো রঙ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, চোখ দুটি অসাধারণ তীক্ষ্ণ। চাইলে মনে হবে যেন অন্তস্তল ভেদ করতে চাইছে। পরনে খদ্দরের মোটা ধুতি, গায়ে খদ্দরের ঢিলে পাঞ্জাবি, পায়ে চটি। সাইকেল চালানোয় অসাধারণ দক্ষ।

রবি চৌধুরী সাইকেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঠিক ঐ মোড়টার কাছে এসে সাইকেল আস্তে চালাতো আর চারিদিকে চাইতে চাইতে যেতো। যেন সমস্ত আই. বি. ডিপার্টমেণ্টকে চ্যালেঞ্জ করে বলতে চাইতো—এসো, কে আসবে আমায় ফলো করো।

পরে বুঝেছিলাম, যত নতুন লোকই দেওয়া হোক না কেন, বাড়ি থেকে বেরিয়েই রবি বুঝতে পারতো, কারা আই-বি'র লোক। যাক, যা বলছিলাম বলি।

রাত্রি প্রায় সওয়া ন'টার সময় আমাদের তৃতীয় সঙ্গীটি গলদঘর্ম হয়ে ফিরে এল। সেই চিরপুরাতন ব্যর্থতার ইতিহাস। এ-রাস্তা ও-রাস্তা এ-গলি ও-গলি ঘুরিয়ে নাস্তানাবুদ করে আধ ঘণ্টা আগে কোথায় যে সে সরে পড়লো কেউ জানে না। মনে মনে লোকটার সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধা ও কৌতূহল জেগে উঠলো। শুনলাম এই বয়সে সে চার-পাঁচবার জেল খেটেছে। আমাদের আই. বি'র কর্তারা বহু চেষ্টা করেছেন তাকে টোপ গেলাবার এবং এখনো সে চেষ্টা চলেছে, কিন্তু বড় শক্ত ঠাঁই। শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

দিন পনেরো কেটে গেল। এর মধ্যে একটা নতুন উপসর্গ জুটেছে। একেই আমি ভবানীপুরের ছেলে, বহুলোকের সঙ্গে পরিচয়, তার উপর বাবা মিত্র ইনস্টিটিউশনের মাস্টার। কাজেই নির্বিবাদে চৌমাথায় বসে ডিউটি করা আমার ভাগ্যে সইলো না। বসে গল্প করছি, হঠাৎ পেছন থেকে কে বলে উঠলো, 'আরে তুই এখানে বসে কি করছিস বলতো? কালও ট্র্যামে যেতে যেতে দেখলাম তুই এখানেই বসে আছিস…'

কি জবাব দেবো বলতে পারেন? অপ্রস্তুত হয়ে একটা যা'তা বলে দিলাম। বিশ্বাস সে নিশ্চয়ই করলো না। আমার সঙ্গী

দুটির দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাইতে চাইতে সরে পড়লো। এই রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগলো। একে তখন অসহযোগ আন্দোলনের যুগ, পুলিসের নাম শুনলেই লোকে ঘৃণায় ভ্রূ কুঁচকে প্রকাশ্যে গালাগালি দিতে শুরু করে, তার উপর যদি জানাজানি হয়ে যায় আমি পুলিস, শুধু পুলিস নয়, টিকটিকি পুলিস হয়ে বাঙলা মায়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানগুলোকে জেলে পুরতে সাহায্য করছি, ব্যস্, আর দেখতে হবে না। আমার হয়ে গেল। মনে মনে বেশ খানিকটা দমে গেলাম।

বেলা চারটে কি সাড়ে চারটে হবে। তিনজনে আপিসের কি একটা ব্যাপার নিয়ে তর্কে মেতে আছি, হঠাৎ আমার সঙ্গী দু'জন ছিটকে কে কোথায় চলে গেল বুঝতে পারলাম না। বোকার মতো চারিদিকে চাইতে চাইতে দেখি ঠিক আমার সামনে পশ্চিমের ফুটপাথের উপর একখানা পা ঠেস দিয়ে সাইকেলে বসে রবি চৌধুরী। আঁৎকে উঠলাম। ভাঁটার মতো জ্বলন্ত চোখ দুটো দিয়ে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ডান হাত বাড়িয়ে আমায় ডাকলে। সে ডাক অবহেলা করার মতো সাহস ও মনের বল আমার ছিলো না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো এক পা এক পা এগিয়ে গেলাম ; কাছে যেতেই শান্ত অথচ তীক্ষ্ণ গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার নাম ধীরাজ না ?'

উত্তরে শুধু ঘাড় নাড়লাম।

'তুমি ললিতবাবুর ছেলে না ?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তোমার বাবার কাছে আমি পড়েছি। তাঁকে আমি বিশেষ শ্রদ্ধা করি। তাঁর ছেলে হয়ে তুমি এই কাজ করছো।'

কি জবাব দেবো, চুপ করে রইলাম।

রবি চৌধুরী বলে চললেন, 'পরাধীন দেশে জন্মে যথেষ্ট নির্যাতন ভোগ করছি। সেই আত্মগ্লানি খানিকটা মুছে ফেলবার জন্য দেশমায়ের সেবা করছি। ইংরেজের চোখে আমরা যাই হই, তোমাদের কাছে—আমার ছোট ভাইবোনদের কাছেও কি আমরা অপরাধী ? নইলে তোমরা এই দেশের লোক হয়ে রাতদিন আমাদের পিছু পিছু ব্লাডহাউণ্ডের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন ?

সামান্য ক'টা টাকার জন্য এই চাকরিই স্বীকার করে নিলে? ছিঃ!'

নিচে মাটির দিকে চেয়েছিলাম, মুখ তুলে দেখি রবি চৌধুরী তীরবেগে সাইকেল চালিয়ে কালীঘাট ট্র্যাম ডিপো ছাড়িয়ে গিয়েছে।

সে রাত্রে ভালো করে ঘুমোতে পারলাম না। পরদিন সকালে উঠে বাবাকে সব খুলে বললাম। বাবা কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে পরে বললেন, 'নাঃ, সত্যই এরকম চাকরি তোমার করা উচিত নয়। আমি আজই রতিলালকে ডেকে সব বলি।'

রতিলালবাবু সব শুনে বললেন, 'ছাড়বো বললেই আই. বি'র চাকরি ছাড়া যায় না স্যার। তাছাড়া ও এখন ভিতরের অনেক খবর জেনে গিয়েছে। এ অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দিলেও গভর্নমেণ্ট ওকে ছাড়বে না। ছুতোয় নাতায় একটা মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে আটক করে স্বদেশী কয়েদীদের সঙ্গে রেখে দেবে, সারাজীবনটাই খতম। তার চেয়ে দেখি কম ঝক্কির ডিউটিতে ওকে যদি দিতে পারি।'

বাবা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন, 'তার চেয়ে তুমি ওকে আপিসে কোনো ডিউটিতে দাও, নয়তো মফঃস্বলে কোনো থানায় দিয়ে দাও।'

রতিলালবাবু হেসে বললেন, 'আপনি কেন অতো ভয় পাচ্ছেন স্যার। সব ঠিক করে দিচ্ছি। ট্রেনিং থেকে পাশ করে না এলে থানায় দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এখন আই. বি'তে বহুলোকের দরকার। দেখছেন না, স্বদেশী আন্দোলন দিন দিন কি রকম বেড়েই উঠছে? আর দিন কতক গেলে দেখবেন ও নিজেই আই. বি. ছেড়ে কোথাও যেতে চাইবে না।

বাবা অগত্যা চুপ করে গেলেন।

এইখানে একটু বলে নেওয়া দরকার আমাদের আই. বি. ডিপার্টমেণ্ট ছিলো বেঙ্গল পুলিসের অধীনে আর. এস. বি. (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) ছিলো ক্যালকাটা পুলিসের ভিতরে। কোনো বাড়ি তল্লাশী বা কাউকে গ্রেপ্তার করতে হলে আমাদের এস. বি. অথবা ক্যালকাটা

পুলিসের সাহায্য নিতে হতো। যদিও আমরা আই. বি. ও এস. বি. মিলে এক সঙ্গে ডিউটি করতাম তবু আসল চাবিকাঠি ছিলো ওদের হাতে। পলিটিক্যাল ব্যাপারের জন্য কলকাতায় এই দুটি প্রতিষ্ঠান ছিলো প্রধান। সাধারণ চোর ডাকাত খুনে এদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান সি. আই. ডি. বিভাগ। আই. বি. অথবা এস. বি'র সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ ছিলো না। মফঃস্বলের প্রতি শহরে থানা ছাড়াও ডি. আই. বি. বা ডিস্ট্রিক্ট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ ছিলো। কলকাতা আই. বি'তে কাজের চাপ পড়লেই মফঃস্বলের থানা এবং ডি. আই. বি. থেকে রিকুইজিশন করে লোক আনিয়ে নেওয়া হতো এবং কাজের চাপ কমলেই আবার তারা নিজ নিজ জেলায় ফিরে যেত।

কোনো ডিউটি তখনো আমার ঠিক হয়নি। রতিলালবাবু বলে দিলেন তাহলেও একবার করে রোজ আপিসে যেতে। রোজ যাই, ঘণ্টাখানেক থেকে গল্পগুজব করে চলে আসি। সেদিন আপিসে যেতেই দেখি কেবল নতুন মুখ, আপিস একেবারে সরগরম। ব্যাপার কি? শুনলাম ভীষণ কাজের চাপ পড়েছে। তাই মফঃস্বলের ডি. আই. বি. এবং থানা থেকে অনেক লোক আনানো হয়েছে, তার মধ্যে অফিসারও আছেন।

কি একটা কাজে উপরে গিয়েছিলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি। দেখি আমার পরিচিত হানিফ এবং আরো দু'-একজন এস. এস. তিনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে হাতে একখানা সাদা খাম। আমায় দেখে তাড়াতাড়ি সেখানা পকেটে রেখে দিলে। জিজ্ঞাসা করলাম, উত্তরে তারা একটু হেসে পাশ কাটিয়ে সরে পড়লো। কৌতূহল বেড়ে গেল। অনেক চেষ্টা করে অপরের কাছ থেকে জানলাম, ওটা হলো 'ডি-এ' অর্থাৎ ডেঞ্জার এলাউয়েন্স। ওটা দেওয়া না দেওয়া সম্পূর্ণ নির্ভর করে এস-এসদের খেয়াল খুশির উপর। যার রিপোর্ট যত মূল্যবান এবং যে যত বেশি ঝক্কির ডিউটি করে ওটা মাঝে মাঝে তারা পায়। এক শ' দু' শ' থেকে হাজার পর্যন্ত। প্রতি বৎসর বৃটিশ গভর্নমেন্ট 'ডি-এ' বাবদ বহু লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়ে নেন।

আমাদের উপরে একজন অফিসার ছিলেন, গোপেনবাবু। শুনেছিলাম তিনি নিজের সহোদর ভাইকে একটা জটিল স্বদেশী

মামলায় জড়িয়ে দিয়ে আই. বি'তে সাব ইনস্পেক্টরের পোস্ট, নগদ দশ হাজার টাকা ও প্রায় এক শ' বিঘে ধানের জমি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। আমরা সবাই মনে মনে তাকে ঘৃণা করলেও গোপেনবাবু ইংরেজ অফিসারদের ছিলেন খুবই প্রিয়। লেখাপড়া কিছুই জানতেন না, অতি কষ্টে আমাদের রিপোর্টগুলিতে নাম সই করে দিতেন। সবচেয়ে উপভোগ্য হতো গোপেনবাবু যখন ইংরেজিতে সাহেবদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতেন। কালো আবলুস কাঠের মতো মুখখানিতে ধবধবে সাদা দাঁতগুলো বার করে বেকুবের মতো খালি অর্থহীন হাসি হাসতেন আর প্রতি কথার মধ্যে 'ইয়েস স্যর, ইউ ফাদার মাদার, অল রাইট স্যর' ; এ ছাড়া তার তহবিলে আর ইংরেজি কথা ছিলো বলে মনে হতো না।

ঐ চেহারা আর বিদ্যে নিয়ে গোপেনবাবু তোফা সুনামের সঙ্গে চাকরি করে যাচ্ছেন, মাঝে মাঝে বেশ মোটা 'ডি-এ' ও বাদ যেত না। ভাবতাম, অদ্ভুত জায়গা এই আই. বি. ডিপার্টমেণ্ট। এখানে ঢুকলে মানুষ পয়সা আর ইংরেজ প্রভুদের খুশি করবার নেশায় মেতে ওঠে। এখানে চেহারার দরকার নেই, বিদ্যেবুদ্ধির প্রয়োজন নেই, শুধু তুমি যে মানুষ আর তোমার যে বিবেক বলে একটি পদার্থ আছে সেটি ভুলে যাও, ব্যস্ আর দেখতে হবে না। দিন দিন তুমি উন্নতির চরম শিখরে উঠে যাবে।

বারান্দার কাঠের পার্টিশনটার পাশে শুনলাম মৃদু গুঞ্জন। আজকাল আর সে গুঞ্জন থামে না, রাতদিন চলে। নিচে নামছি রতিলালবাবুর সঙ্গে দেখা। বললাম, 'রতিদা, দিন না আমায় কোনো ডিস্ট্রিক্টের থানায় বদলি করে।'

উত্তরে একটু হেসে রতিলালবাবু বললেন, 'পাগল, দেখছো না সব জেলা থেকেই লোক আনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যা কাজ পড়েছে, বাপস্! তাছাড়া ট্রেনিং থেকে পাশ করে না এলে কোনো জেলাই তোমাকে নেবে না। আই. বি. হচ্ছে স্পেশাল ব্যাপার। এখানে আমরা দরকার বুঝলে বিনা ট্রেনিং-এ লোক নিতে পারি কিন্তু ছেড়ে দিতে পারি না। বুঝলে?'

বুঝলাম সবই, কিন্তু এখন আমি করি কী!

ডিউটি করে চলেছি। শেয়ালদহে, বেলেঘাটা স্টেশনে। সকালের দিকে কয়েকটা লোকাল ট্রেনে লক্ষ্য রাখতে হয়, কারণ আমাদের নির্দিষ্ট সাসপেক্ট ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন। বেলা ন'টার পর খুব ঘনঘন অনেকগুলো ট্রেন আসে। আমাদের শিকারটি সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে এসে পড়তেন। তারপর পায়ে হেঁটে সারা কলকাতাটা চষে ফেলে সন্ধ্যে সাতটার পর আবার ট্রেনে ফিরে যেতেন। কোনও আপিসে চাকরি করেন না অথচ ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন। এটা কি? ঠিক ওই রহস্যটা ভেদ করবার জন্যই আই. বি. ডিপার্টমেণ্টও কম উদ্‌গ্রীব নয়। ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে সোজা হ্যারিসন রোড ধরে হাঁটতে থাকেন। মাঝে মাঝে দু'-একটি পানের দোকানে দাঁড়ান, এক পয়সার পান ও একটি সিগারেট নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করেন। অদ্ভুত হাঁটতে পারেন ভদ্রলোক। সারাদিন এইভাবে উদ্দেশ্য বিহীনের মতো পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যার পর স্টেশনে ফিরে আসেন। একঘেয়ে রুটীন-বাঁধা কাজ। এইভাবে সারাদিন হেঁটে হেঁটে আমরা প্রায় আধমরা হয়ে যাই। ভদ্রলোককে দেখে কিন্তু বুঝবার উপায় নেই, এটা যেন তার নিত্যকার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

আমার সঙ্গী রহমান বললে—বুঝতে পারলেন না? লোকটা মহা ধড়িবাজ। এইভাবে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে আমাদের জব্দ করছে। বিরক্ত হয়ে যেদিন আমরা ওকে ফলো করবো না, সেই দিন ও ওদের আড্ডায় যাবে। আমাদের ও আসল ঘাঁটিটা দেখাতে চায় না।

কথাটায় যুক্তি আছে বলে মনে হলো। এইভাবে প্রায় তিন সপ্তাহের উপর কেটে গেল। আপিসেও রোজ ওই একই বাঁধা-ধরা রিপোর্ট দিচ্ছি—অমুক ট্রেনে এল, তারপর এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যা সাতটা কি সাড়ে সাতটার ট্রেনে বাড়ি গেল।

আমরা তখন অনেকটা বেপরোয়া। দূর থেকে পিছু নেওয়ার নিয়ম থাকলেও আমরা আর তা মেনে চলি না। স্টেশন গেটে মন্থলি টিকিট দেখিয়ে বেরলেই আমরাও সঙ্গে সঙ্গে পিছু নিই, যেন আমরা বিশেষ পরিচিত বন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। একটু এগিয়ে-পিছিয়ে থেকে তিনজনেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।

সেদিন ছিলো শনিবার। ঘটনাটা বেশ পরিষ্কার মনে আছে। ভদ্রলোক সেদিন বেশ একটু দেরি করেই এলেন। প্রায় বারোটা। যথারীতি তিনজনে হ্যারিসন রোড ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। আজকের হাঁটায় একটু বৈচিত্র্য দেখা গেল। অন্যদিন চলতে চলতে কোনো দোকানের সামনে থেমে দাঁড়িয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে দোকানের কাচের জানলার জিনিসগুলো দেখতেন। মনে হতো একটু জিরিয়ে দম নিচ্ছেন। তারপর আবার হাঁটতেন। এইভাবে সন্ধ্যা পর্যন্ত পাঁচ সাতবার থামতেন। আজ ব্যতিক্রম ঘটলো।

অভিশপ্ত ইহুদির মতো ভদ্রলোক হেঁটেই চলেছেন। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। ঘণ্টা দুই এইভাবে হাঁটার পর আমাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। আমার সঙ্গীকে বললাম—আর পারছিনে ভাই, একটু জিরিয়ে নেই।

আঁৎকে উঠে রহমান বললে,—অমন কাজও করো না ভাই! আজ ব্যাটা নির্ঘাৎ কোথাও যাবে, তাই আমাদের চোখে ধুলো দিতে চাইছে। আজ যদি একটা ভালো রিপোর্ট দিতে পারি তাহলে এ মাসে 'ডি-এ' মারে কে!

আমার ক্লান্ত চোখের সামনে ভেসে উঠলো আই. বি. আপিস। হাসিমুখে আমার সব সহকর্মীরা এস. এস.-এর ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতে একখানা করে সাদা নাম না-লেখা খাম। ক্লান্তি ঝেড়ে ফেললাম। আবার পুরো উদ্যমে হাঁটা শুরু। আরও ঘণ্টাখানেক এইভাবে কাটলো। দেখলাম, একই রাস্তা দু' তিনবার করে ঘুরছি। এ-ফুটপাথ দিয়ে যাই, ও-ফুটপাথ দিয়ে ফিরি। দেখলাম রহমানও খানিকটা নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। পাকা লোক, মুখে আস্ফালন ছাড়ে না,—বুঝলে ভাই, আজ একটা হেস্তনেস্ত হবেই। আজ বাছাধনকে বুঝিয়ে দেবো।

হাতিবাগানের মোড়। পাশের একটা দোকানের ঘড়িতে

সাতটা বেজে দশ। ভদ্রলোক একটা পানের দোকানে দাঁড়ালেন। আমার তখন মনে হচ্ছিলো, ফুটপাথের উপরে শুয়ে পড়ি। একটা গ্যাসপোস্ট ধরে হাঁপাতে লাগলাম। রহমান পাশে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালো। খুব কাছেই দাঁড়িয়েছিলাম। শুনলাম, ভদ্রলোক দোকানদারকে বলছেন,—বহুৎ বরফ ডালকে একঠো লিমোনেড।

মনে হলো, আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। থুথু পর্যন্ত শুকিয়ে ধুলো। ঢোক গিলতে পারছি না। ক্লান্ত চোখে রহমানের দিকে তাকালাম। বোধ হয়, আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই রহমান চার পাশটা একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখে মাথা নাড়লে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, ধারে কাছে কোথাও পান বা সরবতের দোকান নেই, খেতে হলে ঐ একই দোকানে খেতে হয়। অতোটা সাহস হলো না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলাম।

লোকটা এক নিঃশ্বাসে বরফ দেওয়া লেমোনেডের গ্লাশটি শেষ করে দোকানিকে বললে,—পান।

পান খাওয়া শেষ হলে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার আমাদের দিকে তাকিয়েই হঠাৎ চিৎকার করে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠলো, 'এই আঁস্তাকুড়ের কুকুরগুলোর জন্যে আমার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। যেখানে যাবো ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে যাবে। আজ তোদেরই একদিন কি আমারই একদিন। আজ আমি তোদের ফলো করবো, দেখি কোথায় তোরা যাস।'

এই বলে আমাদের দিকে তেড়ে এগিয়ে এল, আমরা প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেলাম। পরে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে এক পা দু' পা করে পিছু হটতে শুরু করলাম। তাতেও বিপদ কাটলো না। বুঝলাম, আজ লোকটা মরীয়া। একটা অনর্থ কাণ্ড আজ ও বাধাবেই। তারপর ছুটতে শুরু করলাম। দেখি সেও ছুটতে আরম্ভ করেছে। রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম।

কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাঁ দিকের ফুটপাথ ধরে প্রাণের দায়ে ছুটে চলেছি, আট দশ হাত ব্যবধানে আর একটা লোক ছুটছে। কৌতূহলী পথচারীর দল থমকে দাঁড়ায়। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে,—ব্যাপার কি মশাই, চোর নাকি?

হঠাৎ দেখি বাঁ দিকের একটি গলি দিয়ে রহমান অদৃশ্য হয়ে গেল। এবার রীতিমতো ভড়কে গেলাম। পিছনে না চেয়ে আরো জোরে ছুটতে শুরু করে দিলাম, সময়ের হিসেব ছিলো না। তবে মনে হয়, আধ ঘণ্টা এইভাবে ছুটে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে যখন এলাম তখন আর আমার ছোটবার ক্ষমতা নেই। যা থাকে কপালে। মরীয়া হয়ে পার্কে ঢুকে পড়লাম। তারপর সটান ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম।

রাত দশটা পর্যন্ত এইভাবে শুয়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠলাম, দেখি পা দুটো ব্যথায় টন্ টন্ করছে। দেহের ভার বইতে আর তারা চাইছে না। কোনো রকমে দু' নম্বর বাস ধরে বাড়ি চলে এলাম। শুধু একমাত্র চিন্তা হলো—কাল থেকে ফের যদি ওখানেই ডিউটি দেয় তাহলে কি করবো!

পরদিন আপিসে যেতেই রহমান এক পাশে টেনে নিয়ে বললে—কালকের কথা কারো সাথে কয়েন না যেনো।

তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—পাগল হয়েছো? একি কইবার কথা ভাই? তবে দুঃখ এই, এবারে তোমার ডি-এটা মাঠে মারা গেল।

শুনতে পেলেও কোনও জবাব না দিয়ে রহমান অন্যদিকে চলে গেল।

কিসে কি হলো জানি না, আমাদের বেলেঘাটার ডিউটি বদলে গেল। এর পর সপ্তাহ দুই আর ডিউটি নেই। রোজ আপিস যাই, খানিক গল্প গুজব করি, তারপর বাড়ি চলে আসি। তখন জোর অসহযোগ আন্দোলন। রোজ মিটিং, ধরপাকড়, আই. বি. আপিস একটা নতুন উন্মাদনায় সব সময় সরগরম।

রতিলালবাবু ডেকে পাঠালেন। তাঁর ঘরে ঢুকতেই দেখি সেখানে তিল ধারণের স্থান নেই। পরিচিত অপরিচিত লোকে ভর্তি, ওরই মধ্যে রতিলালবাবু ইশারা করে আমায় অপেক্ষা করতে বললেন। আধ ঘণ্টা বাদে সবাই চলে যেতেই রতিলালবাবু

কোনোরকম ভূমিকা না করেই বললেন—কি, এইভাবেই চলবে, না ভালো কাজ কর্ম করবার ইচ্ছা আছে?

কি জবাব দেবো, চুপ করেই রইলাম।

হাতের কাজ শেষ করে ড্রয়ার থেকে রতিলালবাবু একটা বড় খাম বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—ভালো করে চেয়ে দেখো।

দেখলাম, পঁচিশ ত্রিশ বছরের একটি যুবকের হাফসাইজ, বাস্ট ফটো। জীবনে অনেক রকম মুখই দেখেছি, বেশির ভাগই ভুলে গিয়েছি। কতকগুলো ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, দু'-একটা এখনো মনে আছে তার মধ্যে এই ছবিটা। অসাধারণ সুপুরুষ, বলিষ্ঠ দেহ। সব চাইতে আকর্ষণীয় হলো চোখ দুটি। খুব বড় নয় অথচ তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী। স্থান কাল ভুলে ছবিটার দিকে তাকিয়ে আছি, চমক ভাঙলো রতিলালবাবুর কথায়—

—কি রকম দেখলে?

—ভালো।

রতিলালবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন—ছবিটা ভালো কি মন্দ দেখবার জন্য দিইনি। ভালো করে দেখো, মুখের মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য বা কোনো রকম চিহ্ন আছে কিনা যাতে করে হাজার ভিড়ের মধ্যেও চিনে নিতে পারা যায়।

এবার সত্যিই মন দিয়ে দেখতে শুরু করলাম। কিন্তু কোনো চিহ্ন বা বৈশিষ্ট্য নজরে পড়লো না। সাহস করে বললাম—একে যেখানে যে অবস্থায় দেখবো চিনে নিতে পারবো।

রতিলালবাবু আমার হাত থেকে ছবিটা নিয়ে আমাকে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন। চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে ছবিটার দিকে ঝুঁকে দেখতে লাগলাম। রতিলালবাবু ছবিটার বাঁ চোখের নিচে আঙুলটা দিয়ে বললেন—এখনো বুঝতে পারোনি? এটা কাঁচের চোখ!

ভালো করে চেয়ে দেখি, সত্যি ডান চোখ থেকে এটা যেন একটু অন্যরকম। তবে হঠাৎ কিছুতেই বোঝা যাবে না।

রতিলালবাবু ছবিটার দিকে চেয়ে বলতে লাগলেন—লোকটা dangerous political suspect, এখন পলাতক। ওকে ধরবার

জন্য গভর্নমেণ্ট পাঁচ হাজার টাকা রিওয়ার্ড ডিক্লেয়ার করেছে। বম্বে জানে ও জাতিতে পাঞ্জাবী, দিল্লীতে ও মুসলমান, বাংলাদেশে বাঙালী। এমনি ভিন্ন ভিন্ন দেশে ওর রূপ ও ভাষাও বদলে যায়। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও নিরুপদ্রব আন্দোলনে ও বিশ্বাস করে না, ওর ধারণা একমাত্র রক্তাক্ত বিপ্লবেই দেশের স্বাধীনতা আসবে।

কৌতূহল বেড়ে গেলো, বললাম—রতিদা, এ যে দেখছি শরৎচন্দ্রের পথের দাবীর সব্যসাচী।

রতিলালবাবু হাসলেন না, গম্ভীরভাবে বললেন—যতদূর মনে হয়, সব্যসাচী ছিলেন শরৎচন্দ্রের কল্পলোকের এক অসাধারণ সৃষ্টি ; কিন্তু আমাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় যতদূর জানি, এ লোকটি তাঁর কল্পনাকে বহুদূরে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে। আট-দশটি ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে, ছদ্মবেশ ধারণে ওর জোড়া আজও আমাদের চোখে পড়েনি।

জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু ওর সত্যি পরিচয়টা কী ?

মৃদু হেসে রতিদা বললেন, ছোট্ট একটি কথা—বাঙালী।

মনে হলো তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন গর্বও যেন লুকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম—এর নামটা কি ?

রতিদা হেসেই জবাব দিলেন—জেনে কোনো লাভ হবে না, শ্রীকৃষ্ণের ছিলো শত নাম এর সহস্র। তার মধ্যে কোনটা যে আসল, আমরাও জানি না, ছবিটা রেখে দাও। যখনই সময় পাবে, একবার করে দেখে নিও। তবে খুব সাবধান ; কেউ না দেখে ফেলে। আর একটা কথা, এই ছবিটার কপি হয়েছে অন্ততঃ হাজারটা। জেনে রাখো অন্ততঃ হাজার জন ওয়াচারকে ওই ছবির একটা করে কপি দেওয়া হয়েছে। তারা কলকাতার অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সাহস করে জিজ্ঞেস করলাম—সে যে কলকাতাতেই আছে, কি করে জানলেন ?

রতিদা বললেন—ওসব তোমার জানবার দরকার নেই। এইটুকু শুধু জেনো, আজ থেকে পনেরো দিনের মধ্যে কলকাতায় তাকে আসতেই হবে বিপ্লবীদের একটা জরুরী মিটিং-এ যোগ দিতে।

ছবিটা পকেটে রেখে যাবো কি যাবো না ভাবছি, রতিদা বললেন—তোমার সঙ্গে যাবে রহমান ও দীনেশ। তোমরা

ডিউটি দেবে আহিরীটোলা স্ট্রীট যেখানে চিৎপুরে এসে পড়েছে, সেই মোড়ে। সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত।

চারিদিকে তাকিয়ে রতিদা গলাটা একটু নামিয়ে বললেন—এটা আমার স্পেশাল ইনফরমেশান। ঐ রাস্তায় তার এক বিশেষ আত্মীয়ের বাড়ি। সেখানে সে একদিন আসবেই। এই জন্য রহমান আর দীনেশের সঙ্গে তোমাকে দিলাম। দেখো যদি ধরতে পারো; রিওয়ার্ড-এর টাকা তো পাবেই, তাছাড়া প্রমোশনও হবে। আজ বাড়ি গিয়ে ছবিটা খুব ভালো করে স্টাডি করো, কাল থেকে ডিউটি।

রহমান আর দীনেশ ছিলো রতিলালবাবুর অত্যন্ত প্রিয় এবং কাজও তারা সত্যিই ভালো করতো। ভাবলাম, দেখা যাক এবার কি করতে পারি। রতিলালবাবুর কাছে লোকটির যে পরিচয় পেয়েছি, তাতে খুব উৎফুল্ল হবার কথা নয়। তবুও ঐ একঘেয়ে ডিউটির চেয়ে এতে অন্তত খানিকটা বৈচিত্র্য আছে। বাড়ি চলে এলাম। রাত্রে লেপের মধ্যে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে আকুলভাবে বললাম—হে মা কালী! অন্তত এ রাঘববোয়ালটা যেন আমার হাতের মুঠোয় আসে···আরও অনেক কিছুই বলেছিলাম, মনে নেই, তারপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

সেকালের চিৎপুর রোড। স্যাঁতসেঁতে অপরিসর পুরনো রাস্তা। দেড় হাত চওড়া ফুটপাথ। পাশাপাশি দু'জন এক সঙ্গে যাওয়া কষ্টকর। আহিরীটোলা স্ট্রীট যেখানটায় এসে পড়েছে তার পুবদিকে একটা পুরনো বাড়ি ভেঙে ফেলে রাবিশগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেইখানটায় আমরা তিন মূর্তি এসে জড়ো হলাম। শীতকাল, মোটা র‍্যাপারে সবাই আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুধু নাক আর চোখ দুটো বার করে তিন জনে তিনখানা ইট নিয়ে গোল হয়ে বসলাম। রহমান প্রথমেই আমাকে সাবধান করে দিলে, যেন কোনও গল্প ফেঁদে না বসি। সব সময় চোখ কান সজাগ রেখে ডিউটি করতে হবে। তথাস্তু!

শীতের রাত গভীর হতে থাকে। আমরা তিন জন অন্ধকারে তিনটি প্রেতের মতো শুধু নাক আর চোখ দুটো বার করে আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে পথ চেয়ে বসে থাকি আর মাঝে মাঝে সিগারেট ধরাই। রাত্রি এগারোটার পর যানবাহন ও লোকচলাচল ক্রমেই বিরল হয়ে আসে, শুধু জেগে আছি আমরা তিনটি প্রাণী আর স্থানীয় রাতজাগা কয়েকটি বারবিলাসিনী। মাঝে মাঝে আশেপাশের বাড়ি থেকে মদির-বিহ্বল হল্লা হঠাৎ রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দিয়ে যায়। আমার জীবনে এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। রহমান ও দীনেশ দেখলাম everything proof। তাদের কাছে এ একটা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। হাত পা ধরে গেলে খানিক পায়চারি করে নিই, নয়তো একটু এগিয়ে গিয়ে আলোকোজ্জ্বল একটা জানলার কাছে দাঁড়াই। যা দেখি তা আমার কাছে নাটকীয় বীভৎস মনে হলেও রহমান ও দীনেশের কাছে জলভাত।

রহমান হেসে বলে,—কি দেখছেন, চলে আসুন।

লজ্জা পেয়ে ফিরে এসে ইটের উপর বসি, রাত বেড়েই চলে। বীটের কনস্টেবল এক পা এক পা করে এগিয়ে আসে। রহমান উঠে গিয়ে ফিসফিস করে কি বলে। সে হেসে সেলাম করে সরে পড়ে।

এইভাবে পনেরো দিন কেটে গেল। রোমাঞ্চকর কিছু ঘটা দূরে থাক, ব্যাপারটা ক্রমেই একঘেয়ে হয়ে উঠলো। আশেপাশের রাতজাগা সুন্দরীরা আর আমাদের ইশারা করে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে না। তিনচারজনে হাসাহাসি করে, আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে কি যেন বলাবলি করে। এর মধ্যে একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হলো। আগে যাদের দেশমাতৃকার চরিত্রবান একনিষ্ঠ সন্তান বলে মনে মনে শ্রদ্ধা করতাম, দেখলাম তাদেরও কেউ কেউ গভীর রাতে গাড়ি করে আপাদমস্তক র‍্যাপার বা শালে ঢেকে এখানে কয়েকটি বাড়িতে নিয়মিত পায়ের ধুলো দেন। এঁদের মধ্যে আছেন খদ্দরপরা বিখ্যাত দেশনায়ক, প্রফেসর, দোকানদার, কলেজ স্টুডেণ্ট আর কতো নাম করবো। প্রথমদিন রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, পরে গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিলো।

সেদিন সন্ধ্যে থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিলো। একটা বাড়ির রোয়াকে গিয়ে দাঁড়াতেই রহমান বললে,—না, আজ হাজার ঝড় বৃষ্টি হলেও জায়গা ছেড়ে যাওয়া চলবে না।

অগত্যা সেই ইটের উপর বসে ইঁহুর-ভেজা ভিজতে লাগলাম, মাঝে রতিলালবাবু ছু'বার এসে ঘুরে গিয়েছেন। ভাবলাম আজ নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটবে।

রাত তখন ন'টা সাড়ে ন'টা হবে মনে হয়। শীতের রাত, তার উপর বৃষ্টি। পথ অন্যদিনের তুলনায় জনবিরল, শুধু মাঝে মাঝে ট্র্যাম বাসগুলো একটানা খ্যাং খ্যাং আওয়াজ করে চলে যাচ্ছে। হঠাৎ দীনেশ ও রহমান উঠে দাঁড়ালো। দৃষ্টি তাদের আবছা অন্ধকার আহিরীটোলা স্ট্রীটের উপর। প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলাম না। পরে দেখলাম একটা মুটের মাথায় একটি বেডিং ও হাতে একটি স্যুটকেস, তার পিছনে একটি লোক। লম্বা কালো ওভারকোটে সর্বাঙ্গ ঢাকা। চোখে কালো চশমা, মাথায় কালো গুজরাটি টুপি। সমস্ত শরীর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে গেল। লোকটি মুটেকে নিয়ে ততোক্ষণে ট্র্যাম-স্টপেজের কাছে এসে পড়েছে। চোখের নিমেষে দেখি রহমান ও দীনেশ তাকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। কীসে কী হলো বোঝবার আগেই দেখি সেই নির্জন রাস্তায় রীতিমতো ভিড় জমে গিয়েছে। রহমান লোকটার হাত ছুটো পেছন দিকে ধরে আছে আর দীনেশ চোখের চশমা খুলে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। রাগে লোকটার চোখ মুখ লাল, চারদিকে চেয়ে সে শুধু খুঁজছে পুলিস। দেখলাম ছু'-চারটে পুলিসও এসে গিয়েছে। ঠিক এমনি সময়ে রতিলালবাবু ভিড় ঠেলে এসে হাজির। এক নজর চেয়েই রহমানকে বললেন—ছেড়ে দাও।

কৌতূহলী জনতা তখন লোকটিকে ঘিরে নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত করে তুললো। মোট ব্যাপারটা জানা গেল—লোকটির নাম হরেন্দ্রনাথ বোস, দিল্লীতে চাকরি করেন। আদি বাড়ি আহিরীটোলা স্ট্রীটে, যাচ্ছিলেন হাওড়ায় শ্বশুরবাড়িতে। কাল সকালের ট্রেনে দিল্লী যাবেন। হঠাৎ হরেনবাবুর হুঁশ হলো, চিৎকার করে বললেন—আমার বেডিং, স্যুটকেস? মুটে গেলো কোথায়?

খোঁজ খোঁজ, চারদিকে মুটের খোঁজে লোক ছুটলো। আমরা ততোক্ষণে পুরনো জায়গায় সেই ইটের উপর এসে বসেছি, শুধু রতিলালবাবু দাঁড়িয়ে। দীনেশ ও রহমানকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন—এতদিনের পাকা লোক হয়ে তোমাদের এ ভুল কী করে হলো আমি বুঝতে পারি না। আজ পাঁচ দিন হলো ও আহিরীটোলা এসেছে, এ খবর তোমরা জানতে। আজ সে পালাবার চেষ্টা করবে তাও তোমাদের জানিয়ে দিয়েছিলাম। তবুও এরকম ভুল কেন হলো?

সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন হেঁয়ালির মতো লাগছিলো। দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো রতিলালবাবুর পরের কথা শুনে—আহাম্মকের মতো মুটেটাকে ছেড়ে দিয়ে লোকটাকে ধরতে গেলে? তিন জন তো ছিলে। তোমাদের নীরেট মাথায় এটা কি ঢুকলো না যে, ভদ্রলোক সেজে সে তোমাদের চোখে ধুলো দিতে পারবে না?

একটু পরে আমাদের পাশের রাবিশগুলোর উপরে হরেনবাবুর স্যুটকেস ও বেডিং পাওয়া গেল। কিছুই খোয়া যায়নি।

এই ঘটনার পর আপিসে আমাদের অবস্থা বেশ একটু খারাপ হয়ে গেল। ব্যাপারটা অল্প বিস্তর সবাই জানতে পারলো। বিশেষ করে রতিলালরাবু, রহমান ও দীনেশের অবস্থা বেশ একটু ঢিলে হয়ে গেল। আমার কথা বাদই দিলাম। ক'দিন ধরে দেখি আমাদের দলের সবাই বেশ মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর অপর পক্ষ ছুতোয় নাতায় সেদিনকার ঘটনাটা তুলে তাতে খানিকটা নুনের ছিটে দিতে কসুর করছে না। বেশ কিছুদিন এইভাবেই কাটলো।

সেদিন আপিসে যেতেই শুনলাম আমার ডিউটি পড়েছে আউটরামঘাটে। রেঙ্গুন থেকে যে সমস্ত যাত্রীবাহী জাহাজ কলকাতায় আসে সেগুলোর উপর দৃষ্টি রাখাই হবে আমার কাজ। যদি কারোও প্রতি সন্দেহ হয়, তাকে ফলো করে কোথায় কোন

ঠিকানায় ওঠে দেখে পরদিন আপিসে রিপোর্ট দিতে হবে। খুব আরামের ডিউটি। সপ্তাহে মাত্র দু'দিন রেঙ্গুন থেকে জাহাজ কলকাতায় আসে, সেই দু'দিন আউটরামঘাটে ডিউটি দিয়ে বাকি ক'দিন ছুটি। বেশ আরামে আছি। আমার সঙ্গে এবার ডিউটি পড়লো এস. বি. আপিসের একজন পাকা ওয়াচার সুবোধের। জাহাজ আসবার ঘন্টাখানেক আগে আউটরামঘাটের দোতলায় বেঞ্চির উপর বসে দিব্যি গঙ্গার হাওয়া খাই আর সুবোধের সঙ্গে রাজ্যের গল্প করি। জাহাজ এলে রেলিং-এর ধারে গিয়ে দাঁড়াই, দেখি অগুন্তি লোক নামছে। কিন্তু আমাদের শিকার অর্থাৎ খদ্দরপরা, চুল উষ্কখুষ্ক, স্বদেশী বা বিপ্লবী কোনও যুবককে নামতে দেখি না। সব চলে গেলে সুবোধের দিকে তাকাই, ঈষৎ হেসে সুবোধ বলে—চলুন, বাড়ি যাই।

পরদিন যথারীতি আপিসে রিপোর্ট দাখিল করি—Attended duty at Outramghat. The S. S. (Steam Ship) 'Arankola' came at about 2-30 P.M. No suspicious person was found.

আউটরামঘাটের ডিউটিতে আর একটা মস্ত সুবিধা ছিলো যে, পরিচিত কারো সাথে যদি দেখা হয়ে যেতো অনায়াসে বলে দিতে পারতাম—আমার আত্মীয় রেঙ্গুন থেকে আসবেন, তাই অপেক্ষা করছি।

দিন যায়, মাস যায়, এইভাবে প্রায় চার মাস কেটে গেল। হঠাৎ একদিন সুবোধ বললে—ধীরাজবাবু একটা কিছু ভালো রিপোর্ট না দিতে পারলে চাকরি বজায় রাখা কঠিন।

বললাম—তাই বলে মিছিমিছি একটা নিরীহ লোককে ধরে যা তা একটা রিপোর্ট দেওয়া ঠিক হবে কি?

আমার কথার কোনো জবাব না দিয়ে সুবোধ দোতলার বারান্দার উপর পায়চারি করতে শুরু করে দিলো।

সেদিন জাহাজ আসবার টাইম ছিলো দুটো, বেলা দেড়টা থেকে জেটিতে অসম্ভব ভিড় হয়ে গেল। সুবোধকে কারণ জিজ্ঞেস করলাম, সে কিছুই জানে না। বেলা দুটো বেজে গেল। জাহাজের দেখা নেই, অথচ আউটরামঘাটের ওপর-নিচে লোকে লোকারণ্য।

সেদিন জাহাজ দেরিতেই এল। প্রায় পৌনে তিনটে। এত ভিড় রেঙ্গুনের জাহাজে আগে কখনো দেখিনি। দূর থেকে মনে হলো দলা পাকানো অগুন্তি নরমুণ্ড একটু একটু করে জেটির দিকে এগিয়ে আসছে।

জেটি থেকে জাহাজে সিঁড়ি লাগিয়ে দেওয়ার পর শুরু হলো নামবার পালা। ইংরেজের সংখ্যাই বেশি, তারপর বাঙালী, মারোয়াড়ী, চীনে ও মাদ্রাজী কুলি একের পর এক নেমেই চলেছে আর আমরা সিঁড়ির তু'পাশে দাঁড়িয়ে শ্যেন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। কিন্তু হায়! আমাদের শিকার এর মধ্যে একটিও দেখতে পেলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা এইভাবেই কাটলো, তখন প্রায় সবাই নেমে গিয়েছে। হতাশ হয়ে চলে আসবো কিনা ভাবছি হঠাৎ সুবোধ আমার হাতে একটু চাপ দিলো। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, চব্বিশ-পঁচিশ বছরের খদ্দর পরিহিত একটি ছেলে, হাতে একটি টিনের স্যুটকেস। মাথার চুল দীর্ঘ ও অযত্নে রুক্ষ। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাইতে চাইতে একলা সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে। আমার বুকের মধ্যে ঢিব্ ঢিব্ করে উঠলো। সুবোধের দিকে চেয়ে দেখি একটা নির্ঘাৎ শিকার পাকড়াবার উত্তেজনায় তার চোখ মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে। ইশারায় আমায় একটু দূরে নিয়ে বললে—কাছে থাকবেন না, এর চেহারা দেখে বলে দিতে পারি এ্যানার্কিস্ট। চোখের চাউনিটা লক্ষ্য করেছেন?

আমি কিছু বলবার আগেই সুবোধ হাত ধরে টান দিলো। দেখলাম, আমাদের এ্যানার্কিস্ট শিকারটি স্যুটকেস হাতে ধীরে ধীরে জেটি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। বলা বাহুল্য, আমরাও একটু দূরে থেকে পিছু নিলাম।

হাইকোর্টের ট্র্যাম, ডিপো থেকে বেরিয়ে স্টপেজের কাছে এসে দাঁড়ালো। দেখলাম আমাদের শিকার নির্বিকারভাবে স্যুটকেসটা তুই হাতে বুকের উপর চেপে দাঁড়িয়ে আছে। ট্র্যাম যাত্রী নিয়ে গন্তব্যপথে চলে গেল কিন্তু সে তবু ঠায় দাঁড়িয়ে। যেন কোনো তাড়াই নেই যাবার।

সুবোধ কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললে—একটা জিনিস লক্ষ্য করেছেন? ঐ স্যুটকেসটা? মুটের হাতেও দিলে না,

মাটিতেও নামাচ্ছে না? চোরের মতো খালি এদিক ওদিক চাইছে!

কৌতূহল ও উত্তেজনায় আমার মুখ দিয়ে বোধহয় একটু জোরেই বেরিয়ে গেল—বোমা না পিস্তল?

—আঃ আপনি দেখছি সব মাটি করবেন।

বলেই সুবোধ এমনভাবে আমার দিকে চাইলো, যেন সম্ভব হলে সে আমাকে গুলী করে মারতেও দ্বিধা করবে না। ভারি লজ্জা পেলাম। মনে মনে ভাবলাম, যেখানেই ডিউটিতে যাই, একটা কাণ্ড করে বসি। আজ যদি নির্বিবাদে অন্তত এই শিকারটিকে ডাঙায় তুলতে পারি, তাহলে কিছুটা মুখ রক্ষা হবে।

দেখি তিন চারখানা ট্র্যাম এইভাবে ছেড়ে দিয়ে, যুবকটি ডান হাতে স্যুটকেসটি নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করেছে ডালহৌসি স্কোয়ারমুখো। আমরাও পিছু নিলাম। চৌমাথার কাছে যেখানটায় ট্র্যাম ঘোরে সেখানটায় এসে দাঁড়ালো। চোখে সেই শঙ্কিত চাহনি। একটার পর একটা ট্র্যাম এসে দাঁড়াচ্ছে, যাত্রী নিয়ে আবার ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ভ্রূক্ষেপ নেই, দাঁড়িয়েই আছে লোকটি। বোধহয় এইভাবে আধ ঘণ্টা কেটে গেল। হঠাৎ দেখি শিয়ালদার একটি ট্র্যামে ও উঠে পড়েছে। সুবোধ ও আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে পড়লাম। ভাগ্যিস ওখানে ট্র্যাম একটু বেশিক্ষণ থামে, নইলে চলতি ট্র্যামে উঠতে হলেই হয়েছিলো আর কি! দেখলাম সুবোধের মুখ গম্ভীর! ফার্স্ট ক্লাশের একটি বিশেষ যাত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে মহাসমাধিমগ্ন। ধর্মতলা এসে গেল, ট্র্যাম ভালো করে তখনও থামেনি। দেখি চোখের নিমেষে সুবোধ উঠে সেই চলতি ট্র্যাম থেকে নেমে পড়লো। মুখ বাড়িয়ে চেয়ে দেখি, আমাদের শিকারটিও হঠাৎ কখন নেমে পড়েছে। বাবা মা'র নিষেধের কথা মনে পড়লো। পা-দানির কাছে এসে দাঁড়ালাম। একটু পরে ট্র্যাম থামতেই নেমে পড়লাম।

স্যুটকেস হাতে শঙ্কা-ব্যাকুল চোখে চারদিকে চাইতে চাইতে আমাদের শিকার এসে দাঁড়ালো ট্র্যাম-স্টপেজের কাছে। আবার শুরু হলো সেই একই খেলা। ট্র্যামের পর ট্র্যাম ছেড়ে চলে

যাচ্ছে ওঠবার নামগন্ধ নেই। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে স্যুটকেস হাতে চারিদিকে চাইছে।

···লোকটা পাগল নাকি ? বললাম সুবোধকে।

—পাগল না হাতি! পাকা বদমাশ। ও খালি চাইছে আমাদের চোখে ধুলো দিতে।

বুঝলাম সুবোধ খুব চটেছে। আর সত্যি চটবারই কথা! এইভাবে আরও পনেরো কুড়ি মিনিট কাটলো। তারপর হঠাৎ দেখি লোকটি আবার শিয়ালদার ট্র্যামে উঠে বসেছে। সুবোধ রাগে গজগজ করে কি বললে বুঝতে পারলাম না। আমরাও সেকেণ্ড ক্লাশে উঠে এবার আর বসলাম না, সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। কি জানি কখন আবার হুট করে নামতে হবে। এর মধ্যে আর উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটলো না। ট্র্যাম শেয়ালদা স্টেশনে এসে দাঁড়ালো। সব যাত্রী নেমে গেল। দেখি আমাদের শিকার তখনও ঠায় বসে আছে স্যুটকেসটা কোলের উপর নিয়ে। কণ্ডাক্টর কি যেন বলতেই আস্তে আস্তে উঠে নেমে গেল। এদিক ওদিক দু'চারবার চেয়ে সামনের নর্থ স্টেশনে ঢুকে পড়লো। আমরাও হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। টিকিট কাউন্টারের সামনে রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে যত রাজ্যের বিজ্ঞাপনগুলো পড়ে ফেললে, তারপর স্যুটকেসটা মাটিতে রেখে তার উপর বসে পড়লো।

সুবোধের দিকে তাকালাম, দেখলাম সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। বললাম,—ও যদি কোনো ট্রেনে যায়, তাহলে আমরা কি করবো ?

সুবোধ বললে,—আমরাও ওর সঙ্গে যাবো!

—কিন্তু টাকাকড়ি তো বিশেষ কিছুই আনিনি।

সুবোধ হো হো করে হেসে উঠলো, বললে,—কিছুই দরকার হবে না। ডিটেক্‌টিভ ওয়ারেন্টখানা সঙ্গে আছে তো ?

সত্যিই ভুলে গিয়েছিলাম। ছোট্ট একটি মাদুলির মতো কৌটোয়, ছোট্ট একটি কাগজ। কিন্তু অসীম তার প্রভাব, বিশেষ বিপদে পড়লে ঐটি বার করে শুধু দেখাও—ব্যস্। তোমার যেখানে খুশি যাও। কেউ বাধা দেবে না। পরে অবশ্য রেল কোম্পানি গভর্নমেন্টের কাছ থেকে রেলের মাশুল আদায় করে নেবে।

আমাদের কথা হচ্ছিলো চায়ের স্টলটার সামনে। দু'কাপ চা শেষ করে সুবোধ আর আমি দুটো সিগারেট ধরালাম। সেখান থেকে আমাদের শিকার একটু দূরে হলেও বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। দেখলাম, সে সেই উদাস ফ্যালফ্যালে চোখে অগণিত যাত্রীর দিকে তাকাচ্ছে। এর যেন ক্ষুধা তৃষ্ণা কিছু নেই, নেশাও নেই। ও যেন কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যাকে খুঁজছে তাকেও হয় তো ও চেনে না। চোখে সে অনুসন্ধিৎসা নেই। ঠায় টিনের স্যুটকেসের উপর বসে আছে। আমরাও স্টলের দু'খানা চেয়ারে বসে আছি। শুধু কারো জন্যে অপেক্ষা না করে চলে যাচ্ছে অগুন্তি কর্মব্যস্ত যাত্রীর দল আর সময়।

দু'ঘণ্টার ওপর কেটে গেল, কিন্তু পট পরিবর্তন হলো না। ও একভাবে বসে আছে, আমরাও বসে আছি। মাঝে পালা করে একটু ঘুরে আসি, সিগারেট খাই। বলা বাহুল্য, এতোক্ষণে শুধু স্টলে নয়, রেলওয়ের সমস্ত স্টাফ জেনে গিয়েছে যে, আমরা টিকটিকি পুলিসের লোক, যাকে লক্ষ্য করে বসে আছি, তাকেও চিনে ফেলেছে। আর সত্যি কথা, ওভাবে অতোক্ষণ এক জায়গায় বসে থাকে হয় পাগল নয়তো সর্বহারা ভিখারী।

স্টেশনের পুলিস কনস্টেবলটি প্রথম প্রথম দেখলাম ঝোপ বুঝে বেশ দু' পয়সা রোজগার করছে। আমাদের পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবার পর, দেখি সে হঠাৎ সাধু হয়ে উঠেছে। ফেরিওয়ালারা দু'চার পয়সা দিতে এলে খুব দশ কথা শুনিয়ে দিচ্ছে।

স্টেশনের এই বিচিত্র পরিবেশে আরো এক ঘণ্টা কেটে গেল কখন টেরও পেলাম না। ট্র্যামের মতো ঘন ঘন না হলেও ট্রেনের পর ট্রেন আসছে যাচ্ছে। ওর কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। কোথাও যাবার তাড়া আছে বলেও মনে হয় না। সুবোধকে বললাম,—এভাবে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করবে? ও কোথাও যাবে বলে তো মনে হয় না।

একটু চুপ করে থেকে সুবোধ বললে,—দাঁড়ান একটা কিছু সত্যিই করা দরকার।

দেখি এক পা দু' পা করে সুবোধ কনস্টেবলটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, তারপর তাকে ইশারা করে একটু দূরে নিয়ে গেল। কৌতূহল বেড়ে গেল। আমিও সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সুবোধ জিজ্ঞাসা করলো,—তোমার নাম কি ?

—শিউশরণ সিং, হুজুর।

একটু হেসে সুবোধ বললে,—তুমি আমাদের চিনতে পেরেছো ?

সেলাম করে শিউশরণ বললে,—জী, আপ্ তো টিকটিকি পুলিসসে আয়া !

—টিকটিকি হই আর গিরগিটি হই তুমি আমাদের ওভাবে সেলাম করো না। তাহলে সব জানাজানি হয়ে যাবে। আর আমাদের শিকারটিও পালাবে। হিন্দী বাঙলায় মিশিয়ে সুবোধ কথাগুলি বলে গেল, তারপর আঙুল দিয়ে দূরে আমাদের শিকারটিকে দেখিয়ে গলাটা একটু নিচু করে বললে,—দেখো শিউশরণ! তুমি আস্তে আস্তে ঐ বাবুটির কাছে যাও। প্রথমে জিজ্ঞাসা করবে, কোথায় ও যাবে। তারপর ঐ স্যুটকেসটা খুলতে বলবে। কিন্তু খবরদার, আমাদের পরিচয় দিও না বা আমরা যে তোমায় স্যুটকেস খুলতে বলেছি, একথাও বলো না।

ব্যাপারটা রীতিমতো ঘোরালো হয়ে উঠলো। প্রকাণ্ড গোঁফ ছুটো হাত দিয়ে পাকিয়ে, কোমরের বেল্টটা নেড়েচেড়ে রুলটাকে ঠিক করে নিয়ে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে চললো শিউশরণ সিং। দূরে থেকে আমরাও এক পা ছু' পা করে এগোতে লাগলাম।

ঠিক সেই সময় একটা ট্রেন ইন করলো। চোখের নিমেষে অগণিত যাত্রীতে প্ল্যাটফরম ভরে গেল। ততোক্ষণে শিউশরণ শিকারটির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সুবোধ ও আমি প্রমাদ গুণলাম। শিউশরণ কোমর থেকে রুলটা বার করে বেশ বাগিয়ে হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—এই, তুম্হারা নাম কি ?

ভয় পেয়ে চারদিক চাইতে চাইতে ছেলেটি জবাব দিলে—কেন ? আমার নামে তোমার দরকার কি ?

কৌতূহলী হুজুগপ্রিয় জনতা ততক্ষণ ভিড় করে তার চারপাশে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। শিউশরণ মোটেই দমবার পাত্র নয় ; তাছাড়া বীরত্ব প্রকাশের এরকম একটা সুযোগ সে মোটেই ছাড়তে রাজী নয়। গোঁফের ডগা ছুটো একটু চুমরে নিয়ে শিউশরণ জবাব দিলে—হামার দোরকার কেনো থাকবে। উধার দেখো, টিকটিকি দো-বাবু পুছতা হ্যায়।

বলে সে সোজা আমাদের দেখিয়ে দিলে। জনতা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে একবার আমাদের দিকে দেখছে, আবার ছেলেটির দিকে দেখছে।

শিউশরণ বললে—খুলো স্যুটকেস।

—কেন? স্যুটকেস খুলবো কেন? সভয়ে বললে ছেলেটি।

—আভি খুলো, নেহি তো হাম তোড় দেঙে।

এদিকে রাগে সুবোধের মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে প্রথমে শিউশরণের মুণ্ডপাত করলে তারপর আমার দিকে ফিরে বললে—আসুন ধীরাজবাবু, আর চুপ করে থেকে লাভ নেই। যা হয় হবে।

সুবোধ ছেলেটির কাছে এগিয়ে এসে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলে—আপনি রেঙ্গুন থেকে আসছেন?

একটু চুপ করে থেকে ছেলেটি জবাব দিলে—হ্যাঁ।

—স্যুটকেস খুলুন, আমরা দেখবো।

ছেলেটি অসহায় চোখে একবার আমার একবার সুবোধের মুখের দিকে চাইতে লাগলো। কোনো জবাব দিলে না।

এবারে সুবোধ একটু রুক্ষস্বরে বললে—ভালোয় ভালোয় খুলুন বলছি, নইলে আপনাকে এ্যারেস্ট করে থানায় নিয়ে যাবো। সেই আউটরামঘাট থেকে জ্বালাচ্ছেন, আর জ্বালাবেন না।

কৌতূহলী জনতার মধ্যে থেকে দু'-একজন বলে উঠলো—খুলে দেখিয়ে দিন না মশাই।

কাঁদো কাঁদো স্বরে ছেলেটি বললে—আমায় বিশ্বাস করুন, এর মধ্যে এমন কিছু নেই যার জন্যে আমায় এ্যারেস্ট করতে পারেন।

—বেশ তো, সেইটেই আমরা দেখতে চাই উঠুন।

ছেলেটি ভয়ে ভয়ে স্যুটকেসের উপর থেকে উঠে দাঁড়ালো।

সুবোধ পুরোপুরি পুলিসী সুরে বললে—এবার লক্ষ্মী ছেলেটির মতো স্যুটকেসটা খুলুন।

শেষবারের মতো একবার চারিদিকে চেয়ে আস্তে আস্তে ছেলেটি উবু হয়ে বসে সেই রহস্যময় ছোট্ট পুরোনো টিনের স্যুটকেসটি চাবি দিয়ে খুললো। কৌতূহলী জনতা যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লো। শিউশরণ গম্ভীরভাবে সকলকে দূরে সরিয়ে দিলে।

খদ্দরের কাপড় আর তার সঙ্গে একটা ছেঁড়া ফতুয়া ভাঁজ করা রয়েছে। সুবোধ বললে—তুলুন ওগুলো।

সেগুলো তোলা হলে দেখা গেল, তার নিচে রয়েছে দু'খানা মোটা বই। এক খানা গীতা, আরেকখানা রমেশচন্দ্রের গ্রন্থাবলী। পাশে দেখা গেল একটা আধ-পুরোনো টুথপেস্ট। একটা ব্রাশ ও একটা জিভছোলা। অন্য পাশে সুতো দিয়ে বাঁধা কতকগুলো চিঠির বাণ্ডিল। খাম ও পোস্টকার্ড, অশিক্ষিত মেয়েলি হাতের লেখা।

সবার নিচে কাগজমোড়া একটা ছবির মতো কি রয়েছে। সুবোধ বললে—ওটা কি খুলুন তো?

আস্তে আস্তে ছেলেটি সেটি স্যুটকেসের তলা থেকে তুলে বুকে চেপে ধরলো। দেখলাম, চোখ দুটো তার জলে ভরে উঠেছে। সুবোধের দিকে তাকালাম। বলতে চাইলাম, ঢের হয়েছে। অনেক রিভলভার বোমা তো পেলে, এবার ওকে রেহাই দাও। সুবোধ কিন্তু মরীয়া। মায়া, মমতা, চোখের জলে কাবু হবার দুর্বলতা সে অনেকদিন আগেই কাটিয়ে উঠেছে। তেমনি কঠোর স্বরে সুবোধ বললে—ন্যাকামি রাখুন, দেখান ওটা কি।

অতি যত্নে কাগজ দিয়ে মোড়া জিনিসটি সে ধীরে ধীরে খুলতে লাগলো। রুদ্ধনিঃশ্বাসে সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম, বহুদিনের পুরোনো একখানি ফটো, জায়গায় জায়গায় ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছে। একটি বিধবা মহিলা, বয়েস আন্দাজ ৫০।৫৫ হবে। হাতে হরিনামের মালা নিয়ে জপ করছেন।

এবারে ছেলেটি কেঁদে ফেলেছে। কার ছবি জিজ্ঞাসা করতেই ছেলেটি জানালো—তার বিধবা মায়ের ছবি। সংসারে ঐ এক মা ছাড়া আর কেউ নেই। সে নিজে অনেক সুপারিশ যোগাড় করে রেঙ্গুনে এক ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারের চাকরি করতো। সামান্য যা মাইনে পেতো তা থেকে প্রতি মাসে কিছু কিছু মাকে পাঠিয়ে দিতো। এইভাবে প্রায় বছর তিনেক কেটেছে। চিঠির বাণ্ডিলগুলো দেখলাম, সবই মায়ের একমাত্র ছেলেকে লেখা। সবগুলোতেই প্রায় একই কথা—সাবধানে থেকো, আমাকে প্রতি মাসে টাকা পাঠাবার দরকার নেই, শরীরের উপর যত্ন নিও, ইত্যাদি।

মায়ের শেষ চিঠিখানা বুক পকেট থেকে বের করে আমার হাতে দিলে। দেখলাম পোস্টকার্ডে লেখা—

'খোকা, এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা ভগবান বোধহয় পূর্ণ করিবেন। চক্কোত্তি পাড়ার দীনু চক্কোত্তির মেয়ে টুনীর সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করিয়াছি। তুমি যে টাকা পাঠাইতে, তাহা জমাইয়া মেয়ের মোটামুটি সব গহনা গড়াইয়াছি। ওরা বড় গরীব। কিন্তু তুমি সুখী হইবা। একারণে ওখানেই ঠিক করিলাম, তুমি পত্রপাঠ এক মাসের ছুটি লইয়া বাড়ি আসিবা। বৈশাখের ২৫শে ভিন্ন দিন নাই। আর আর সমস্ত সাক্ষাতে বলিব ও শুনিব। ইতি। আশীর্বাদিকা—মা।'

চিঠিখানা গণেশকে ফেরত দিলাম। বলতে ভুলে গিয়েছি ছেলেটির নাম গণেশ চৌধুরী। গণেশ বলতে লাগলো—ছুটি তো পেলাম। কিন্তু রওনা হবার আগের দিন আমার ভাবী শ্বশুর দীনু চক্রবর্তীর চিঠি এল। তিনি জানিয়েছেন,—আজ সাত দিন হলো আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে, একরকম অনাহারে ও বিনা চিকিৎসায়। আমি যে টাকা পাঠাতাম তা সব তিনি আমার বিয়ের জন্য জমিয়ে রাখতেন, ভালো করে পেট ভরে কোনোদিন খাননি মা। গণেশ হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো। কি সান্ত্বনা দেবো! অপরাধীর মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুবোধের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অন্যদিকে ফিরে সে সিগারেট ধরাচ্ছে। এ ব্যাপারের এরকম পরিণতি হতে পারে এটা তারও কল্পনার বাইরে ছিলো।

একটু শান্ত হয়ে গণেশ বললে—দেশে কার কাছে যাবো বলতে পারেন? যে ভিটেয় মা নেই, সেখানে এক রাতও আমার পক্ষে কাটানো অসম্ভব। রেঙ্গুনেও আর আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। কার জন্য চাকরি করবো?

আবার রুদ্ধ কান্নায় ভেঙে পড়লো গণেশ। আমার হাত দুটো ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে—আপনারা দয়া করে আমায় এ্যারেস্ট করে জেলে আটকে রেখে দিতে পারেন? এভাবে আমি হয়তো পাগল হয়ে যাবো।

নীরব সান্ত্বনা দিয়ে এক পা এক পা করে স্টেশনের বাইরে চলে এলাম। চোখ দুটো কখন যে জলে ঝাপ্‌সা হয়ে গিয়েছে জানতে পারিনি। সে আজ অনেকদিনের কথা। অনেক ঘটনা ভুলে গিয়েছি, অনেকগুলো বিস্মৃতির কুয়াশায় আবছা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আজও ভুলতে পারিনি গণেশকে লেখা আশীর্বাদিকা মায়ের সেই চিঠিখানির ভাষা।

চেয়ে দেখি, ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে চেয়ে চুপ করে সুবোধ দাঁড়িয়ে আছে। পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ম্লান হেসে সুবোধ বললে—চলুন, আর কেন?

কোনও জবাব দিলাম না। দু'জনে ধর্মতলার ট্র্যামে উঠে বসলাম।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে আপিসে গিয়ে শুনলাম, আমাদের কয়েকজনকে সারদায় ট্রেনিং-এ পাঠানোর অর্ডার হয়ে গিয়েছে। বুঝলাম, এর মধ্যে রতিলালবাবুর প্রচ্ছন্ন হাত রয়েছে। যাই হোক, বেঁচে গেলাম। এই একঘেয়ে বিশ্রী ডিউটির হাত থেকে এতোদিনে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। ট্রেনিং শেষ করে এলে যে কোনো জেলার থানায় বদলি করে দেবে। সে অনেক ভালো। নির্দিষ্ট দিনে বাক্স বিছানা গুছিয়ে অজানা দেশে এক নূতন অভিজ্ঞতালাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

সারদার ট্রেনিং থেকে বেশ ভালোভাবে পাশ করে কলকাতায় ফিরে এসেছি। সে এক অদ্ভুত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। কূলহারা পদ্মার উত্তর দিকে প্রায় হাজার বিঘে জমির উপর সারদা পুলিস ট্রেনিং সেণ্টার। আগেই বলেছি, আমরা ছিলাম বেঙ্গল পুলিসের অধীনে। 'এ. এস. পি.' থেকে শুরু করে সাধারণ কনস্টেবল পর্যন্ত সবাইকে এখানে ট্রেনিং নিতে হতো। প্রকাণ্ড একটা হলের মতো ঘরে আমরা প্রায় ষাট জন (এ. এস. আই.) থাকতাম। ভোর পাঁচটায় বিউগিল বাজলেই তাড়াহুড়ো করে

বিছানা ছেড়ে উঠে প্রাতঃকৃত্য ইত্যাদি শেষ করে ঠিক ছ'টার সময় পোশাক পরে রাইফেল নিয়ে পদ্মার পাড়ে প্যারেড গ্রাউণ্ডে গিয়ে দাঁড়াতে হতো। তারপর প্রায় দেড় ঘণ্টা এক-নাগাড়ে দৌড়-ঝাঁপ ও ড্রিল করে যখন প্রায় আধমরা হয়ে যেতাম তখন আধ ঘণ্টার ছুটি মিলতো। তারই মধ্যে কিছু খেয়ে নিয়ে ড্রিলের পোশাক বদলে খালি পায়ে খাকি হাফপ্যাণ্ট ও হাফসার্ট পরে আবার গিয়ে দাঁড়াতে হতো। তারপর শুরু হতো খেলা ও নানারকমের ব্যায়াম। যেমন, বারো তেরো হাত উঁচু সিমেণ্ট-করা পাঁচিল টপকানো, প্যারালালবারের নানারকম কসরৎ, হাইজাম্প, লঙজাম্প ইত্যাদি। ঘণ্টা দেড়েক পরে আবার আধ ঘণ্টার ছুটি। তার মধ্যে পোশাক বদলে আবার ল' ক্লাশে যেতে হতো। সেখানে প্রায় ছু' ঘণ্টা 'পি. আর. বি." (পুলিস রেগুলেশন বুক) থেকে নিরস কতকগুলো আইনকানুন পড়ানো হতো। বারোটা থেকে একটা ছিলো স্নান করা ও খাওয়ার ছুটি। আবার একটা থেকে তিনটা পর্যন্ত ল' ক্লাশ, খেলাধুলো ; তারপর আবার ড্রিল। ছুটি হতো ছ'টায়। আবার সন্ধ্যে সাতটা থেকে চলতো ল' ক্লাশ। এ সময়টায় কেউ পড়াতো না, নিজেদেরই বসে পড়তে হতো। একজন ইনস্ট্রাক্টর শুধু বসে পাহারা দিতেন। রাত্রি আটটায় আবার বিউগিল বাজলেই ব্যারাকের উঠোনে লাইন দিয়ে দাঁড়াতাম, শুরু হতো নাম ডাকা। তারপর খাওয়ার ছুটি। রান্নাঘর ছিলো আমাদের ব্যারাক থেকে খানিকটা দূরে। সুতরাং নাম ডাকার পর প্রায় একরকম ছুটে গিয়ে ঢুকতাম মেসে। উড়েঠাকুর যা' রান্না করতো তাই অমৃতের মতো লাগতো। আবার রাত্রি ঠিক ন'টায় বিউগিল বাজতো, সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো নিবিয়ে যে-যার বিছানায়। প্রথম প্রথম কান্না পেতো। ভাবতাম কেন মরতে এলাম। কিন্তু দিনকতক বাদে আর তেমন কষ্ট হতো না। বৃহস্পতিবার ছিলো আমাদের ছুটির দিন, সেদিন ধোপা আসতো। সকাল থেকে কোনো কাজ নেই, শুধু গল্প, সময় আর কাটতে চায় না। মনে হতো, এর চেয়ে দৈনন্দিন প্যারেডই যেন ছিলো ভালো।

ট্রেনিং-এ গিয়ে আমার আর একটি বিশেষ উপকার হয়েছিলো। ছেলেবেলা থেকেই আমি ভীষণ রোগা ছিলাম, কারো সামনে

খালি গায়ে বেরোতে লজ্জা হতো। কারণ জামা খুললেই মনে হতো যেন বুকের হাড় পাঁজরাগুলো দাঁত বার করে হাসছে। পুলিস ট্রেনিং-এ নিয়মিত ধরাবাঁধার মধ্যে থেকে স্বাস্থ্য আমার একেবারে বদলে গেল। আগেকার জামা আর গায়ে দিতে পারতাম না। এসব ছাড়াও বন্দুক ছোড়া, দৈনিক প্রায় দশ বারো মাইল মার্চ করা, লাফঝাঁপ ইত্যাদি আমার পরবর্তী জীবনে বিশেষ কাজে লেগেছিলো।

রোজ একবার করে আপিসে যাই, খানিক গল্পগুজব করে চলে আসি। শুনলাম, আমার নাম সব ডিস্ট্রিক্ট-এ পাঠানো হয়েছে। যেখানে ভেকেন্সি থাকবে সেখানে বদলি করে দেবে। বাবা-মার বিশেষ ইচ্ছা চব্বিশ পরগণার কোনও থানায় দিলে কাছাকাছি থাকতে পারবো। আমারও কলকাতা ছেড়ে দূরে কোথাও যাবার ইচ্ছা ছিলো না। রতিলালবাবুকে বাবা সেই কথাই বলেছিলেন। একদিন আপিসে গিয়ে শুনি, আমাকে চট্টগ্রাম বদলি করেছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। রতিলালবাবু জানালেন যে, অন্য কোথাও ভেকেন্সি নেই, কাজেই ওখানে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাবা-মাও বেশ দমে গেলেন। একে অজানা জায়গা, তার উপর অনেক দূর। কি করবো না করবো ভাবছি। রতিলালবাবু একদিন এসে বললেন—এখন চলে যাও, যখনি চব্বিশ পরগণায় ভেকেন্সি হবে তখনি এখানে আনবার ব্যবস্থা করা যাবে। অগত্যা তাই ঠিক হলো। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, খাকি পোশাক ইত্যাদি কিনে নিয়ে শুভদিন দেখে একদিন চিটাগং মেলে রওনা হলাম।

চট্টগ্রাম। স্টেশনের কাছেই পুলিস ক্লাব। সেখানেই আস্তানা নিলাম। রাস্তায় বেরতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা এতো ছোট্ট অথচ এতো সুন্দর শহর আর বাংলা দেশে আছে কিনা আমার জানা নেই। থানায় যাবো, অচেনা পথ। পুলিস ক্লাব থেকেই একজন সঙ্গী জুটিয়ে নিলাম। লাল সুরকির আঁকাবাঁকা পথ, অজগর সাপের মতো নিচু থেকে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে

উপরে উঠে গিয়েছে। সেখানেই থানা ও পুলিস কোতোয়ালি। থানার পাশ দিয়ে লালপথ নামতে শুরু করেছে ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো ঘুরে ঘুরে। সমতলে নেমে সে-রাস্তা আবার অন্যধার দিয়ে এঁকে-বেঁকে উপরে উঠেছে। সমস্ত শহরের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু হলো টাইগার হিল। শহরের উত্তরে পাহাড়তলীর পথ। সেখান থেকে Bay of Bengal দেখা যায়। পুলিস কোর্ট ফেয়ারি হিলের ওপর। ওখান থেকে বাঁয়ে প্রশস্ত কর্ণফুলি ও ডাইনে প্রশস্ততর তার মোহনা দেখা যায়। কোর্ট-এর নিচে সদর ঘাট, ডবল মুরিংস জেটি, পরে মহেশখালি—তারপর বে অব্ বেঙ্গল—শহর থেকে অন্ততঃ ১৫।২০ মাইল দূরে।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে কোতোয়ালি থানার সব অফিসারের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। অফিসার-ইন-চার্জ ছিলেন চাঁদ মিঞা। অতি অমায়িক ভদ্রলোক। ফার্স্ট অফিসার একজন হিন্দু, হেম গুপ্ত। সেকেণ্ড অফিসার মুসলমান। আগে থানার নাম শুনলেই ভয় হতো, ভাবতাম না জানি কি ভয়ানক জায়গা। এঁদের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর সে ভুল ভেঙে গেল। এ যেন একান্নবর্তী একটি সংসার, কয়েকটি ভাই মিলে-মিশে সে সংসার চালাচ্ছে।

এখানে একটি কথা বলে রাখা বিশেষ দরকার যে, চট্টগ্রাম জেলা ছিলো সব দিক দিয়ে 'ব্যাকওয়ার্ড', বিশেষ করে পুলিস ডিপার্টমেণ্ট। বড় বড় অফিসার—যেমন ধরুন—ইনস্পেক্টর, ডি. এস. পি. প্রভৃতির সঙ্গে আলাপ করে বুঝলুম লেখাপড়া বিশেষ কিছুই করেননি। অধিকাংশই ডিপার্টমেণ্টাল প্রমোশন পেয়ে বড় হয়েছেন। আমি ক্যালকাটা আই. বি. থেকে আসছি শুনে এঁদের মধ্যে অনেকেই নিজে থেকে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। যদিও পদমর্যাদায় ও বয়সে এঁরা আমার চেয়ে অনেক বড়। স্থানীয় ক্লাবগুলোতেও দেখলাম বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই একটা না একটা ক্লাব থেকে নিমন্ত্রণ আসতো। উদ্দেশ্য হলো তাদের নাট্যাভিনয়ে কিছু সাহায্য করা। প্রথম প্রথম দু'-এক জায়গায় গিয়েও ছিলাম। সেই পচা মান্ধাতার আমলের নাটক, নাকী সুরে টেনে টেনে যাত্রার ধরনে অভিনয়, কি আর দেখাবো। তবু ওরই মধ্যে দু'-একটা পার্ট দেখিয়ে

দিতাম। পরে আর যেতাম না। নানা অজুহাতে এড়িয়ে চলতাম। সব চাইতে মজার ব্যাপারটাই বলি। সেদিন কি একটা উপলক্ষ্যে স্কুল, কলেজ, কোর্ট সব বন্ধ। বিকেল বেলায় পুলিস ক্লাবে বসে চা খাচ্ছি। রাখালদা (ইনি পুলিস কোর্টের কেরানী, বয়েস প্রায় পঞ্চান্ন। বেশ রসিক লোক) কোথা থেকে একটা হারমোনিয়ম এনে হাজির করলেন, উদ্দেশ্য আমাকে গান গাইতে হবে। আমি তো অবাক। রাখালদা হেসে বললেন—আমরা সব শুনেছি ভায়া, তুমি সব বিষয়েই ওস্তাদ। আর হবেই বা না কেন? আই. বি'র লোক, চৌকশ না হলে চলবে কেন?

অনেক রকম ওজর আপত্তি করেও দেখলাম ফল হবে না। অগত্যা গাইলাম কাজীদার সেই বিখ্যাত গান যা কলকাতার অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়েছে। এমন কি বিড়িওয়ালারাও বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে বিড় বিড় করে যে গান গায়। ভয়ে ভয়ে গাইলাম—

কে বিদেশী, মন উদাসী
বাঁশের বাঁশি বাজাও বনে।

গান শেষ করে দেখি সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। চোখে মুখে প্রশংসা উপচে পড়ছে। বাইরে চেয়ে দেখি অগুন্তি লোক রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে। রাখালদা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরে বললেন—এতো ভালো গাইতে পারো অথচ এতোক্ষণ ধরে ন্যাকামী করছিলে। নাও আরেকখানা গাও।

জীবনে এই প্রথম শুনলাম আমি ভালো গাইতে পারি। চট্টগ্রামের জনসাধারণের উপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল, গাইলাম—

তোমার পাশে বসতে পেলে
কইবো না আর কথা
নীরবতায় ডুবিয়ে দেবো
বুক ভরা মোর ব্যথা।

আরো দু'তিনখানা গেয়েছিলাম কিন্তু কি গান আজ আর তা ঠিক মনে নেই। তবে সবগুলোই পচা পুরোনো গান যার প্রথম লাইন গাইলেই কলকাতার আসর থেকে লোক উঠে যেতো। পুলিস ক্লাবে গান গেয়ে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনলাম। সারা শহরে ছড়িয়ে পড়লো আমি নাকি ভালো গান গাইতে

পারি। ফলে রোজ নেমন্তন্ন আসতে শুরু হলো। আজ ডি. এস. পি'র বাড়ি থেকে, কাল কোতোয়ালি কোয়ার্টার্স থেকে, পরশু স্টুডেন্টস্ ক্লাব থেকে। সব জায়গাতেই সেই মান্ধাতা আমলের গান 'কে বিদেশী'। দিনে রাতে অন্তত: পঁচিশ ত্রিশবার এই একটি গানই আমাকে গাইতে হতো। তাতেও নিস্তার নেই, ডি. এস. পি. সদানন্দবাবুর মেয়ে নমিতা খাতা পেন্সিল নিয়ে বসলো গানটা তাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

রোজ রিজার্ভ আপিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি। তখনো আমার পোস্টিং হয়নি কারণ কোথাও ভেকেন্সি নেই। দিনগুলো বেশ আনন্দেই কাটতে লাগলো। এখানে এসে আরেকটা জিনিস খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করলাম—পুলিসের কি অসীম ক্ষমতা। কলকাতায় বসে ধারণাও করা যায় না। একটু উদাহরণ দিই। ধরুন কোতোয়ালিতে বসে গল্প করছেন। সিগারেট ফুরিয়ে গিয়েছে। বলে দিন ক' প্যাকেট কি সিগারেট দরকার, নিমেষে এসে যাবে। পয়সা দেবার কথা চিন্তাও করবেন না। কোথাও যাবেন, ট্যাক্সি দরকার। কনেস্টবলকে শুধু বলে দিন, তারপর ট্যাক্সি এলে সারা শহর তাতে ঘুরে বেড়ান। ভাড়া? কি সর্বনাশ! ভাড়া অফার করে আপনি কি ট্যাক্সিওয়ালাকে অপমান করতে চান? সিনেমায় যাবেন? কোতোয়ালিতে বারো মাসের পাশ পড়ে আছে, শুধু গিয়ে সিনেমা হলের মালিককে ধন্য করে আসুন। এই রকম কতো আর বলবো।

প্রথম প্রথম এদের ভাষা বুঝতে প্রাণ বেরিয়ে যেতো। চট্টগ্রামের ভাষা যেমন জলদ তেমনি জড়ানো। পাঁচ ছ'টা কথা একসঙ্গে জড়িয়ে তালগোল পাকিয়ে বলাই হলো এদের রীতি। যেমন ধরুন—হারামজাদাবেডাএডেকিল্লাইয়াস্সছ! বুঝলেন কিছু? কথাটা ভাঙলে দাঁড়ায়—হারামজাদা ব্যাটা এখানে কিসের জন্যে এসেছিস? প্রথম প্রথম খুব কষ্ট হলেও পরে বেশ বুঝতে পারতাম, কিন্তু বলতে পারতাম না। আমার অবস্থা তখন সেইরকম দোয়াতের মতো যাতে কালি ঢোকানো যায়, বের করা যায় না। যাক যা বলছিলাম। এইভাবে কোতোয়ালিতে আড্ডা দিয়ে ক্লাবে গান গেয়ে সিনেমা দেখে প্রায় ছ' সপ্তাহের উপর কাটিয়ে

দিলাম। মাঝে শরীরটা খারাপ ছিলো বলে দু' দিন কোতোয়ালিতে যেতে পারিনি। সেদিন গিয়ে দেখি থানার আপিস ঘরের পাশে একটা ছোট ঘরে হেমদা বসে রয়েছে, পাশে টেবিলটার কাছে ঘোমটা দিয়ে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে, পরনে একটা বিশ্রী ময়লা শাড়ি। তার পাশে আধাবয়সী আরেকটি মেয়ে। আমি একটু উঁকি দিয়ে চলে আসবো কিনা ভাবছি, হেমদা ডাকলে—এসো ধীরাজ।

অগত্যা গিয়ে সামনের চেয়ারটায় বসলাম।

হেমদা চট্টগ্রামের ভাষায় জড়িয়ে জড়িয়ে মেয়েটিকে উদ্দেশ করে বললে—এখনও বল্, তোর স্বামীকে নয়তো তোর বাপকে খবর পাঠাই। উত্তরে মেয়েটি শুধু আপত্তি জানিয়ে মাথা নাড়লে। হেমদা ভীষণ রেগে উঠে এমন কতকগুলো ভাষা প্রয়োগ করলে যা শুনে আমার কান লাল হয়ে উঠলো, আমি লজ্জায় মাথা নিচু করলাম। বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝতে পেরেই হেমদা বললেন—জানো ধীরাজ, মেয়েটি একটি মুসলমান চাষীর স্ত্রী। ওর বাপও একজন অবস্থাপন্ন চাষী। স্বামী মারধর করে বলেই উনি আর তার ঘর করবেন না। বললাম, বেশ, তোর বাপকে খবর দিই, তা সেখানেও যাবে না। এই মতির-মা, ঘোমটা খুলে দাও তো। পাশের আধাবয়সী মেয়েটিকে হুকুম করলে হেমদা।

মুচকি হেসে মতির-মা মেয়েটির ঘোমটা খুলে দিলে। বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। অপরূপ সুন্দরী মেয়ে, বড় টানাটানা চোখ, নাক মুখ যেন তুলি দিয়ে আঁকা। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ, অযত্নে কিছু মলিন দেখালেও সে যে সুন্দরী তা বুঝতে এতোটুকু কষ্ট হয় না। বয়েস সতেরো-আঠারো। নিটোল সুন্দর দেহ। অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে আছি। চমক ভাঙলো হেমদার কথায়,—কি হে, তোমার সিনেমার হিরোয়িন করে নেবে নাকি?

বলা বাহুল্য, পুলিসের চাকরি নেবার আগে আমি যে সিনেমায় নেমেছিলাম, এ খবর এখানকার সবাই জানে। আর সে ছবি এখানেও দেখানো হয়েছে। লজ্জা পেয়ে কি জবাব দেবো ভাবছি। হেমদা বললে—জানো ধীরাজ, আজ দুপুর থেকে মেয়েটাকে কতো

করে বোঝাচ্ছি। বাড়ি ফিরে যাও, এ পথ ভালো না। এমন কি এও বলেছি যে, তোর স্বামীকে কোতোয়ালিতে ডেকে এনে বেশ করে শাসিয়ে দিচ্ছি, যাতে আর ও তোর গায়ে হাত না দেয়, তা কিছুতেই শুনবে না! কে যে ওর মাথার মধ্যে ঢুকিয়েছে, খাতায় নাম লেখালে টাকাকড়ি গয়নাগাঁটি কিছুরই অভাব হবে না ; রাণীর হালে থাকবে। রাণীর হালে থাকবে সত্যি, তবে যতোদিন যৌবন থাকবে। তারপর একটা শক্ত অসুখে পড়লে—তখন? দেখো মতির-মা, এখনও সময় থাকতে মেয়েটাকে বোঝাও।

এবার মতির-মা বললে—বাবু, আমি কি কম বুঝিয়েছি? কিন্তু ও কিছুতেই গোঁ ছাড়বে না।

একটু চুপ করে থেকে হেমদা বললেন—সবই বুঝতে পারছি, মতির-মা। তুমিই যে ফুসলে ওকে বার করে এনেছো তাও জানি। শুধু ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে অন্য লোক দিয়ে এসব করাচ্ছো বলেই কিছু করতে পারলাম না। কিন্তু যেদিন হাতে-নাতে ধরবো, সেদিন বুঝতে পারবে।

মতির-মার পরিচয় যা পেলাম তাতে বুঝলাম এসব কাজে ও সিদ্ধহস্ত। স্থানীয় পতিতালয়ে (যার নাম রেয়াজুদ্দিন গলি, অন্য নাম ১৪নং গলি) ও বাড়িওয়ালি। হাতে বেশ পয়সাকড়ি আছে। বহু মেয়েকে লোক দিয়ে ফুসলে বার করে এনে ওর ভাড়াটে করে রেখেছে। অভিনয়েও মতির-মার পটুত্ব লক্ষ্য করলাম। হেমদার কথা শুনে হঠাৎ হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে হেমদার পা দুটো জড়িয়ে রাজ্যের দিব্যি গিলে সে জানাতে চাইলে, সত্যিই সে এর মধ্যে নেই। এ ব্যাপারটায় আমিও খানিকটা অভিভূত হয়ে গেলাম। হেমদা রূঢ়ভাবে পা দুটো সরিয়ে নিয়ে ততোধিক রূঢ় কণ্ঠে বললেন—ওসব অভিনয় আমার সামনে করো না মতির-মা। যাও, ওকে নিয়ে যাও, চারদিন বাদে কোর্টে হাজির করো, নাম রেজেস্ট্রি হবে।

একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—চারদিন বাদে কেন হেমদা?

বিষাক্ত হাসি হেসে হেমদা জবাব দিলে—দু'দিন হায়ার অফিসারদের মধ্যে কেউ কেউ মতির-মার বাড়িতে পায়ের ধুলো

দিয়ে মেয়েটিকে বোঝাবেন, তারপর হেড কনস্টেবল, কনস্টেবল, আর্দালি এরা সবাই বোঝাবে, তাতেও যদি না বোঝে তাহলে চতুর্থদিনে কোর্টে নাম লিখিয়ে একেবারে পাকা করে দেবে।

নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো করে হেসে উঠলো হেমদা।

শুনে কাঠ হয়ে গেলাম। এ ধরনের কথাবার্তা বা অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। চুপ করে আছি দেখে হেমদা বললেন—কি হে, তুমিই আগে একবার বুঝিয়ে দেখবে নাকি? বলো তো ব্যবস্থা করে দিই। আবার সেই গা জ্বালানো হাসি। আমার তখন বাকরোধ হয়ে গিয়েছে। একটু চুপ করে থেকে হেমদা বললে—ধীরাজ, বাইরে থেকে লোকে শুধু আমাদের দোষত্রুটিগুলোই দেখতে পায়। কিন্তু ভাই, আমরাও মা বোন স্ত্রী কন্যা নিয়ে ঘর করি। তুমি জানো না ভাই, আজ দু'দিন ধরে মেয়েটাকে কতো বুঝিয়েছি। কখনো ভয় দেখিয়েছি, কখনো মিষ্টি কথা বলেছি। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। যাকগে, ওর নিয়তি ওকে টেনেছে কে রাখবে। বলতে বলতে হেমদার গলা ধরে এল। তাড়াতাড়ি একটা কেসফাইল টেনে নিয়ে কি লিখতে শুরু করলেন।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কোতোয়ালি থেকে পুলিস ক্লাবে ফিরে এলাম। সে রাত্রে অনেকক্ষণ অবধি ঘুমোতে পারলাম না। সুন্দরী ঐ কৃষক বধূটির জন্যেই কি? হবেও বা!

শরীরটা খারাপ ছিলো, মনটাও ভালো ছিলো না। পরদিন কোথাও বেরনো হলো না। আজ কোতোয়ালিতে যেতেই দেখি, হৈ হৈ ব্যাপার। জিলার বড় সাহেব (এস. পি.) মিঃ মরিস বদলি হয়ে যাচ্ছেন। তাঁর জায়গায় আসছেন জি. আর. পি'র পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্ট মিঃ মুলাণ্ড। সামনের শনিবার মিঃ মরিসের বিদায় সম্বর্ধনা আর সে সম্বর্ধনার একমাত্র চিত্তবিনোদকারী হচ্ছি আমি। কিছু বলবার আগেই হেমদা বললেন—আমরা সবাই জানি, তুমি খুব ভালো ক্যারিকেচার করতে পারো, গান গাইতে

পারো, আর আমাদের অনেকের চাইতে ভালো ইংরেজী কথাবার্তা কইতে পারো। কাজেই কোনো আপত্তি শুনবো না।

মনে মনে খুশি হইনি বললে মিথ্যা বলা হবে, কিন্তু মুখে বললাম—হেমদা, আমি একজন সামান্য-এ. এস. আই। অতো বড় বড় সাহেবের সামনে···

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হেমদা হেসে বললেন—ওরা স্মার্টনেস খুব পছন্দ করে, এতে তোমার ভবিষ্যতে ভালোই হবে।

শনিবার বেলা তিনটা থেকেই কোতোয়ালিতে লোক আসতে শুরু হয়েছে। সাহেব-মেমের সংখ্যাই বেশি। তাছাড়া ছোটো-বড় সব পুলিসের অফিসাররাও একে একে এসে পড়লো। বেলা চারটা নাগাদ প্রকাণ্ড হলঘরে আর তিল ধারণের স্থান রইলো না; হলঘরের মাঝখানে একটা গোল টেবিল, তার উপর একটা বক্স হারমোনিয়ম। যথারীতি বিদায় সম্ভাষণের পালা শেষ হলো। তারপর আমার পালা। অফিসার-ইন-চার্জ সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর আদেশ বা অনুরোধ হলো, একখানা গানের। দুরু দুরু বক্ষে হারমোনিয়মের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। তারপর শুরু করলাম অগতির গতি কাজীদার ঐ গান—কে বিদেশী।

বোধ হয়, গানটা সেদিন ভালোই গেয়েছিলাম। দেখলাম, সাহেব-মেম সব উচ্ছ্বসিত হয়ে হাততালি দিচ্ছে। শুধু মাত্র একটি লোক গম্ভীর মুখে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বসে আছে। তার নীল চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শুধু আমারই উপর। হেমদাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, উনিই হলেন জি. আর. পি'র নবাগত পুলিস সুপার মিঃ মুলাণ্ড। আমাদের হবু হর্তাকর্তা বিধাতা।

তারপর ইংরেজী, বাংলা, হিন্দিতে অনেকগুলো কমিক স্কেচ্, গান আবৃত্তি করলাম। শ্রোতারা সবাই উচ্ছ্বসিত। শুধু আমাদের হর্তাকর্তা বিধাতার মুখে হাসি ফোটাতে পারলাম না। তাঁর মুখ ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠতে লাগলো। মাঝে মাঝে পাশের দু'-একটি অফিসারকে কি যেন জিজ্ঞেস করে নিলে, তারপর আবার সেই হাঁড়ি মুখ।

পার্টি শেষ হলো। সবারই মুখে ধন্য ধন্য। আমি কিন্তু মোটেই শান্তি পেলাম না। সব প্রশংসা কোলাহলের মাঝে ঐ নীল

চোখ যেন আমাকে নজরবন্দী করে রেখে দিলে। হেমদা এক পাশে ঠেলে নিয়ে ফিসফিস করে বললে—ধীরাজ, তোমার গান ও ক্যারিকেচার মিসেস মুলাণ্ডের খুব ভালো লেগেছে। তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান, এসো। মিসেস মুলাণ্ড অসামান্যা সুন্দরী। বয়েস কুড়ি-বাইশ বলেই মনে হয়। কাছে যেতে হাত বাড়িয়ে আমার করমর্দন করলেন। তারপর হেসে বললেন—I never expected such a brilliant talent in the Police force.

ধন্য হয়ে গেলাম। হেসে মেমসাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে দেখি হাঁড়িমুখো মুলাণ্ড কোঠরে ঢোকা নীল চোখ দুটো দিয়ে আমাকে যেন গিলতে চাইছে।

দু'দিন পরের কথা। সিনেমা দেখে ফিরছি; পথে কোনো ট্যাক্সি পেলাম না। অগত্যা হেঁটেই কোতোয়ালিতে যাবো ঠিক করলাম। উঁচু নিচু লাল সুরকির পথ, ঘুরে ঘুরে নামছি, বেশ লাগছিলো। হঠাৎ একেবারে পিছনে শুনলাম মোটর গাড়ির হর্ন। চমকে পাশে সরে গিয়েই দেখি স্টিয়ারিং-এ বসে আছেন মিসেস মুলাণ্ড। সিগারেটটা ঠোঁটে চেপেই মৃদুমধুর হেসে নিজেই দরজা খুলে দিয়ে বললেন—গেট ইন।

উঠে পাশে বসলাম। এবার আমার বিস্ময়কে চরমে পৌঁছে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বললেন—কোথায় যাবেন? কোতোয়ালিতে? চলুন আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি, আমি ওদিক দিয়েই যাবো।

আমি নির্বাক। ভাবছি এখনো কি সিনেমা দেখছি না সত্যিই সুন্দরী মিসেস মুলাণ্ডের পাশে বসে আছি। পথ অল্প, কোতোয়ালিতে পৌঁছে গেলাম। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে মিসেস মুলাণ্ড সিটের পাশ থেকে সিগারেট কেসটা বার করে নিজে একটা ধরিয়ে কেসটা এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। আমি তো অবাক। আমার হতভম্ব ভাব দেখে মিসেস মুলাণ্ড তো হেসেই খুন। তারপর বললেন—Don't you smoke?

আর আপত্তি চলে না। কেসটা হাতে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম তারপর ভাবলাম—কি বলি, একটা কিছু বলা তো দরকার, একটু ইতঃস্তত করে বললাম—It's a nice case.

মেমসাহেব খিল খিল করে হেসে উঠলো, তারপর হাসতে হাসতে বললে—Keep it, every time you light a cigarette you will think of me. Yes ?

আবার সেই দুষ্টুমিভরা হাসি। মনে মনে ভাবলাম, তোমায় আমি জীবনে ভুলবো না মেমসাহেব। মুখে শুধু বললাম—Thanks। তারপর নিজেই দরজা খুলে নেমে পড়লাম। কোতোয়ালিতে ঢুকে দেখলাম বারান্দার থামের আশে-পাশে বিস্ফারিত চোখে হেমদা এবং আরও অনেকে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করছে। আমি যেন আজ উপকথার রাজপুত্রের মতো। হঠাৎ ঘুমন্ত রাজকন্যার রাজ্যে উপস্থিত হয়েছি। মনে মনে যে বেশ একটা গর্ব অনুভব করছিলাম, এটা অস্বীকার করতে পারবো না।

একসঙ্গে অজস্র প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে উঠলাম—কোথায় দেখা হলো ? কি বললে মেমসাহেব ? এতোক্ষণ গাড়িতে বসে কি কথা হচ্ছিলো ? ইত্যাদি, ইত্যাদি। যতো বলি সিনেমা থেকে ফেরবার পথে দেখা। মেমসাহেব দয়া করে আমাকে লিফট দিয়ে গেলেন। কেউ বিশ্বাস করে না, তবে একটা কথা সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিলো যে, আমি অসাধারণ ভাগ্যবান এবং অতি শীঘ্রই প্রমোশন পাবো তাতে আর ভুল নেই। শুধু হেমদা সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমাকে একপাশে টেনে এনে বললেন—ব্যাপারটায় খুব উৎফুল্ল হবার কিছু নেই। মুলাণ্ড সাহেব অত্যন্ত বদরাগী লোক, তার ঐ সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে অনেক রকম স্ক্যাণ্ডাল ও কানাঘুষো শোনা গিয়েছে। কাজেই এখন থেকে একটু সাবধান থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

এ যেন আমার হরিষে বিষাদ হলো। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় পুলিস ক্লাবে ফিরে এলাম। এখানেও নিস্তার নেই। অতো রাতেও সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে জেগে। রাখালদা একগাল হেসে বললেন—কবে খাওয়াচ্ছো ভায়া ?

অবাক হবার ভান করে বললাম—মানে ?

এবার যতীন বলে একটি ছেলে এগিয়ে এসে বললে—এই নিজের চোখে দেখা বুঝলে ভাই—এ আর শোনা কথা নয়। জানো রাখালদা, হঠাৎ কোতোয়ালির সামনে সাহেবের গাড়ি

দেখে ভাবলাম—ব্যাপার কি? একটু দূরে থেকে উঁকি মেরে দেখি—ও বাবা, মেমসাহেব ধীরাজের গলা জড়িয়ে ধরে এক গাল হেসে কি সব বলে যাচ্ছে, কথা আর শেষই হয় না।

কি জবাব দেবো। অবাক হয়ে শুধু ভাবলাম, কোতোয়ালি থেকে এই সামান্য পথটুকু আসতেই গলা জড়িয়ে ধরেছি, এর পর আরও দূরে ঐ বদরাগী মুলাণ্ড-এর কানে যখন এই সংবাদ পৌঁছবে—তখন? ভাবতে সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো। খাওয়াদাওয়া শেষ করে শুতে বেশ একটু রাত হয়ে গেল। সে-রাত্রে ভালো করে ঘুমোতে পারলাম না। যদিও শেষের দিকে একটু পাতলা ঘুম এল, তাও বিশ্রী স্বপ্নে ভরা। দেখলাম আমি যেন কি একটা কাজে মিঃ মুলাণ্ড-এর বাংলোয় গিয়েছি। আমার কথা শোনবার আগেই সাহেব ড্রয়ার খুলে রিভলবার বার করে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমি প্রাণপণে ছুটছি, আঁকাবাঁকা লাল সুরকির পথ বেয়ে ঘুরে ঘুরে নামছি, এ পথের যেন আর শেষ নেই। দু' তিনবার পড়েও গেলাম। হাঁটু ছড়ে রক্ত পড়ছে, দৃকপাত নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, দেখি ঘামে সমস্ত বিছানা ভিজে গিয়েছে। শুনলাম বারান্দায় হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে রাখালদা ঠাকুরকে বলছেন—আজ ছুটির দিন, দুপুরে মুরগী রাঁধো হে ঠাকুর, আজকের ফিস্টের সব খরচ ধীরাজ ভায়ার।

তিন দিন পরের কথা বলছি। কোতোয়ালি থেকে সেদিন রাত্রে একটু সকাল সকাল পুলিস ক্লাবে ফিরলাম। শরীরটা ভালো লাগছিলো না। ভাবলাম, কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়বো। রাত প্রায় দশটায় রাখালদা মেসে ফিরে এসেই আমার ঘরে ঢুকে বললেন—ভায়া, কাল সকাল ঠিক আটটায় রিজার্ভ আপিসে যেও, বড় সাহেব ডেকে পাঠিয়েছেন।

কি এক অজানা ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। রাখালদা হেসে বললেন—না হে, ভয় পাবার মতো কিছু নয়, তোমায় পোস্টিং করবে। চেষ্টা করো, যাতে কোতোয়ালিতে থাকতে

পারো অথবা কোর্টে। বাইরের কোনো থানায় দিলে তোমার বড্ড অসুবিধা হবে। শহুরে লোক, শহরে থাকবার চেষ্টাই করো।

—সেটা কি আমার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে রাখালদা?

—অনেকটা তাই। তুমিই সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে পারবে তোমার সুবিধা-অসুবিধার কথা। অন্য সবাই তো কথাই বলতে পারে না সাহস করে। আর বেশি কথা না বাড়িয়ে রাখালদা একটু গম্ভীরমুখেই আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন সকাল আটটার আগেই হাজির হলাম রিজার্ভ আপিসে। রিজার্ভ অফিসার হরকুমারবাবু অমায়িক লোক, বয়েস প্রায় পঞ্চাশ। মাথার চুল সাদা, গোঁফ সাদা, মোটা-সোঠা বেঁটে মানুষটি, মুখে সব সময় একটি মোলায়েম হাসি লেগেই আছে। দেখলে হঠাৎ বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না যে, পুলিসে কাজ করেন। পরিচয় ছিলো না। ঘরে ঢুকে নমস্কার করে দাঁড়াতেই হরকুমারবাবু প্রসন্ন হাসিতে যেন আমায় আশীর্বাদ করে বললেন—আরে এসো, এসো, ধীরাজ, তোমার সম্বন্ধে আমার কৌতূহলের অন্ত নেই।

তারপর হঠাৎ একটু থেমে বললেন—তুমি বলে সম্বোধন করলাম, রাগ করোনি তো ভাই? বয়সে তুমি আমার অনেক ছোট; আর তো ছ'মাস বাদেই রিটায়ার করছি।

বাধা দিয়ে বললাম—না দাদা, আপনি তুমিই বলবেন।

হরকুমারবাবু খুশি হলেন, বললেন—লোকের মুখে মুখে শুধু তোমার নাম শুনছি। গল্পে, গানে, চেহারায় তুমি নাকি একমেবদ্বিতীয়ম্।

স্থান কাল ভুলে হরকুমারবাবু হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন।

অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এমন সরল সদাশিব মানুষ এতোদিন ধরে পুলিসের চাকরি করছেন কী করে। চমক ভাঙলো কুকুরের ডাকে। চেয়ে দেখি, সামনের ফুল বাগানের মধ্যেকার লাল সুরকির পথ বেয়ে দু'পাশে দুটো ভয়ঙ্কর এ্যালসেশিয়ান কুকুর নিয়ে, খাকি হাফপ্যাণ্টপরা নীলাক্ষ মুলাণ্ড কুকুর দুটোর চেন টেনে ধরে হন্ হন্ করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। মুলাণ্ডকে হাঁটতে হচ্ছে না, ঐ প্রকাণ্ড ভয়াল কুকুর দুটোই তাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। মনে হলো রাশ ছেড়ে দিলেই ওরা নিমেষে আমার

উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে। মনে মনে প্রমাদ গুণলাম।

উঠে এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ালাম। চেয়ে দেখি হরকুমারবাবুও পাংশু মুখে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বুঝলাম সাহেব-ভীতি এঁদের অস্থিমজ্জাগত।

কুকুর দুটো ঘরে ঢুকেই আমাকে নতুন লোক দেখে বিকট চিৎকার করে দু'পায়ে খাড়া হয়ে উঠলো। মুলাণ্ড সাহেব অতি কষ্টে বেত উঁচিয়ে ওদের সংযত করলেন।

ঐ এ্যাটেনশন অবস্থায় দাঁড়িয়েই বললাম—Morning sir.

কালা নেটিভকে প্রতিনমস্কার করাটাও বোধ হয় মুলাণ্ডের মতো সাহেবের আভিজাত্যে বাধলো। শুধু ক্রুদ্ধ চোখে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হরকুমারবাবুকে বললেন—R. O., has he been posted anywhere ?

ভয়ে ভয়ে হরকুমারবাবু জবাব দিলেন—No sir !

Let me see the file,—সাহেবের গলা গর্জন করে উঠলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বার করে একটা ধরালেন, তারপর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি দিয়ে আমার আপাদমস্তক আবার দেখে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—Your name Dhiraj Bhattacharjee ?

—Yes sir.

—You are coming from Calcutta I. B ?

—Yes sir.

—You were a film actor before you joined I. B ! Isn't it ?

—Yes sir.

দাঁতে দাঁত চেপে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হঠাৎ বিদ্রূপের স্বরে সাহেব বললেন—Why did you change your mind ?

কি জবাব দেবো! দিলেও ঐ মুলাণ্ডের কাছে শুধু অরণ্যে রোদন ছাড়া আর কিছুই হবে না, এটা বেশ বুঝলাম। অগত্যা চুপ করেই রইলাম।

এই সময় সাহেবের আর্দালি ছুটতে ছুটতে এসে সাহেবের

কুকুর ছুটোকে সামনের বাগানে নিয়ে গেল। খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

হরকুমারবাবু একটা মোটা ফাইল সাহেবের দিকে এগিয়ে দিলেন। সাহেব পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে হরকুমারবাবুকে কি জিজ্ঞাসা করছেন বুঝতে পারলাম না।

এইভাবে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। ঠায় এ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমি যেন ফাঁসির আসামী, বিচার হয়ে গিয়েছে, শুধু জজসাহেবের হুকুমটা শুনিয়ে দেওয়ার অপেক্ষা। ফাইল ওল্টাতে ওল্টাতে শুনলাম সাহেব নিজের মনেই যেন বলছেন—Very smart I. B. man I see!

আরো মিনিট পনেরো এইভাবে কাটবার পর সাহেব বিরক্ত হয়ে সশব্দে ফাইলটা বন্ধ করে হরকুমারবাবুকে কি যেন মৃদুস্বরে বলে ঘর থেকে বেরিরে গেলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো। একটু পরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি দাদা?

হরকুমারবাবুর মুখে হাসি নেই। গম্ভীরভাবে ফাইলগুলো সাজাতে সাজাতে বললেন—কী জানি, সাহেবকে এরকম চটতে বড় একটা দেখিনি! তোমার উপর ওর আক্রোশই বা কেন?

উত্তরটা এড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—যাবার সময় কী বলে গেলেন সাহেব?

—ফাইল টাইলগুলো কোর্টে নিয়ে যাবার জন্য বলে গেল—তোমায় কোথায় পোস্টিং করবে এখনও ঠিক করতে পারেনি।

উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললাম—তাহলে চলি দাদা।

কোনো জবাব না দিয়ে অর্থহীন দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলেন হরকুমারবাবু!

রিজার্ভ আপিস থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে পথে এসে দাঁড়ালাম।

সেই দিনই বিকেলে, বেলা আন্দাজ চারটে হবে, পুলিস ক্লাবে বসে চা খাচ্ছি; হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন রাখালদা। এর আগে এতো বেলাবেলি কোর্ট থেকে আসতে দেখিনি রাখালদাকে। জিজ্ঞাসা করলাম—শরীরটা ভালো নেই বুঝি রাখালদা?

কোনও উত্তর না দিয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে পাশের ঘরে চলে গেলেন রাখালদা।

কৌতূহল হলো, চায়ের কাপ হাতে নিয়ে রাখালদার ঘরে ঢুকে পড়লাম। তখনো রাখালদা কোর্টের জামা-কাপড় ছাড়েননি। খাটের উপর বসে সামনের জানলা দিয়ে দূরের স্টেশনের দিকে উদাস দৃষ্টি মেলে বসে আছেন। দু' তিনদিন আগে দেশ থেকে চিঠি এসেছিল রাখালদার ছেলেটির অসুখ। আশঙ্কায় মনটা দুলে উঠলো। ভাবলাম তবে কি—আস্তে আস্তে রাখালদার পাশে বসলাম। একটু ইতঃস্তত করে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—খবর কি খুবই খারাপ দাদা?

আমার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখি রাখালদার চোখে জল। আমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে ধরা-গলায় রাখালদা বললে—হ্যাঁ ভাই, খুব খারাপ খবর। এ যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

কি সান্ত্বনা দেবো ভাবছি, এমন সময় ঘরে ঢুকলো যতীন, রমেশ ও ব্যানার্জি। এরা সবাই পুলিস ক্লাবের মেম্বার। দেখলাম সবারই মুখ বিষণ্ণ। খবরটা তাহলে এরাও জানে!

রমেশ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—হায় হায়, এমন মানুষটার ভাগ্যে শেষে কিনা এই হলো?

এই অবস্থায় একটা কিছু আমার বলা দরকার। রাখালদার একখানা হাত ধরে আস্তে আস্তে সান্ত্বনার সুরে বললাম—ভেবে আর কি করবে রাখালদা! যা হয়েছে তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই, ভগবান যা—

যতীন গর্জন করে উঠলো—ভগবান? সব তাতে ঐ ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো ভগবানকে টেনে আনবেন না ধীরাজবাবু! মানুষ অন্যায় করে দেবে দণ্ড আর সেই দণ্ড বিনা প্রতিবাদে মাথা পেতে নিয়ে শুধু আকাশের দিকে চেয়ে বলবেন—ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই! ছিঃ

ব্যানার্জি এতোক্ষণ চুপচাপ একপাশে বসেছিলো। আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাপারটা সব শুনেছেন ধীরাজবাবু?

—না শুনিনি, তবে অনুমানে বুঝতে পেরেছি।

—কি বলুন তো?

•

একটু ইতঃস্তত করে বললাম—দেশ থেকে রাখালদার একটা খারাপ খবর—কথাটা শেষ করবার আগেই অতো দুঃখের মধ্যেও সবাই হো হো করে হেসে উঠলো, লজ্জায় আমি এতোটুকু হয়ে গেলাম।

রাখালদা ম্লান হেসে বললেন—হা অদৃষ্ট! সেইজন্যেই বুঝি ভগবানের দোহাই দিয়ে আমায় সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছিলো!

কলকাতার আই. বি-র চৌকশ ছেলে আমি আজ এদের কাছে একেবারে বেকুব বনে গেলাম। এবার সোজা জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি?

উত্তরটা সবাই একসঙ্গে দিতে যাচ্ছিলো। রাখালদা হাত দিয়ে থামিয়ে বললেন—মুলাণ্ড তোমায় টেকনাফ থানায় বদলি করেছে।

আমি তো অবাক! আমায় সাহেব টেকনাফ থানায় বদলি করায় এদের হা-হুতাশ করার কি কারণ থাকতে পারে বুঝলাম না।

বুঝলাম একটু পরে। রাখালদা বললেন—জানো ধীরাজ, টেকনাফ চট্টগ্রাম থেকে স্টীমারে আড়াই দিনের পথ। ছোট্ট একটা দ্বীপ। যার পর আর বাংলাদেশ নেই। বে অব্ বেঙ্গলের অপর পাড়ে ওয়াল্টেয়ার আর বাংলা দেশের সীমানা ঐ দ্বীপেই শেষ হয়ে গেল। কোনোও পুলিস অফিসার ভীষণ অপরাধ না করলে ওখানে বদলি করা হয় না। ঐ সব দ্বীপেই রাজবন্দীদের অন্তরীণ করে রাখা হয়। ও দ্বীপের বাসিন্দারা হলো মগ। তাদের ভাষা বুঝতেই তো তোমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে।

আক্কেল আমার অমনিতেই গুড়ুম হয়ে গিয়েছিলো। এতোক্ষণে বুঝলাম রিজার্ভ আপিসে মুলাণ্ডের অদ্ভুত আচরণের অর্থ। এইবার হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম—The penalty of being too smart.

সেই রাত্রেই কর্তব্য ঠিক করে ফেললাম।

ঠিক করলাম চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এই চট্টগ্রাম থেকেই

কলকাতায় ফিরে যাবো। সকাল বেলায় কোতোয়ালিতে গিয়ে হাজির হলাম। সবার মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর। হেমদা আমার হাত দুটো ধরে অনুতাপের সুরে বললেন,—ধীরাজ এর জন্য দায়ী আমি। কিন্তু বিশ্বাস করো ভাই, আমি তোমার ভালো করতেই চেয়েছিলাম।

বিক্ষোভটা মনের ভিতর চেপে রেখে সান্ত্বনার সুর মিশিয়ে বললাম—তোমরা কেন মিছিমিছি অনুতাপ করছো দাদা। এ ভালোই হলো। এখানে রাখলে চাকরি আমি ছাড়তাম না এটা ঠিক। কিন্তু ঐ মগের মুলুকে? কখনোই না।

ডি. এস. পি. সদানন্দবাবু কি একটা কাজে এই সময় কোতোয়ালিতে এলেন। আমায় দেখেই বললেন—সব শুনেছি ধীরাজ। ভারি দুঃখের কথা।

হেমদা আমার রেজিগনেশন লেটারটা সদানন্দবাবুকে দেখালেন। চিঠিটা পড়ে খানিকক্ষণ গুম হয়ে থাকলেন সদানন্দবাবু। তারপর হেমদাকে ডেকে নিয়ে একটু দূরে বারান্দার পশ্চিম দিকে চলে গেলেন। খানিক বাদে যখন দু'জনে ফিরে এলেন, দেখলাম দু'জনেই বেশ একটু উৎফুল্ল। হেমদা বললেন,—ধীরাজ, সদানন্দবাবু বলছেন একবার আমরা শেষ চেষ্টা করে দেখি। আমি আর উনি এখনই একবার যাচ্ছি মুলাণ্ড সাহেবের বাংলোয়। দেখি কি করা যায়। তুমি ততোক্ষণ কোতোয়ালিতে অপেক্ষা করো।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক বাদে ওঁরা ফিরলেন, সঙ্গে ও. সি. চাঁদ মিঞাও আছেন। হেমদা কোতোয়ালির সিঁড়িগুলো একরকম লাফিয়ে ঘরে এসেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর হাত থেকে রেজিগনেশন চিঠিটা নিয়ে ছিঁড়ে কুটি কুটি করে ফেললেন। বুঝলাম ব্যাপার কি হয়েছে। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। ভাবলাম সত্যিই আমি ভাগ্যবান, নইলে সামান্য একজন এ. এস. আই-এর জন্য এতো বড় বড় অফিসারদের মাথা ঘামানোর কি দরকার ছিলো।

সদানন্দবাবু বললেন—সাহেব কিছুতেই রাজী হতে চায় না। বলে এখানে থাকলে কাজ কর্ম কিছুই করবে না—খালি আড্ডা দিয়ে বেড়াবে—আরও কতো কি।

সদানন্দবাবুর মুখের কথা একরকম কেড়ে নিয়ে হেমদা বললেন—তাতেও কিছু হতো না স্যার, যদি না ঐ সময় মেম সাহেব এসে পড়তো। আর যাই বলুন, মেম সাহেব আমাদের অসাধারণ বুদ্ধিমতী একথা বলতেই হবে। কেমন কায়দা করে কথার মোড় ঘুরিয়ে দিলে বলুন তো?

জিজ্ঞাসা করলাম—মেম সাহেব কি বললে হেমদা?

হেমদা বললে—আমরা একরকম আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। এমন সময় ঘরে ঢুকলো মেম সাহেব। নমস্কার প্রতিনমস্কারের পালা শেষ হলে জানতে চাইলে আমরা কেন এসেছি। ব্যাপারটা সব খুলে বললাম। সব শুনে বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে তুলে মুলাণ্ডের দিকে চেয়ে বললে—Is it a fact Johny? সাহেব কোনও জবাব না দিয়ে চুপ করে আছে দেখে মেম সাহেব বললে—বরাবরই দেখেছি তুমি স্মার্ট ও বুদ্ধিমান লোকগুলোকে দু' চোখে দেখতে পারো না—খোশামুদে ডাল হেডেড লোক নিয়ে কাজ করাই তোমার অভ্যাস। যারা পোষা কুকুরের মতো মাথা নিচু করে সব সময় হুজুর হুজুর করবে তারাই তোমার pet. কেন? আমি ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি—He is very smart and intelligent. তাকে তুমি posting করেছো টেকনাফে? অল রাইট! It is your affair Johny, do, whatever you think best. হাত ঘড়িটা দেখে মেম সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললে—চলি, আমার রাইডিং-এর সময় হয়ে গিয়েছে—বাই বাই! দরজার কাছ বরাবর গিয়ে ফিরে দাঁড়ালো মেম সাহেব, তারপর সাহেবকে বললে—এতোগুলো অফিসার এসেছেন তোমায় request করতে, আমি হলে এঁদের কখনই নিরাশ করতাম না। নাটকীয় ভঙ্গিতে মেম সাহেব প্রস্থান করলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ। কেউ আর কথা বলে না। তারপর সদানন্দবাবু বললেন—এক কাজ করুন স্যার, অন্ততঃ মাস তিনেকের জন্য ওকে টাউনের কোথাও posting করে দিন, আপনারও চোখের উপর থাকবে, আমরাও নজর রাখবো—কাজ কর্ম ভালোভাবে করে ভালোই, নইলে যেখানে খুশি বদলি করে দিলেই হবে।

মুলাণ্ড উঠে দাঁড়িয়ে বললে—অল রাইট! তোমরা যখন সবাই

বলছো তখন তাই হবে। আগের order cancel করে কাল সকালেই আমি নতুন অর্ডার দিয়ে দেবো।

বেলা অনেক হয়ে গিয়েছিলো, সদানন্দবাবু বললেন—চলো ধীরাজ, তোমাকে পুলিস ক্লাবে নামিয়ে দিয়ে যাই। আসবার সময় হেমদা ইশারা করে কাছে ডেকে চুপি চুপি বললে—এই তিনটে মাস একটু সাবধানে থাকিস ভাই—মেম সাহেবের সঙ্গে প্রেম ট্রেম···। কথা শেষ করতে দিলাম না—ম্লান হেসে তাড়াতাড়ি সদানন্দবাবুর গাড়িতে উঠে বসলাম।

পুলিস ক্লাবে এসে দেখি সবাই আপিসে চলে গিয়েছে। সুখবরটা রাখালদাদের জানাতে না পেরে মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগলো। খাওয়া দাওয়া করে শুলাম। ঘুমোতে পারলাম না, উঠে পড়লাম। বেলটা চারটে আন্দাজ বেরিয়ে পড়লাম। কোথায় যাই—ভাবলাম স্টেশনের দিকে যাই—সাড়ে চারটের সময় চাঁদপুরের গাড়ি আসে, হয় তো চেনা লোক দু'-একজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। আজ একা থাকতে ভালো লাগছিলো না—। উদ্দেশ্যহীনভাবে platform-এ পায়চারি করতে শুরু করে দিলাম। চাঁদপুরের গাড়ি এল, অগুন্তি লোক নামলো, চেনা একটিও না। মিনিট পনেরো বাদে দেখলাম platform প্রায় খালি হয়ে গিয়েছে। এক পা দু' পা করে খালি platform-এর পশ্চিম দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলাম। অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ হুঁশ হলো। দেখি, European Quarters-এর কাছে এসে পড়েছি। সামনে ছোট্ট একটা পার্ক, কিছু দূরে দূরে লোহার বেঞ্চি পাতা—তারই একটিতে বসে পড়লাম। দূরে পড়ন্ত রোদের লাল আভা কৃষ্ণচূড়ার লাল মাথা আরও রাঙিয়ে দিয়েছে—মুগ্ধ তন্ময় হয়ে তাই দেখছি। কতোক্ষণ এইভাবে ছিলাম মনে নেই, হঠাৎ চমকে উঠলাম। দেখি, আপাদমস্তক কালো লোমে ঢাকা ছোট্ট একটা জাপানি ল্যাপ ডগ এরই মধ্যে কখন বুকের ওপর উঠে বসে দুটো পা দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরে লোমের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট কুৎকুতে চোখ দুটো দিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে। আতঙ্কে ও উৎকণ্ঠায় উঠে দাঁড়িয়েছিলাম—পিছনে চোখ পড়তেই দেখি, অপরূপ সজ্জায় হাত দুই দূরে দাঁড়িয়ে আমার এই অসহায় অবস্থাটা পরম কৌতুকের

সঙ্গে উপভোগ করছে মোহময়ী মিসেস মুলাণ্ড! মনে মনে প্রমাদ গুণলাম। বাংলার প্রসিদ্ধ প্রবাদ বাক্যটি মনে পড়লো—যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। কুকুরটাকে টেনে ছুঁড়ে ফেলে দেবো কিনা ভাবছি—বিদ্রোহী মন তখনই চোখ রাঙিয়ে উঠলো—বুঝলাম সেটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না—আমার চেয়ে ঐ pet কুকুরটার মূল্য যে অনেক বেশি সেটা বুঝতেও দেরি হলো না। অগত্যা জোর করে মুখে হাসি এনে ঐ লোমের জঙ্গলে হাত বুলিয়ে কুকুরটাকে আদর করতে শুরু করে দিলাম। দেখি মেম সাহেব একেবারে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসিমুখে ডান হাতখানা আমার দিকে বাড়িয়ে মেম সাহেব বললে—গ্ল্যাড?

হকচকিয়ে গেলাম। ভাবলাম—কুকুরটাকে বুকের ওপর আদর করতে পেয়ে গ্ল্যাড না মেম সাহেবের সুপারিশে টেকনাফ যাওয়া বন্ধ হয়েছে বলে গ্ল্যাড—কোনটা? আস্তে আস্তে কুকুরটাকে সবুজ ঘাসে ভরা লনটার উপর নামিয়ে দিতেই সে ছুটে দূরের বেঞ্চিটার ওপর লাফিয়ে উঠে বসলো। দুরু দুরু বক্ষে হাসিমুখে মেম সাহেবের প্রসারিত হাতখানা দু'হাতে চেপে ধরে বললাম—তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারবো না মিসেস মুলাণ্ড।

কপট তিরস্কারের ভঙ্গিতে মেম সাহেব বললে—সিলি! তোমাদের—মানে ইণ্ডিয়ানদের দেখেছি একটুতেই sentimental হয়ে পড়ো। সিট ডাউন।

দু'জনে পাশাপাশি গা ঘেঁষে বসে পড়লাম। দেখি, আমার হাতখানা তখনও মেম সাহেব ধরে আছে—ছাড়িয়ে নিতে সাহস হলো না।

একটু চুপ করে থেকে—দূরে দৃষ্টি মেলে মেম সাহেব যেন নিজের মনেই বলে চললো—বরাবরই 'জনি' হেড স্ট্রং ও জেলাস—ইদানীং আরো বেড়ে গিয়েছে। সুন্দর ও স্মার্ট কোনও ছেলের সঙ্গে আমায় কথা বলতে দেখলেই ও রাগে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করে বসে—তুমি জানো না ভট্চায কি করে সব দিক মানিয়ে আমায় চলতে হয়! You can't imagine how unhappy I am. কথার শেষে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো।

অবাক হয়ে শুধু ভাবলাম—এ সব ঘরোয়া কথা মেম সাহেব

আমাকে শোনাচ্ছে কেন? কি জবাব দেবো, চুপ করে বসে ঘামতে লাগলাম।

একটু পরে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে মেম সাহেব বললে—ভট্চায, ডু ইউ বিলিভ ইন লভ? ভালোবাসার অস্তিত্বে তোমার বিশ্বাস আছে?

এ কী প্রশ্ন! ভয়ে বিস্ময়ে কাঠ হয়ে গেলাম। দেখি, উত্তরের আশায় মেম সাহেব মুখের দিকে চেয়ে আছে। কি বলি? আমতা আমতা করে বললাম—সিওর!

হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লো মেম সাহেব—যেন উন্মাদের হাসি—থামতেই চায় না। লজ্জায় লাল হয়ে ভাবলাম—কী এমন হাসির কথা বলেছি! যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিলো তেমনি হঠাৎ থেমে গেল হাসি। গম্ভীর হয়ে মেম সাহেব বললে—তুমি বিশ্বাস করতে পারো দু'বছর আগে ঐ মুলাণ্ডের জন্য আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম—এক ঘণ্টা না দেখতে পেলে পৃথিবী অন্ধকার মনে হতো? ভাবতাম, এই হলো সত্যিকার লভ। ভুল, ভুল, মস্ত ভুল। ভালোবাসা বলে কিছু নেই। মুলাণ্ডের আগে আরো চার জনের প্রেমে পড়েছিলাম—প্রত্যেকবারই মনে হতো এই সত্যি, এইটেই খাঁটি ভালোবাসা—!

মেম সাহেবের হাতের মুঠোর মধ্যে হাতখানা ঘেমে উঠেছে—নিরুপায়, চুপ করে বসে রইলাম। মেম সাহেব বলে চললো—আজ ওদের দেখলে হাসি পায়—একদিন ওদের জন্য পাগল হয়ে ছিলাম মনে হলে নিজের ওপর রাগ হয়। আর Johny! You don't know young man, how I hate him! How I hate him!

মিসেস মুলাণ্ডের চরিত্রের এ দিকটা একেবারে অজানা ছিলো—বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে চুপ করে রইলাম।

একটু পরে হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে মেম সাহেব বললে—Do you know Bhattacharjee, I like you? তুমি টাউনে থাকলে আমি খুশিই হবো। But love! oh never, never. ভালোবাসাটা মিথ্যে কথা—ভালোলাগাটাই সত্যি! হঠাৎ চেঁচিয়ে মেম সাহেব ডাকলো—গ্রেটা!

স্বপ্ন ভেঙে গেল—দেখি, সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশে গিয়ে কুকুরটা লাফিয়ে উঠেছে মেম সাহেবের কোলে—আদরে চুমুতে আচ্ছন্ন করে ছেড়ে দিতেই সে লাফিয়ে আমার কোলে এসে বসলো—তারপর আস্তে আস্তে আমার ডান পাশে সরে গিয়ে সামনের পা দুটো তুলে মুখটা আমার কোলে রেখে দিব্যি আরামে শুয়ে পড়লো। হঠাৎ আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত বাড়িয়ে কুকুরটাকে আদর করতে শুরু করলো মেম সাহেব—ইউ নটি গ্রেটা, হাউ ডু ইউ নো আই লাইক হিম? মুখে মদের গন্ধ পেলাম। মেম সাহেবের এত উচ্ছ্বাসের কারণ খানিকটা বুঝতে পারলাম।

আদর আর শেষ হয় না। আমি যে রক্তমাংস দিয়ে গড়া একটা মানুষ—মনে হলো সে কথা একদম ভুলে গিয়েছে মেম সাহেব। আমি যেন জড়পিণ্ড, নয় তো ঐ লোহার বেঞ্চের একটা অংশ। কতোক্ষণ এইভাবে বসেছিলাম জ্ঞান নেই—হঠাৎ দু'জনে চমকে উঠলাম—দেখি একেবারে কাছে দাঁড়িয়ে আছে মুলাণ্ড। তাড়াতাড়ি কুকুরটাকে বুকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো মেম সাহেব। চাপা গম্ভীর গলায় মুলাণ্ড বললে—It is past eight o'clock Milly! Everybody is waiting for you.

Oh, sorry dear,—বলে কোনোদিকে না চেয়েই চলে গেল মেম সাহেব। শুধু মুলাণ্ড যাবার আগে একটা দৃষ্টি দিয়ে আমার আপাদমস্তক দেখে চলে গেল। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে না পেলেও সে দৃষ্টির অর্থ বুঝতে কষ্ট হলো না।

এতো দুঃখেও হাসি পেলো আমার। ভাবলাম, ভাগ্য ছাড়া পথ নেই। বিধাতা অলক্ষ্যে দাবার ছকে যে ঘুঁটি সাজিয়ে রেখেছেন—তার বাইরে চাল দেবার সাধ্য কারও নেই।

পুলিস ক্লাবে যখন ফিরলাম—তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে। রাখালদা বললেন—কোথায় ছিলে ধীরাজ! কোতোয়ালি থেকে হেমবাবু তোমায় দু'বার ডাকতে পাঠিয়েছেন—বলেছেন যতো রাত্রি হোক একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। কোনও কথা না বলে কোতোয়ালিতে চলে এলাম। দেখি, অতো রাতেও সদানন্দবাবু, চাঁদ মিঞা, হেমদা আরও দু' তিনজন অজানা অফিসার বসে

আছেন। কেমন একটা গম্ভীর নিস্তব্ধ ভাব। চুপ করে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সদানন্দবাবু বললেন—বসো ধীরাজ! কাঠের পুতুলের মতো একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

ও. সি. চাঁদ মিঞা বললেন—হঠাৎ ঘণ্টা দেড়েক আগে আর্দালি দিয়ে বড় সাহেব লিখে জানিয়েছেন—তোমাকে টেকনাফেই বদলি করা হলো। এখানে রাখা হবে না। হঠাৎ কেন যে সাহেবের মত পরিবর্তন হলো বুঝতে পারলাম না।

আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম আজকের সন্ধ্যার ঘটনা কাউকে বলবো না। চুপ করে রইলাম।

হঠাৎ হেমদা টেবিলে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মেরে বলে উঠলেন—চাষা, হাল চাষা। ব্যাটা বিলেতে নির্ঘাৎ লাঙ্গল চষতো। সুপারিশের জোরে বড় সাহেব হয়ে এখানে এসেছে।

সদানন্দবাবু সায় দিয়ে বললেন—সামান্য ভদ্রতাটুকু জানে না! আমাদের কথা দিয়ে তা' রাখলো না?

বাধা দিয়ে হেমদা বললেন,—হ্যাঁ, রাখবে! মিসেস মুলাণ্ড পর্যন্ত কতো অনুরোধ করলে তাই বড় রাখলে। আমার কি মনে হয় জানেন স্যার? ব্যাটা নিশ্চয় নপুংসক। তাই ওর দ্বিতীয় রিপুটা এতো প্রবল।

চাঁদ মিঞা এতোক্ষণ একটা কথাও বলেননি। হাত তুলে হেমদাকে বাধা দিয়ে বললেন—ভুলে যেও না হেম, এটা কোতোয়ালি থানা আর ঐ মুলাণ্ড হচ্ছে আমাদের ওপরওয়ালা। এসব আলোচনা আপিসের বাইরে বসে করাই নিরাপদ।

সদানন্দবাবু সায় দিয়ে বললেন—হেম একটু বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। যাক, আসল কথায় আসা যাক, কি করবে ধীরাজ?

মৃদুকণ্ঠে বললাম—আমার জন্যে কেন আপনারা এতো অপমান সহ্য করছেন স্যার? আমি তো আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম চাকরি করবো না।

কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথাই বললেন না।

সদানন্দবাবু আমাকে কাছে ডেকে এনে বসালেন। তারপর শান্ত স্বরে বললেন,—ধীরাজ, তুমি ছেলেমানুষ তাই একটুতেই

মাথা গরম হয়ে ওঠে। আমি তোমার বাপের বয়সী। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শোনো। কক্সবাজারের নাম শুনেছো?

ঘাড় নেড়ে জানালাম শুনেছি।

—কক্সবাজার খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা। অনেক দূর দেশ থেকে লোকে ওখানে হাওয়া বদলাতে আসে। কিন্তু টেকনাফ তার চেয়েও স্বাস্থ্যকর জায়গা।

বিস্মিত হয়ে সদানন্দবাবুর মুখের দিকে চাইলাম। সদানন্দবাবু হেসে বললেন—হ্যাঁ, আমি নিজে গিয়েছি সেখানে। চমৎকার জায়গা। জিনিসপত্তোর জলের দামে পাওয়া যায়। তোমার একমাত্র অসুবিধে হবে সঙ্গীর। তা তুমি যে রকম আলাপী তাতে বেশিদিন সে অভাবও থাকবে না। আর মগের ভাষা? কিছুদিনের মধ্যেই শিখে নিতে পারবে।

চুপ করে রইলাম।

হেমদা বললেন—স্যার ঠিক কথাই বলেছেন। তুমি চলে যাও টেকনাফে। কাজকর্ম কিছু নেই, খালি মজা করে খাও ঘুমোও আর চোখভরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখো।

সদানন্দবাবু বললেন,—চিটাগাং শহর দেখে যদি তোমার ভালো লেগে থাকে, টেকনাফ দেখলে মনে হবে সেটা স্বয়ং বিশ্বকর্মার হাতের তৈরি আর এটা মানুষের গড়া।

চাকরিতে ইস্তফা দেবার ইচ্ছাটা পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। মনে মনে তাহারই আলোচনা করছি এমন সময় শুনলাম সদানন্দবাবু বলছেন—ধীরাজ, একটা সরকারি চাকরি যোগাড় করতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। কিন্তু ছাড়তে লাগে এক মিনিট। যদি সেখানে তোমার ভালো না লাগে, ছেড়ে দিও। তবু সরকারের পয়সায় অমন একটা জায়গা ঘুরে আসা, সেটাও কি কম লাভ?

মন স্থির করে উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—আমি যাবো স্যার।

আর কেউ কিছু বলবার আগেই কোতোয়ালি থেকে বেরিয়ে সটান পুলিস ক্লাবে চলে এলাম।

সেদিন আর কোথাও বার হইনি, কারও সঙ্গে কথাবার্তাও

বললাম না। হাতে মাত্র আর একটি দিন সময় পরশুদিন বেলা ন'টার স্টীমারে আমায় টেকনাফ রওনা হতে হবে, মুলাণ্ডের আদেশ। সে আদেশের নড়-চড় হবার জো নেই। রাজ্যের অভিমান জড়ো হলো বাবা আর মায়ের উপর। বেশ ছিলাম কলকাতায়; এতোদিন ছবিতে আমার নাম, প্রতিপত্তি, পয়সা কোনোটারই অভাব থাকতো না। তা নয় দিলে জোর করে পুলিসে ঢুকিয়ে। বেদের মতো আজ এ-দেশ কাল ও-দেশ করে হয়রান হয়ে মরছি। চিঠির কাগজ টেনে নিয়ে বাবাকে চিঠি লিখতে বসলাম, লিখলাম—

শ্রীচরণকমলেষু—

এখানে আসিয়া আপনাকে পত্র দিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিয়াছিলাম চট্টগ্রাম আমার খুব ভালো লাগিয়াছে। বোধহয় কোতোয়ালিতেই আমাকে বহাল করিবে, কিন্তু ভাগ্যদোষে সব উলটপালট হইয়া গিয়াছে। আগেকার এস. পি. এখান হইতে বদলি হইয়া গেলেন। তাঁহার স্থলে অন্য একজন আসিলেন। এই উপলক্ষ্যে সেদিন কোতোয়ালি থানায় একটি বিদায়-সভার আয়োজন করা হয়। সবাই মিলিয়া আমাকে সেই সভায় গান ও আবৃত্তি করিতে অনুরোধ করেন। সাহেবদের সুনজরে পড়ার এমন সুযোগ ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না মনে করিয়া আমি সানন্দে রাজী হইয়াছিলাম; কিন্তু ফল হইল অন্যরূপ। নূতন সাহেব আমাকে কিছুতেই শহরে রাখিতে রাজী হইল না। এখানকার বহু বিজ্ঞ অফিসার আমাকে এখানে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাহেব কিছুতেই রাজী হইল না। তাহার এক কথা—এখানে থাকিলে আমি কাজকর্ম কিছুই করিব না, শুধু আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইব। এই যুক্তি দেখাইয়া সাহেব আমাকে সুদূর টেকনাফে বদলি করিয়াছে। পরশু এখান হইতে রওনা হইব।

এখানকার লোকমুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে বুঝিলাম টেকনাফ অতি ভয়ঙ্কর জায়গা। এখান হইতে

স্টীমারে যাইতে আড়াই দিনের বেশি লাগে। বঙ্গোপসাগরের পারে ছোট্ট একটি দ্বীপ, তাহার বাসিন্দারা সব মগ, তাহাদের ভাষা বোঝা যায় না। কলিকাতা হইতে চিঠি যাইতে চৌদ্দ পনর দিন লাগে। টেলিগ্রাম যায় সাত দিনে। বছরের সাত মাস এই দ্বীপটার সঙ্গে বাইরের জগতের কোন সংশ্রব থাকে না। শুধু শীতকালে যখন সমুদ্র একটু শান্ত থাকে, তখন চট্টগ্রাম হইতে সপ্তাহে একদিন স্টীমার যায় ও আসে। ভয়ঙ্কর সব অপরাধীদের ঐ দ্বীপে নির্বাসন দেওয়া হয়। ওখান হইতে অধিকাংশই আর ফিরিয়া আসে না। এখানকার অনেকেই আমাকে নিষেধ করিতেছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম যাইব না, কিন্তু অনেক ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত যাওয়াই স্থির করিলাম। চাকরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় গেলে আপনারা ভাবিবেন, ফিল্ম-এ অভিনয় করিবার জন্য একটা মিথ্যা ছল করিয়া আমি চাকরি ছাড়িয়াছি।

আশা করি এইবার আপনারা নিশ্চিন্ত ও আনন্দিত হইবেন, কারণ ওখান হইতে ফিরিবার সম্ভাবনা আমার খুব কম আর ইচ্ছাও নাই। জীবনে আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। আর অধিক লিখিয়া আপনাদের ধৈর্য নষ্ট করিব না। অজ্ঞাতে শ্রীচরণে যদি কোনও অপরাধ করিয়া থাকি মার্জনা করিবেন। আপনি ও মা আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিবেন, ছোটভাই বোনকে আমার আশীর্বাদ দিবেন। ইতি—প্রণত সেবকাধম ধীরু।

নিজের হাতে চিঠিটা স্টেশনের ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে এসে মন অনেকটা হাল্কা হলো।

চট্টগ্রাম বন্দর। শনিবার সকাল আটটা। এখান থেকেই টেকনাফের স্টীমার ছাড়বে। ঐ দিনটির কথা এখনও আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মনে হয় যেন সেদিনের ঘটনা।

স্টীমার ছাড়বে বেলা ন'টায় কিন্তু রাখালদা ভোর চারটের সময় উঠে সোরগোল করে সবাইকে উঠিয়েছেন। ঠাকুরকে দিয়ে তিন-চার ভাগে রান্না করিয়েছেন এবং খাওয়ার কোনো রকম ইচ্ছা না থাকলেও জোর করে আমাকে খাইয়ে সদলবলে জেটিতে এনে হাজির করেছেন।

কপট অভিমান করে বললাম—তোমরা আমায় বিদেয় করতে পারলেই বুঝি বাঁচো রাখালদা ?

একটু চুপ করে থেকে রাখালদা জবাব দিলেন—সত্যিই ভাই। এখানে থাকলে তুমি একটা বিপদের মধ্যে পড়তে ধীরাজ। মুলাও ভয়ানক চটে আছে। ছুতোয়-নাতায় একদিন না একদিন একটা পানিশমেন্ট দিয়ে দিতোই। ওপরওয়ালা তুষ্টু না থাকলে নিরাপদে কি চাকরি করা যায় ভাই ? তার চেয়ে এ তোমার ভালোই হয়েছে জেনো। মনে করো হাওয়া বদলাতে চেঞ্জে যাচ্ছো নয় তো এ্যাডভেঞ্চারও মনে করতে পারো।

এতো দুঃখের মধ্যেও না হেসে পারলাম না। বললাম—সেখানেও যদি এ রকম একটা এ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়ি রাখালদা ? তাহলে সেখান থেকে পালিয়ে কোথায় যাবো বলতে পারো ? সে দ্বীপ থেকে তো পালাবার পথও নেই।

রাখালদা কিছু বলবার আগেই হঠাৎ দেখি বেশ ভিড় জমে উঠেছে জেটিতে। দু'-তিনটে লোকাল ক্লাবের ছেলেরা এসেছে আমায় বিদায় দিতে। বোঝা গেল আমার ভাগ্য বিপর্যয়ের সংবাদ চট্টগ্রামের মতো ছোট্ট শহরে আর কারও জানতে বাকি নেই। কিছু পরেই দেখি, খাতা পেন্সিল হাতে অনেকগুলো স্কুলের ছেলেও এসেছে, অভিভূত হয়ে গেলাম। এমনি সময়ে একখানা মোটরে হেমদা কোতোয়ালির দলবল নিয়ে হাজির। গাড়ি থেকে নেমে চারপাশের ভিড় দেখে হেমদা প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন। তারপর বললেন—নাঃ, মুলাও ঠিক কথাই বলেছে। এই ক'দিনে তুমি যে রকম পপুলার হয়ে উঠেছো, তাতে এখানে তোমাকে রাখলে কাজকর্ম তুমি কিছুই করতে না। খালি প্রেম করে আর আড্ডা দিয়ে বেড়াতে।

আগেই বলেছি, হেমদার মুখটা একটু বেশি রকম আলগা।

লজ্জা পেয়ে শুধু বললাম—যাঃ, কি হচ্ছে হেমদা। বড় বড় অফিসার রয়েছেন, তাছাড়া স্কুলের ছেলেরাও রয়েছে।

সদানন্দবাবু এই সময় ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে বললেন—আমি খুব খুশি হয়েছি ধীরাজ। আমি এখনও বলছি, এর জন্য কোনো দিন তোমায় অনুতাপ করতে হবে না।

হেমদা বললে—বহুদিনের মধ্যে জাহাজঘাটে এতো ভিড় আর দেখেছেন স্যার? এ যেন কোনো রাজা-মহারাজাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে সবাই এসেছি। বলেই প্রকাণ্ড এক চড় আমার পিঠে কষিয়ে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন হেমদা।

রাখালদা বললে—চলো, একটু সময় থাকতে থাকতে জাহাজে ওঠা যাক। নইলে জায়গা পাওয়া মুশকিল হবে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। প্রকাণ্ড ডেকের উপর তিল ধারণের স্থান নেই। বিচিত্র পোশাকে অগুন্তি নরনারী এক দুর্বোধ্য ভাষায় কিচিরমিচির করছে আর একটা উৎকট পচা গন্ধ সমস্ত ডেক মশগুল করে রেখেছে।

নাকে রুমাল দিয়ে রাখালদাকে বললাম—শিগগীর এখান থেকে কেবিনে চলুন রাখালদা, আমার বমি আসছে।

পাশ থেকে হেমদা উচ্চৈঃস্বরে হেসে বললেন—কেবিন? এ জাহাজে ওসব কিছু নেই ভায়া! সবেধন নীলমনি এই ডেক। আর গন্ধ? ও তো শুঁটকির গন্ধ! এই জাহাজে করে শুঁটকি মাছ চালান যায় আর আসে।

হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে রাখালদা বললেন—ভয় পাচ্ছো কেন ভাই? এদেশে বলে, শুঁটকি মাছের গন্ধ খুব স্বাস্থ্যকর। দু'দিন বাদেই সব সয়ে যাবে।

আমার বেডিং আর স্যুটকেশটা নিয়ে রাখালদা ডেকের মাঝখানে একটা বড় চিমনির পাশে রাখলে। তারপর হেমদার দিকে ফিরে বললেন—হেম, একটা দড়ি চাই যে।

হেমদা কিছু দূরে গিয়ে একটা কনস্টেবলকে চুপি চুপি কি বলতেই একটু বাদে দেখি জাহাজের ইঞ্জিনরুমের দিক থেকে কালি-ঝুলি-মাখা একটা লোক খানিকটা দড়ি হাতে করে এনে

দিলে। হেমদা চট্টগ্রামের ভাষায় তাকে বললেন—বাবু আমাদের নিজের লোক। দেখবে, কোনো কষ্ট যেন না হয়। সেলাম করে সে চলে গেল।

রাখালদা দড়ি নিয়ে স্যুটকেসটা চিমনির সঙ্গে তখনই বেঁধে ফেলেছেন। অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—ওটাকে বাঁধছো কেন রাখালদা ?

কোনো জবাব না দিয়ে রাখালদা অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হেমদার দিকে চাইলে। হেমদা আমাকে একপাশে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—এর আগে কখনো সমুদ্রযাত্রা করোনি তো তাই অবাক হচ্ছো। দেখবে, জাহাজ যখন মাঝ-সমুদ্রে পড়বে তখন মোচার খোলার মতো দুলবে। তাছাড়া বড় বড় ঢেউ হঠাৎ হয়তো ডেকের উপর দিয়েই চলে গেল। ঢেউ চলে গেলে দেখবে তোমার স্যুটকেস বেডিং সব সেই সঙ্গে চলে গিয়েছে। এইজন্যই বেঁধে রাখা, বুঝলে ?

বুঝলাম। কিন্তু কি জবাব দেবো ? এর মধ্যে হেমদা আরও দু' তিনজন জাহাজের কর্মচারিকে আমার কথা বলে দিলেন। জাহাজ ছাড়ার ঘণ্টা পড়লো, শুরু হলো বিদায়ের পালা। হেমদা, রাখালদা, আমার আর আর সব পরিচিত অপরিচিত সবাই এগিয়ে এল। কারো মুখে হাসি নেই, শুধু আমি হাসিমুখে সবাইকে ধন্যবাদ জানালাম। চেষ্টা করলেও তখন কথা কইতে পারতাম না।

একে-একে সবাই নেমে গেল। খালাসীরা কাঠের সিঁড়ি তুলে নিতেই ডেকের ধারে রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। একটু একটু করে জাহাজ জেটি ছেড়ে এগুতে লাগলো।

চৈত্র মাসের প্রচণ্ড রোদ বঙ্গোপসাগরের উন্মাদ নোনা ঢেউ-এর সঙ্গে মাতামাতি শুরু করে দিলে। বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকা যায় না, চোখ ঝলসে যায়; তবু চেয়ে থাকি। তখনও দেখতে পাচ্ছি, হাত তুলে হেমদা চিৎকার করে কি যেন বলছেন, কিন্তু প্রচণ্ড হাওয়া সে কথাগুলোকে উল্টো দিকে চালান করে দিচ্ছে, এক বর্ণও শুনতে পেলাম না।

ঐ তো একপাশে রাখালদা, রমেশ, যতীন, ব্যানার্জি চুপ করে

দাঁড়িয়ে আছে আর ঐ তো ছেলের দল হাত তুলে খাতা নাড়ছে, ঐ তো…

আর দেখতে পাচ্ছি না, চোখ ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে আবার জোর করে তাকাই, শুধু দেখা যায় তীররেখা অস্পষ্ট ধোঁয়ায় ঘেরা।

কতোক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না। চমক ভাঙতে দেখি চারদিকে শুধু জল আর জল, উপরে অসীম অনন্ত নীলাকাশ। ছোট মোচার খোলার মতো আমাদের স্টীমারখানা পাগলা ঢেউ-এর অনুকম্পা ভিক্ষা করে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে একটু একটু করে এগোচ্ছে।

এইবার মনে হলো সত্যিই অকূলে ভাসলাম। স্টীমার মাঝ-সমুদ্রে ভীষণ দুলছিলো। টলতে টলতে কোনোমতে এসে বাঁধা স্যুটকেসটার উপর থেকে বেডিংটাকে তুলে নিয়ে অতি কষ্টে ডেকের উপর পেতেই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে হঠাৎ পাঁচ বছরের অসহায় শিশুর মতো হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলাম।

পরদিন বেলা আন্দাজ এগারোটায় স্টীমার কক্সবাজার পোঁছলো। কক্সবাজার চট্টগ্রামের একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থান। দূর-দূরান্তর থেকে হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য লোকে এখানে আসতো—বিশেষ করে টি-বি. রুগীর দল। অনেক যাত্রীই এখানে নেমে গেল, আমি স্টীমারেই রেলিং ধরে যতোদূর দৃষ্টি যায় দেখে নিতে লাগলাম। মনের অবস্থা তখন অনেকটা শান্ত—খানিকটা বেপরোয়া ভাব। হঠাৎ মনে পড়লো কাল রাত্রে কিছুই খাওয়া হয়নি এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা উদগ্র খিদের জ্বালা আমাকে অস্থির করে তুললো। তাড়াতাড়ি করে মাথাটা দু'তিন মগ জল দিয়ে বেশ করে ধুয়ে ডেকের শেষপ্রান্তে বাবুর্চিখানায় গিয়ে হাজির হলাম।

ঘরটা অন্ধকার, হঠাৎ বাইরে থেকে গেলে ভিতরের কিছুই দেখা যায় না। ভাবছি ভিতরে ঢুকবো, না, এখান থেকেই কাউকে

ডাকবো। হঠাৎ কানে এল—'সেলাম-সাব'। চেয়ে দেখি মিশমিশে কালো প্রায় সাড়ে ছ'ফুট এক মূর্তি দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। তার সমস্ত মুখটা কালো দাড়িতে ঢাকা, খালি গা, পরনে চৌকো ঘর-কাটা নানা রঙের বিচিত্র লুঙ্গি, আনকোরা নতুন বলেই মনে হলো। মাথায় তেল কুচকুচে নোংরা এক টুকরো কাপড় বাঁধা, বোধ হয় আগে রুমাল বা ঝাড়ন ছিলো। হাতে প্রকাণ্ড ধারালো একটা ছুরি, তাতে টাটকা রক্ত লেগে রয়েছে। বেশ ভড়কে গেলাম। মুখের দিকে চেয়ে কিছু একটা বলবার জন্য ইতস্তত করছি, এমন সময় সেই দাড়ির জঙ্গল নড়ে উঠলো, তার ভিতরে দেখলাম সাদা ধবধবে ছু'পাটি দাঁত। এতোক্ষণে খানিকটা ভরসা পেলাম। নিঃশব্দে হেসে আবার সেলাম করে সে চট্টগ্রামের বাঙলায় যা বলে গেল, তার মানে হচ্ছে—কোতোয়ালির বড়বাবু তাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যে, সাহেব এই প্রথম সমুদ্র যাত্রা করছেন। যাতে কোনো কষ্ট না হয়, সব সময় সেদিকে নজর রাখতে। গত রাত্রে সে ছু'বার সাহেবকে খাবার জন্যে ডেকেছে, কিন্তু সাহেবের মন খারাপ, কান্নাকাটি করছেন দেখে সে প্রথমবার ফিরে এসেছে। অনেক রাত্রে আবার ডেকেছে, কিন্তু সাহেব বলে দিয়েছেন খিদে নেই। সুতরাং বান্দা আবছুলের কসুর মাফ হুজুর নিশ্চয়ই করেছেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। শুধু একটা কথা কাঁটার মতো বিঁধতে লাগলো যে, ও আমার কান্নাকাটির কথাটা একগাল হাসিমুখ নিয়ে কেন বললো। বেশ বুঝতে পারলাম, যে ক'দিন স্টীমারে থাকবো সে ক'দিন মুখে হুজুর হুজুর করলেও মনে মনে আবছুল আমাকে একটা অসহায় জীব ছাড়া কিছুই মনে করবে না। বললাম—খুব খিদে পেয়েছে। রান্নার কতো দেরি আবছুল ?

বিস্ময়ে চোখ ছুটো কপালে তুলে আবছুল বললে—রান্না ? এখন কি হুজুর, এই তো সবে মুরগী জবাই করে উঠলাম।

প্রকাণ্ড ছুরিটার দিকে চোখ পড়লো। কি এক অজানা ভয়ে শিউরে উঠলাম। ভাবলাম, আবছুল যদি হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে মুরগী মনে করে আমার গলাটা কেটে মাংসের ডেকচির মধ্যে ফেলে দেয় ? ঐ বিকটাকার দৈত্যের পাশে নিজেকে অসহায় ক্ষুদ্র একটা শিকার

ছাড়া জোর করেও আর কিছু মনে করতে পারছিলাম না। চমক ভাঙলো আবদুলের কথায়। রান্নাঘরের ভিতর থেকে একটা টুল এনে বললে—বসুন হুজুর। মিনিট তিনেক বাদে একটা প্লেটে ডবল ডিমের অম্‌লেট আর প্রকাণ্ড দু' শ্লাইস রুটি এনে দিলে। খেয়ে বাঁচলুম। প্লেটটা নিতে এসে আবদুল বললে—আপনি ততোক্ষণ ডেকে পায়চারি করুন হুজুর, আমি চা করে নিয়ে আসছি।

ডেকের উপর পায়চারি করতে করতে দেখলাম আমার সহযাত্রীরা বেশিরভাগ মগ। পরনে ময়লা রঙিন লুঙ্গি, গায়ে রঙিন ফতুয়া, মাথায় রঙিন রুমাল বা কাপড়ের টুকরো বাঁধা, মুখে বর্মা চুরুট। পুরুষ-নারী সবারই ঐ এক অবস্থা। তখন খাবার সময়, তাই এক একটি সংসার ছেলেপুলে নিয়ে গোল হয়ে খেতে বসেছে। যাত্রীদের সংখ্যা অনুমানে মনে হলো প্রায় দু' শ'র উপর হবে। পায়চারি করতে করতে কাছে গিয়ে দেখলাম বেশিরভাগই খাচ্ছে বাসি ভাত, মুরগীর মাংস, আর একটা কাগজের ঠোঙা থেকে হলদে একটা গুঁড়ো। পরে জেনেছিলাম, সেটা শুঁটকি মাছের গুঁড়ো। আমার তো গন্ধে বমি আসবার অবস্থা; কিন্তু ওরা পরমানন্দে তাই খাচ্ছে। সমস্ত ডেকের উপর থেকে একটা বিচিত্র গুঞ্জন ভেসে আসছে—চিং লুং মিং চু, রিমিহি, লং ফু—যার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না, শুধু বুঝলাম ঐটিই ওদের ভাষা। এই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে আর কতোক্ষণ কাটতো বলতে পারি না, যদি না আবদুল এসে বলতো—খানা তৈরি হুজুর।

ঐ নোংরা স্যাঁতসেঁতে রান্নাঘরের একপাশে একটা টুলের উপর বসে আর একটা টুলকে টেবিল করে কলাই-করা থালায় মুরগীর ঝোল আর ভাত খেলাম। জীবনে বহু জায়গায় বহু ভালো-ভালো রাঁধুনীর হাতে খেয়েছি; কিন্তু সেদিন বে অব বেঙ্গলের বুকে ছোট্ট একটা স্টীমারের একটা নোংরা ঘরে বসে যা খেয়েছিলাম, তার স্বাদ আজও আমার জিভে জড়িয়ে আছে, হয় তো চিরদিন থাকবে।

খাওয়া শেষ করে ডেকে এসে বেডিং-এর উপর বসে পড়লাম। ততোক্ষণে আমার মগ সহযাত্রীর দলও আহারাদি শেষ করে বিশ্রাম করছে। দূরে কক্সবাজারের দিকে তাকালাম। ঝাপসা ধোঁয়ায়

ঢাকা তটভূমি, প্রকাণ্ড ঢেউ দূর থেকে তাল ঠুকে এগোতে এগোতে শেষকালে তীরে গিয়ে আছাড় খেয়ে ভেঙে চুরমার হয়ে লজ্জায় ফিরে আসছে, আবার যাচ্ছে আবার আসছে। ওদের ঐ অবিরাম আসা-যাওয়ার খেলা দেখতে দেখতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম জানি না।

ঘুম ভাঙলো আবছুলের ডাকে। চেয়ে দেখি সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এক কাপ চা নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে আছে আবছুল।—আর কতো ঘুমোবেন হুজুর, দু'বার এসে ফিরে গিয়েছি।

লজ্জা পেলাম। চা খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম—জাহাজ কখন ছাড়বে আবছুল?

—রাত ঠিক দশটায়।—বললে আবছুল।

স্টীমার ছাড়লো ক'টায় ঠিক বলতে পারবো না। আবার অকূলে ভাসলাম।

অনেক রাতে একটা বিকট কান্নার আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দেখি বে অব বেঙ্গলের মাঝখানে জাহাজ থেমে আছে, আর ডেকের উপর আমার মগ সহযাত্রীরা এক সঙ্গে কান্না শুরু করে দিয়েছে। সেই কান্নার মধ্যে একটি কথা বারবার করুণভাবে আমার কানে এসে ঘা দিচ্ছিলো—লুংচু উ-উ-উ—ব্যাপার কি? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি। কি এক হুর্বোধ্য ভাষায় ছেলে, বুড়ো, মেয়ে সবাই হাউমাউ করে কাঁদছে, আর একবার করে লংচু বলছে। হাসবো না কাঁদবো, বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে এদিক-ওদিক ঘোরা-ফেরা করার পর এক-পা এক-পা করে এগিয়ে চললাম আমার অগতির গতি আবছুলের রান্নাঘরের দিকে। সেখানেও দেখলাম, বেশ জটলা চলছে। আবছুলকে জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা যা শুনলাম, তা হলো এই—আধ ঘণ্টা আগে একটা দমকা হাওয়ায় স্টীমারটা খুব ছুলে ওঠে। সেই দোলানির সময় চার বছর বয়েসের একটি মগের ছেলে লংচু গড়িয়ে রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে সমুদ্রে পড়ে যায়। নিয়ম হচ্ছে, বেশ শক্ত দড়ি দিয়ে ছোট ছেলেমেয়ে আর বাক্স-বিছানা বেঁধে রাখা। ওরা সে নিয়ম মানেনি, তাই এই বিপর্যয়।

রাখালদার কথা মনে পড়লো। স্টীমারে উঠেই দড়ির খোঁজ কেন করেছিলেন, এইবার বুঝলাম। স্টীমার কেন থামানো হলো জানতে চাইলাম। একটু ম্লান হেসে আবদুল বললে—ওটা হুজুর ওর মা-বাপকে শুধু একটু সান্ত্বনা দেওয়া। ওদের ধারণা জাহাজ থামলেই লুংচুকে ওরা ঢেউ-এর মাথা থেকে ছিনিয়ে নেবে।

মিনিট দশেক পরে হুইসল দিয়ে স্টীমার ছেড়ে দিলে। আস্তে আস্তে গিয়ে বেডিংটার উপর বসলাম। দেখলাম, লুংচু'র মাকে তিন-চার জন স্ত্রী-পুরুষ ধরে বসে আছে। এক অদ্ভুত ভাষায় সবাই এক সঙ্গে সান্ত্বনা দিচ্ছে, আর হতভাগিনী মা জলভরা চোখে বঙ্গোপসাগরের নিষ্ঠুর ঢেউগুলোর দিকে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

আজ আত্মীয়স্বজনবিহীন অকূল সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটা স্টীমারে বসে এই কথাটাই বার বার মনে হচ্ছিলো—ভাষা যার যতো দুর্বোধ্যই হোক, সন্তানের বিয়োগ-ব্যথা প্রকাশের ভাষা সব দেশের মায়েদের এক এবং ওটা বুঝতে এতোটুকুও কষ্ট হয় না। হঠাৎ আমার মায়ের কথা মনে পড়লো। অজান্তে চোখ ঝাপসা হয়ে এল, ঝাপসা চোখে মরা চাঁদের আবছা আলোয় দেখলুম যেখানে লুংচু'র মা বসেছিলেন সেখানে বসে আছেন আমার মা; মুখের ভাব হুবহু এক। মনে হলো লুংচু নয়, ঐ রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে আমিই পড়ে গিয়েছি বঙ্গোপসাগরের অথৈ জলে।

পরদিন বেলা এগারোটার সময় স্টীমার থামলো। বুঝলাম গন্তব্যস্থানে এসে গিয়েছি। ডেকের ধারে রেলিং ধরে দাঁড়ালাম। দূরে অস্পষ্ট তীর-রেখা দেখা যায়। স্টীমারের ডান দিক থেকে একটা নদী বেরিয়ে গিয়েছে, তার নাম নাফ। একটু বাদে দেখি অনেকগুলো ছোট ছোট নৌকো স্টীমারের দিকে এগিয়ে আসছে নদীর মাঝপথ দিয়ে। ঢেউ নেই, উচ্ছ্বাস

নেই, অদ্ভুত নদী। নৌকোগুলো একে একে এসে স্টীমারের পাশে ভিড়লো। দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সহযাত্রীর দল পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে নামতে শুরু করলো। কি করবো না করবো ভাবছি, হঠাৎ নজর পড়লো একটা নৌকোর উপর দু'জন কনস্টেবলের পোশাক-পরা লোক কাকে যেন খুঁজছে। আমার দিকে নজর পড়তেই চট্টগ্রামের বাঙলায় জিজ্ঞাসা করলো—থানায় যাবেন কি কর্তা ?

ঘাড় নেড়ে জানালাম—হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে অন্য নৌকো সরিয়ে দিয়ে দড়ির সিঁড়ির পাশে নৌকো ভিড়িয়ে একজন বাদুড়ের মতো ঐ সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। যথারীতি স্যালুট করে বললে—স্টীমার আজ অনেক লেট করেছে হুজুর। আমরা প্রায় দু'তিন ঘণ্টা নৌকো নিয়ে অপেক্ষা করছি। আপনার জিনিসপত্তোরগুলো কোথায় ?

দেখিয়ে দিতেই সে চটপট করে সেগুলো বাঁধাছাদা করে কাঁধে তুলে নিলে। আমি আস্তে আস্তে দড়ির সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখি অপর কনস্টেবলটি দু'হাতে সিঁড়িটা ধরে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে আমার নামতে অসুবিধা না হয়। কোনোরকমে সিঁড়ি বেয়ে নৌকোয় নামলাম, নৌকো ছেড়ে দিলো। খানিকদূর এগিয়ে এসে স্টীমারটার দিকে একবার ফিরে তাকিয়ে দেখি, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে বিরাটাকার আবদুল, মুখে সেই হাসি। আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে চিৎকার করে বললে—সেলাম হুজুর।

আশ্চর্য! আবদুলের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম। এই হয়! দীর্ঘ স্টীমার-যাত্রায় ঐ আবদুলই ছিলো আমার একমাত্র সহায় বন্ধু এবং কথা কইবার লোক। অথচ নামবার আগে তার সঙ্গে দেখা করে আসবার কথাটাও মনে হয়নি। প্রতিনমস্কার করে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। আমাদের নৌকো ততক্ষণে সমুদ্র ছেড়ে শান্ত নাফ নদীর মাঝখান দিয়ে চলেছে। সঙ্গী কনস্টেবল দু'জনের সঙ্গে আলাপ জমালাম। ওদের মধ্যে একজন হচ্ছে মগ, নাম হরকিরাম বড়ুয়া। অপরজন বাঙালী, নাম রমেশ দত্ত, চট্টগ্রামেই বাড়ি।

রমেশকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, সমুদ্র থেকে বেরিয়েও এই নদীটা এতো শান্ত মরা নদীর মতো কেন?

রমেশ সভয়ে জিভ কেটে কান মলে আর্তস্বরে বলে উঠলো—অমন কথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করবেন না বাবু। এ নদী এমনি ঠাণ্ডা; কিন্তু সমুদ্রে একটু জোরে হাওয়া উঠলেই রুদ্র মূর্তি ধরে। তখন যদি কোনো নৌকো তীরের কাছাকাছি থাকে, তার আর রক্ষে নেই, আছড়ে ভেঙে চুরমার করে দেবে। এর নিচে সবটাই পাথর। দেখছেন না, সব নৌকো মাঝনদী দিয়ে চলেছে?

হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, হে বাবা বা মা নাফ, অর্বাচীনের অনিচ্ছাকৃত অপরাধে তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না। অন্ততঃ আমরা তীরে ওঠা পর্যন্ত তুমি একটু প্রসন্ন থেকো, দয়া করে আছাড়-টাছাড় মেরো না।

নিরাপদে তীরে উঠলাম। টেকনাফ অদ্ভুত দ্বীপ। লম্বা মাইল দেড়েকের বেশি হবে না, চওড়া প্রায় এক মাইল। নাফ নদীর পুবদিকে হলো আকিয়াব, আর পশ্চিমদিকে টেকনাফ। একদিকে আরকান হিল্‌স, অপরদিকে চিটাগাং হিল্‌স, আর সমস্ত দ্বীপটাকে বেড়াজালে ঘিরে রয়েছে বঙ্গোপসাগর।

ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। কিছুদূর গিয়েই বিস্ময়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম এখানকার ঘরবাড়ির চেহারা। একেবারে ঝকঝকে তকতকে নতুন, যেন কাল কি আজ তৈরি হয়েছে। বাঁশের খুঁটি, বাঁশের বেড়া আর চালাটা তাল বা নারকেলের পাতার মতো পাতা দিয়ে ছাওয়া। দু'-একখানা টিনের চালাও নজরে পড়ে, তবে খুবই কম। রমেশকে প্রশ্ন করতেই একটু হেসে বললে—আগে চলুন থানায়, পরে সব শুনবেন।

থানায় এসেও দেখি সেই একই অবস্থা,—নতুনের হাট বসে গিয়েছে। থানা নতুন, অফিসার-ইন-চার্জ মহেন্দ্র বড়ুয়ার কোয়ার্টার্স নতুন, আমার কোয়ার্টার্সও নতুন। একখানা পুরানো তক্তাপোশ এক পাশে পাতা আছে, আর কিছুই নেই। ঘর ছেড়ে বাইরে বেরোতেই ছোট্ট একটা দাওয়া, তারপর ছোট্ট একফালি উঠোন। সেই উঠোনের শেষদিকে আরো ছোট একটা ঘর বা

ঝুপড়ি, বুঝলাম রান্নাঘর। উঠোনের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা মাচা, চারিদিকে ঘেরা। বুঝলাম পায়খানা। মোটামুটি এই হলো আমার বাড়ি বা কোয়ার্টার্স। তক্তাপোশের উপর জিনিসপত্তোর রেখে থানা ঘরের দিকে রওনা হলাম। বড় দারোগা মহেন্দ্রবাবু বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। পাশের চেয়ারে আর একজন বসে আছেন, সামনের বেঞ্চিতে তিন-চারজন কনেস্টবলও হাজির।

ঘরে ঢুকে নমস্কার জানাতেই প্রতিনমস্কার জানিয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন—বসুন ধীরাজবাবু। পথে খুব কষ্ট পেয়েছেন তো? পাবারই কথা, এ সময়টা সমুদ্র খুব রাফ। প্রাণ নিয়ে যে পৌঁছতে পেরেছেন, এই ঢের।

চুপ করে রইলাম। মহেন্দ্রবাবু রমেশকে ডেকে পাঠালেন। একটু পরে এক কাপ চা ও একটা প্লেটে ডবল ডিমের অমলেট নিয়ে ঘরে ঢুকলো রমেশ।

মহেন্দ্রবাবু বললেন—রমেশ, সতীশকে বলে দাও আজ এ-বেলা ধীরাজবাবু আমার এখানেই খাবেন। রাত থেকে তুমি সব ব্যবস্থা করে দিও।

অমলেট খেতে খেতে হঠাৎ গলায় আটকে গেল মহেন্দ্রবাবুর পরের কথা শুনে।—রান্নাটান্না নিজেই করবেন তো?

তাড়াতাড়ি খানিকটা চা গিলে অমলেটটা গলা থেকে নামিয়ে আমতা আমতা করে বললাম—আজ্ঞে রান্না? মানে নিজে—

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন—হুঁ! বুঝেছি, রাঁধতে জানেন না। তাহলে একজন কনস্টেবলকে দিয়ে রাঁধাতে হবে, তাতে খরচ একটু বেশিই হবে—

বললাম—তা হোক। কত দিতে হবে?

অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন—কিছুই না, শুধু দু' বেলা খেতে দিতে হবে।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ঠিক হলো রমেশই আমার রান্নাটান্না সব করে দেবে।

বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে দেখে মহেন্দ্রবাবু বললেন—যান

আপনি কাপড় চোপড় ছেড়ে মুখ হাত ধুয়ে আসুন, রান্না হয়ে গিয়েছে।

উঠতে যাচ্ছিলাম। বললাম—একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো স্যার?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মহেন্দ্রবাবু আমার দিকে তাকালেন।

বললাম—পথে আসতে আসতে দেখলাম বাজারে সবগুলো ঘরই নতুন। তারপর জেলেপাড়ায়, সেখানেও ঐ। থানায় এসে দেখছি সবই নতুন তৈরি। এর মানে কি?

একটু বিস্মিত হয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন—এসব না জেনেই এসেছেন টেকনাফে চাকরি করতে?

এসব জানার সঙ্গে টেকনাফের চাকরির কি সম্পর্ক বুঝতে না পেরে চুপ করেই রইলাম।

এবারে জবাব দিলেন পাশের ভদ্রলোকটি,—মানে হচ্ছে, রাত্রে খাওয়া দাওয়া করে দিব্যি ঘুমিয়ে আছেন, সকালবেলায় দেখলেন আপনি মাঠে শুয়ে।

ঘর শুদ্ধ সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। রাগ হলো লোকটির উপর। আমার সঙ্গে এখনো আলাপ পর্যন্ত হয়নি অথচ এরকম অভদ্র রসিকতা করতে ওর এতোটুকু সঙ্কোচ হলো না!

বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেই ভদ্রলোক বললেন—ভাবছেন, অকারণ রসিকতা করছে এ অভদ্র লোকটি কে? আমিও আপনার মতো একজন এ.এস.আই., নাম যতীন দাস। আমিও প্রথমে এখানে বদলি হয়ে এসে আপনার মতোই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা হলো এই—বঙ্গোপসাগরের পাড়েই এ দ্বীপটি। মাঝে মাঝে একটা হাওয়া সমুদ্র থেকে উঠে হঠাৎ যদি এ দ্বীপটির উপর দিয়ে বয়ে যায়, তাহলে এর বাড়িঘরের আর চিহ্নই থাকে না। আজ দিন কুড়ি হলো এইরকম একটি ঝোড়ো হাওয়া এই দ্বীপের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে বলেই আবার সব নতুন করে গড়তে হয়েছে। এবার বুঝলেন?

বুঝলাম। কি অদ্ভুত জায়গায় এসেছি রে বাবা। আমাকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে মহেন্দ্রবাবু বললেন—আর মন খারাপ করে

কি হবে। যান হাতমুখ ধুয়ে আসুন, বেলা ছুটো বেজে গিয়েছে।

পরদিন সকালে চা খেতে খেতে রমেশের কাছে টেকনাফ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য অনেক কিছুই শুনলাম। বছরে মাত্র পাঁচ মাস চট্টগ্রাম থেকে এখানে স্টীমার চলাচল করে, তাও সপ্তাহে একদিন। বাকি সাত মাস বাইরের জগতের সঙ্গে এই ছোট্ট দ্বীপটির কোনও যোগাযোগ থাকে না। এর কারণ হচ্ছে শীতকাল থেকে কয়েক মাস সমুদ্র বেশ শান্ত থাকে। ঐ সময় স্টীমার নিরাপদে আসতে পারে। বাকি ছ' মাস সমুদ্র ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, স্টীমার চলাচল একেবারেই বন্ধ। আমি যে স্টীমারে এলাম তার এ সময়ে আসার কথা ছিলো না, শুধু শুঁটকি মাছের চালান নেবার জন্য হঠাৎ এসে গিয়েছে। এখান থেকে কলকাতায় চিঠি যেতে লাগে বারো চৌদ্দ দিন, টেলিগ্রাম যায় সাত দিনে। এ দ্বীপের বাসিন্দারা সবাই মগ, শুধু বাজারে কয়েকটি চট্টগ্রামের বাঙালী আছে, তারাও প্রায় মগ হয়ে উঠেছে। জিনিসপত্রের দাম এখানে অসম্ভব সস্তা। টাকায় আঠারোটা মুরগী, একটা পাঁঠার দাম ছ' আনা। এক আনার মাছ কিনলে থানা সুদ্ধ ভরপেট খাইয়েও কিছু ফেলা যায়। শুনে প্রথমটা আজগুবি মনে হয়েছিলো কিন্তু পরে দেখলাম, রমেশ এক বিন্দুও বাড়িয়ে বলেনি।

থানায় ঢুকে দেখি কেউ নেই, বড় টেবিলটার উপর কতকগুলো কাগজপত্তোর এলোমেলোভাবে পড়ে আছে। ওরই মধ্যে দেখলাম একখানা পনেরো দিন আগের দৈনিক বসুমতী, সেইটে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। একটু পরেই মহেন্দ্রবাবু এলেন। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ছিপ্‌ছিপে রোগা চেহারা, মুখে হিটলারী গোঁফ। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানাতেই প্রতিনমস্কার করেই বললেন—বসুন।

বললাম—আমায় আপনি তুমি বলেই ডাকবেন স্যার। বুঝলাম খুশি হয়েছেন।

সমবেদনার সুরে মহেন্দ্রবাবু বললেন—এতো জায়গা থাকতে তোমাকে এখানে বদলি করলো কেন বলতে পারো? তোমার মতো smart young ছেলের পক্ষে এখানে বেশিদিন থাকা সম্ভব নয়। কাল রাত থেকে শুধু এই কথাটাই ভাবছি।

কোতোয়ালির পার্টি থেকে শুরু করে আমার এখানে আসার ইতিহাস সব পর পর বলে গেলাম, শুধু বাদ দিলাম মিসেস মুলাণ্ডের প্রসঙ্গ। সব শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন মহেন্দ্রবাবু। তারপর গম্ভীরভাবে বললেন—হুঁ, বড় সাহেব আমাদের বদরাগী আর খামখেয়ালি শুনেছি। কিন্তু এতোখানি একগুঁয়ে তা তো জানা ছিলো না।

দু'জনেই চুপ করে রইলাম। কিছুক্ষণ বাদে আমি সেই থমথমে নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে বললাম—থানার কাজ তো কিছুই জানা নেই। যদি দয়া করে আমাকে একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নেন—

হো হো করে হেসে উঠলেন মহেন্দ্রবাবু। সে হাসি আর থামতেই চায় না। মনে মনে বিরক্ত হলাম। ভাবলাম, এর মধ্যে হাসির কথাটা কি হলো! একটু দম নিয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন—থানার কাজ শিখতে তুমি এসেছো টেকনাফ? আবার হাসি! এরই মধ্যে কখন যে যতীনবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন দেখিনি। তিনিও অবাক হয়ে মহেন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়ে আছেন।

—ব্যাপার কি স্যার? বললেন যতীনবাবু।

মহেন্দ্রবাবু সোজা হয়ে চেয়ারে বসে বললেন—শুনেছো যতীন, ধীরাজ থানার কাজ শিখতে টেকনাফ এসেছে।

ইচ্ছে হচ্ছিলো বলি—নয় তো কি ছুতোরের কাজ শিখতে? বললাম না, চুপ করেই রইলাম। ভাবলাম, এবার বোধ হয় হাসবার পালা যতীনের। যতীন কিন্তু হাসলো না; অনুকম্পা ভরা দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে শুধু বললো—বেচারা!

ক্ষেপে গেলাম। বললাম—এসব কি ব্যাপার, দয়া করে একটু খুলে বলবেন কি?

মহেন্দ্রবাবু বললেন—শোনো ধীরাজ, এখানে কাজকর্ম নেই বললেই হয়, আর কাজ থাকলেও আমরা তা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা

করি। ধরো, ছোটো খাটো চুরি, ডাকাতি, মারপিট, এসব কেস হাতে নিলে অনেক ফ্যাসাদ। কোর্ট হচ্ছে কক্সবাজারে। কাজেই মামলার দিন পড়লে চারদিন আগে হাঁটা পথে আসামী নিয়ে তোমাকে কক্সবাজার রওনা হতে হবে, কেননা, স্টীমার বন্ধ। অতি দুর্গম পথ, মাঝে তিন চারটে ছোট নদী, নৌকো করে পেরিয়ে দু' তিনটে থানায় অতিথি হয়ে চতুর্থ দিনে আধমরা হয়ে কোর্টে হাজির হলে। মামলার দিন পড়লো দশবারো দিন বাদে। সুতরাং আবার যাও, আবার ফিরে এসো, আবার দিন পড়লো এইভাবে মাস দুই হয়রানির পর তবে কেস্‌টার নিষ্পত্তি হলো। অবস্থাটা একবার ভেবে দেখো। তাই আমরা ঠিক করেছি, নেহাত খুন-খারাপি বা বড় কেস্ ছাড়া ডাইরিতে এন্ট্রিই করি না। একটা ভুঁয়ো কাগজে কেস্‌টা লিখে নিয়ে তারপর আপোসে মিটিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করি। তাতে আমাদেরও দু' পয়সা হয় আর অনর্থক হয়রানির হাত থেকেও বাঁচা যায়। কাজেই বুঝে দেখো, কাজ এখানে কী থাকতে পারে। বরং কাজকর্ম জানা কোনো লোক এখানে এলে কাজ ভুলে যায়। কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, খাও দাও ঘুমোও, ব্যস্।

অফিসার-ইন-চার্জ মহেন্দ্রবাবু দিব্যজ্ঞান দান করলেন। হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম।

যতীনবাবু বললেন—শোনো ভাই, বয়সে তুমি অনেক ছোট, কাজেই তুমি বললাম বলে রাগ করো না। এই দ্বীপের বেশির ভাগ অধিবাসী হলো মগ। লেখাপড়া কিছুই জানে না। তার উপর ভয়ানক গরীব। কাজেই আইন-কানুন আমরা যা তৈরি করে দিই তাই মানতে হয়। বই-এ পড়া আইন এখানে চলে না।

এর পরে দু'জনে মিলে প্রায় ঘণ্টাখানেক আমাকে তালিম দিলেন, যা পুলিস লাইন কেন কোনো লাইনেই জীবনে শুনতে পাবো ভাবিনি। হঠাৎ দেখি, মহেন্দ্রবাবু টেবিল থেকে একটা ডেলি রিপোর্টের খাতা টেনে নিয়ে মুখ নিচু করে পড়তে শুরু করে দিলেন। যতীনবাবুও একটা পুরানো খবরের কাগজ টেনে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলে। ব্যাপার কি? অবাক হয়ে চারিদিকে

চাইছি, এমন সময় দেখি সামনের বড় রাস্তা থেকে লুঙ্গি পরা একটি মগ থানার সরু রাস্তা দিয়ে আমাদের দিকেই আসছে। লোকটি একেবারে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো, তবুও মহেন্দ্রবাবু বা যতীনবাবু কেউই মুখ তুললেন না। মিনিট দুই এইভাবে কাটবার পর দেখি লোকটা ফতুয়ার পকেট থেকে দু' প্যাকেট কাঁচি সিগারেট বার করে টেবিলের ওপর রাখলো। সঙ্গে সঙ্গে শিবের ধ্যানভঙ্গ হলো। মহেন্দ্রবাবু মুখ তুলে চাইলেন, যতীনবাবুও কাগজখানা টেবিলের উপর রাখলেন, তারপর যা কথাবার্তা শুরু হলো তার এক বর্ণও বুঝলাম না। দুর্বোধ্য মগি ভাষায় কিছুক্ষণ কথাবার্তা হওয়ার পর লোকটি প্রথমে মহেন্দ্রবাবুকে, পরে যতীনবাবুকে ও শেষে আমাকে হাত তুলে নমস্কার বা সেলাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু হেসে মহেন্দ্রবাবু বললেন—দেখলে ধীরাজ, একটু চালে ভুল হলেই সিগারেট দু' প্যাকেট হাতছাড়া হয়ে যেতো।

অবাক হয়ে বললাম—কিছুই তো বুঝতে পারলাম না স্যার?

সিগারেটের বাক্স থেকে একটি সিগারেট বার করে সেটি ধরিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে দু' তিনটে সুখ-টান মেরে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করতে করতে মহেন্দ্রবাবু বললেন—ওরা জানে—মানে আমরাই ওদের এই ধারণাটা করিয়ে দিয়েছি যে, দারোগা সাহেব যখন কাজে ব্যস্ত থাকবেন তখন কথা বলা অন্যায়, তাতে ফল খারাপ হতে পারে। দ্বিতীয়ত, অন্ততঃ দু' প্যাকেট সিগারেট টেবিলে না রাখলে আমরা মুখ তুলে তাকাবো না, এটাও ওরা ভালো করেই জানে। সোজা এসেই যদি কথা বলবার সুযোগ পেতো তাহলে আর সিগারেট দু' প্যাকেট দিতো না।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম, আর অবাক হবো না। বললাম—কি বলতে এসেছিলো?

এক প্যাকেট সিগারেট পকেটে পুরতে পুরতে যতীনবাবু উত্তর দিলেন—ওর ভাগনে চুরির চার্জে কক্সবাজার লক-আপে আছে। কবে মামলার দিন, খালাস পাবে কিনা, এই সব জানতে এসেছিলো। তোমাকে নমস্কার করলো কেন জানো? মহেন্দ্রবাবু

বলে দিলেন, আমাদের আর একজন নতুন অফিসার এসেছেন, কিছু বেশি না দিলে তদ্বিরের অসুবিধে হবে।

বিকেলের দিকে কনস্টেবল হরকিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বার হলাম। থানা ছাড়িয়ে উত্তর দিকের পথ ধরে একটু এগোলেই বাজার। ওখানকার বাঙালী দোকানদারদের সঙ্গে আলাপ হলো, সবাই বললে আমার মতো ছেলেমানুষ অফিসার নাকি এর আগে আর টেকনাফ থানায় আসেনি। একটু বসে গল্পগুজব করে পান সিগারেট খেয়ে উঠতে যাচ্ছি, হঠাৎ নজরে পড়লো একটা পুরানো হারমোনিয়াম একপাশে অযত্নে পড়ে আছে। দোকানদারকে অনুরোধ করলাম যদি অসুবিধা না হয় ওটা আমার কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দিতে। দোকানি ধন্য হয়ে গেল। জানালে সন্ধ্যের পরই লোক দিয়ে ওটা সে আমার বাসায় পাঠিয়ে দেবে। চলতে শুরু করলাম। বাজার ছাড়িয়ে একটু দূরে দেখি একটা অদ্ভুত ঘর। আকারে গোল, মাটি থেকে সাড়ে ছ' ফুট উঁচু, তার উপর পুরু তক্তা। মাটি থেকে আট দশটা মোটা শাল গাছের খুঁটি উপরের তক্তা ভেদ করে আরও প্রায় আট দশ ফুট উপরে উঠে গিয়েছে। তার উপরে পুরু খড় দিয়ে ছাওয়া। এক পাশে কাঠের একটা সিঁড়ি রয়েছে মাটি থেকে ওই তক্তায় উঠবার জন্যে। বুঝলাম ঐ তক্তাটাই ঘরের মেজে। তক্তার চারধারে মোটা কাঠের গুঁড়ি লাগানো, সেই গুঁড়ির উপর মাথা দিয়ে নিশ্চিন্ত আরামে শুয়ে আছে বারো চৌদ্দটি যুবা মগের ছেলে। পরনে রঙিন লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া, মাথায় বিচিত্র বর্ণের কাপড়ের ফেটি বাঁধা, মুখে বর্মা চুরোট। অবাক হয়ে চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগলাম। দেখলাম কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ পাশের যুবকটির সঙ্গে গল্প করছে। সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম কেউ চোখ খুলে নেই, সবারই চোখ বন্ধ। এ যেন জ্যান্ত একটা গোলকধাঁধা! হরকির শরণাপন্ন হলাম।

হরকি বললে—এই ঘরটির নাম হলো ক্যাংঘর, এটা সাধারণের সম্পত্তি। এ দ্বীপে মদ আর তাড়ি একরকম বিনা পয়সায় পাওয়া

যায়। পাকা কলা পচিয়ে এরা ঘরেই মদ তৈরি করে, আর তাড়ি পয়সায় দু'তিন ভাঁড় পাওয়া যায়। ঐ মগ ছেলেগুলো সকাল থেকে মদ আর তাড়ি খেয়ে এই ক্যাংঘরে এসে বিশ্রাম করে। এদের আলোচনার মুখ্য বিষয় হলো পরনিন্দা আর স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার। মগদের মধ্যে ছেলেরা কোনো কাজই করে না, শুধু খেয়েদেয়ে, নেশা করে কাটিয়ে দেয়। যাবতীয় কাজ করতে হয় মেয়েদের। নদী থেকে মাছ ধরে সেই মাছ মাটিতে পুঁতে আর রোদে শুকিয়ে শুঁটকি তৈরি করা, হাটে বাজারে কেনা-বেচা করা, রান্না করা, অবসর সময়ে রেশমি লুঙ্গি বোনা, তামাক থেকে বর্মা চুরোট তৈরি করা এসব কাজ তো আছেই, তাছাড়া আবার সময় মতো পতিদেবতাকে ক্যাংঘর থেকে বাড়ি নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দাইয়ে শুইয়ে দেওয়াও আছে।

মগের মুলুক কথাটা এতোদিন কানেই শুনে এসেছিলাম আজ স্বচক্ষে দেখে জীবন ধন্য হলো।

মগদের জীবনযাত্রার এই বিচিত্র কথা শুনতে শুনতে এক পা দু' পা করে ঢুকে পড়লাম মগ পল্লীতে। পাতার ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট ঘর, ক্যাংঘরের মতো উঁচু মাচার উপর তক্তার মেজে। তফাত শুধু ক্যাংঘরের চারদিক খোলা, আর এগুলো চেরা বাঁশ আর নারকেল বা সুপারি পাতার মতো একরকম পাতা দিয়ে ঘেরা। এক-একটি পরিবার ছেলেপুলে নিয়ে ঐ ছোট্ট একখানি ঘরে দিব্যি বাস করে। ওরই মধ্যে রান্না, খাওয়া দাওয়া, হাত মুখ ধোওয়া সব চলে। তক্তার ফাঁক দিয়ে জল এঁটো ভাত তরকারি সব পড়ে মাচার নিচে। তক্তা মুছে নিয়ে তার উপর বিছানা পাতে, শোবার ঘর হয়ে যায়। দেখলাম মাচার নিচে নোংরা আবর্জনা, পচা ভাত আর জল পড়ে পড়ে নরককুণ্ড হয়ে গিয়েছে ; ভাপসা দুর্গন্ধে কাছে যেতেও ঘেন্না করে।

মগ পল্লীতে আর একটা জিনিস পেলাম, একটা বিকট উগ্র দুর্গন্ধ যাতে পেট ঘুলিয়ে ওঠে, শুনলাম ওটা শুঁটকি মাছের গন্ধ। চেয়ে দেখি প্রায় প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে দূরে দূরে দুটো বাঁশের খুঁটিতে দড়ি বাঁধা। আর তাতে ঝোলানো রয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় সমুদ্রের মাছ। হরকি বললে—বড় বড় মাছ সাধারণতঃ ওরা

মাটিতে পুঁতে রাখে, তারপর রোদে শুকোয়। এটা হলো শুঁটকি মাছের সীজন। এসময় দ্বীপে কোনো অসুখ বিসুখ বড় একটা হয় না, শুঁটকি মাছের গন্ধ নাকি খুব স্বাস্থ্যকর। ওখান থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। একটু এগিয়ে দেখি, সামনে একটা ছোট মাটির পাহাড়, নানা রকম গাছও আগাছায় ঢাকা। ওরই মধ্যে দিয়ে একটা সরু পথ এঁকে-বেঁকে পেঁচিয়ে উপরে উঠে গিয়েছে। হরকি বললে—ওপরে রয়েছে নানা কারুকার্য করা কাঠের একটি বৌদ্ধ মন্দির, মগেরা বলে জাদিমুরা।

স্থানমাহাত্ম্য কি না বলতে পারবো না মনটা যেন কেমন হয়ে গেল। শুঁটকির বিকট গন্ধ নেই, দুর্বোধ্য মগি ভাষার কিচির-মিচির নেই, কেমন একটা শান্ত সমাহিত মৌনতা ছোট্ট পাহাড়টার চারপাশে ঘিরে রয়েছে।

হরকি বললে—উপরে উঠবেন ?

বললাম—আজ থাক, সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। আর একদিন বেলাবেলি এসে দেখে যাবো।

থানায় ফিরতে রাত আটটা বাজলো।

রমেশ বললে—দু' তিনজন বাঙালী বাবু আপনাকে খুঁজছিলেন। ওরা থানা ঘরে বসে বড় সাহেবের সঙ্গে গল্প করছেন।

ব্যাপার কি ? এই সুদূর মগের মুল্লুকে আমার খোঁজে বাঙালী বাবু ? তাও একজন নয় দু'জন নয় একেবারে তিনজন !

থানায় ঢুকতেই মহেন্দ্রবাবু বললেন—এই যে, এসো ধীরাজ, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এঁরা চিটাগং হিল্‌স-এ থাকেন, নাম সুধীর দত্ত, অরুণ মুখার্জি আর ইনি নির্মল দাস।

চিটাগং হিল্‌স-এ মানুষের বসতি আছে জানা ছিলো না। তা ছাড়া এতো জায়গা থাকতে এরকম স্মার্ট যুবার দল চিটাগং হিল্‌স-এ কেন আত্মগোপন করে আছে বুঝলাম না। তবে কি এঁরা খুনে, পলাতক আসামী ? না স্বদেশী বিপ্লবী দলের কেউ ? তাই বা কি করে সম্ভব ! তাহলে বুক ফুলিয়ে এভাবে থানায় বসে গল্প করতে পারতো না। সন্দেহ, সংশয় ও কৌতূহল মনটাকে ঝাঁকানি দিচ্ছিলো, তবুও হাত তুলে প্রতিনমস্কার জানালাম।

মিঃ মুখার্জি আমার মুখের অবস্থা দেখে বোধ হয় মনের ভাবটাও আঁচ করে নিয়েছিলেন। বললেন—আচ্ছা মহেন্দ্রবাবু, আপনি একজন ঝানু পুলিস অফিসার হয়ে এরকম ঠিকে ভুল করে বসলেন কেন বলুন তো? শুনুন ধীরাজবাবু, আমাদের পরিচয় রহস্যটা আমিই ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। আমরা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করি, কাজেই বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে ছাড়া লোকালয়ে বাস ভাগ্যে ঘটে না। চিটাগং হিল্‌স-এর গভীর জঙ্গলে বড় বড় শাল সেগুন মেহগনি গাছ আছে। সেগুলো কেটে চালান করা, মাটি কেটে চলাচলের পথ তৈরি করা ইত্যাদি আরো অনেক রকম কাজ আমাদের করতে হয়। এ নির্জন পাহাড়ের গভীর জঙ্গলের মধ্যে কাঠের বাংলো, আর একটি আর্দালি নিয়েই থাকি। প্রতিবেশী হলো বাঘ, ভালুক, হাতি, সাপ। অবস্থাটা একবার ভাবুন তো?

বললাম—সত্যি। আপনাদের দেখে হিংসে হয় না এটা ঠিক, দুঃখই হয়। তবু ওরই মধ্যে সান্ত্বনা যে, আপনারা তিন বন্ধু এক সঙ্গে থাকেন।

কথা শেষ হবার আগেই তিনজনে হো হো করে হেসে উঠলেন। মিঃ দাস বললেন—হা অদৃষ্ট! তা হলে তো বর্তে যেতাম মশাই। আমার বাংলো থেকে মুখার্জির বাংলো সাত আট মাইল দূরে আর দত্ত থাকে আরো দূরে। আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হয় কচিৎ কখনো। তিন চার মাস অন্তর আমরা একবার করে কাজ উপলক্ষে বাইরে আসবার সুযোগ পাই দু'-একদিনের জন্যে। সেজন্যেই বেঁচে আছি, নইলে কবে পাগল হয়ে যেতাম।

মিঃ মুখার্জি বললেন—আর বাইরে এলেই আমরা টেকনাফ থানায় অতিথি হই। আজ এসে শুনলাম আপনার কথা। কলকাতা থেকে আসছেন শুনে আলাপের ইচ্ছেটা আরো প্রবল হয়ে উঠলো।

এই সব আলাপের মধ্যেই আমাদের পরিচয়টা আরো নিবিড় ও সহজ হয়ে গিয়েছিলো। তাই সঙ্কোচ কাটিয়ে বললাম—আমিও আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে পেয়ে বেঁচে গেলাম মশাই। শহরেই মানুষ, এরকম নির্জনতার সঙ্গে কোনো দিন পরিচয় ছিলো না। আজ আমাদের এই অপ্রত্যাশিত পরিচয়টাকে স্মরণীয় করে

রাখবার জন্য একটা ছোট্ট অনুরোধ করবো।—আজ রাতে আপনারা আমার অতিথি। উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে মহেন্দ্রবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম—আপনিও স্যার।

কারো সম্মতির অপেক্ষা না করেই ডাকলাম—রমেশ।

রমেশ এসে দাঁড়াতেই জজ সাহেবের ভঙ্গিতে যথাসাধ্য গম্ভীর হবার ভান করে অম্লান বদনে পাঁচটি নিরীহ মুরগীর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে বললাম—আজ রাত্রে এঁরা আমার অতিথি, সুতরাং ঘি-ভাত আর মুরগীর কারি।

খুশি মনে স্যালুট করে রমেশ চলে গেল। চেয়ারে বসে অতিথিদের দিকে তাকালাম। দেখলাম, আমার রায়ে জুরি অতিথিদের দ্বিমত বা আপত্তি তো নেই-ই বরং পূর্ণসম্মতিসূচক আনন্দে সবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সে রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে গল্প গুজব করতে রাত অনেক হয়ে গেল। পরদিন ঘুম থেকে উঠলাম বেলা আটটায়। আমার ফরেস্টার বন্ধুরা ঘুম থেকে উঠেই যাই যাই শুরু করে দিলো। অনেক বুঝিয়েও যখন কিছু হলো না, তখন অগত্যা চা টোস্ট অমলেট খাইয়ে বিদায় দিলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুঝলাম বিদেশে একদিনের আলাপে এমন গাঢ় বন্ধুত্ব হয়, যা শহরে দশ বছর পাশাপাশি থেকেও হয় না।

থানাঘরে ঢুকে দেখি, একটি মগ বসে রয়েছে। পরনে ময়লা ছেঁড়া লুঙ্গি, গায়েও ততোধিক ময়লা ফতুয়া। ধুলোমাখা খালি পা দুটো বেঞ্চির উপর তুলে নিশ্চিন্ত আরামে একটা আধপোড়া চুরোট টানছে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করে মগি ভাষায় কি সব অনর্গল বলে যেতে লাগলো, থামতেই চায় না। অতো কথার মধ্যে একটি কথা শুধু বার চারেক বললে—ফিং লু। মনে মনে প্রমাদ গণলাম, উঁকি দিয়ে দেখি, মহেন্দ্রবাবুর কোয়ার্টারের দরজা জানলা সব বন্ধ, যতীনবাবুও আগের দিন বিকেলে কি একটা কেস নিয়ে কক্সবাজার রওনা হয়ে গিয়েছেন। এখন উপায়? অসহায়ের মতো চারদিক চাইছি এমন সময় দেখি, উঠোনের পাতকুয়োর ধারে কনস্টেবল সতীশ ব্যানার্জি দাঁড়িয়ে আছে।

এখানে বলে রাখি, সমস্ত টেকনাফ দ্বীপের মধ্যে ঐ একটি পাতকুয়ো, থানা ও থানার কোয়ার্টারের মধ্যে। সতীশের সঙ্গে ভালো আলাপ ছিলো না, তবুও ইশারা করে ওকেই ডাকলাম। ঘটিটা রেখে গামছায় হাত মুছতে মুছতে সতীশ এসে নমস্কার করে দাঁড়াতেই বললাম—দেখো তো, আমি এর কথা এক বর্ণও বুঝতে পারছি না। কোনো কথা না বলে সতীশ মগটির দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে চেয়ে শুরু করলো—নামে জালে ?

মগ—আং চু।

সতীশ—আপ্পা নামে জালে ?

মগ—ওয়াং চু।

সতীশ—পাইছি রোয়াজা ?

মগ—ওছে রোয়াজা।

এইটুকু এগোনোর পরেই আগন্তুক মগি ভাষায় মেল ট্রেন চালিয়ে দিলে আর আমি হতভম্ব হয়ে একবার সতীশ একবার মগটির দিকে চাইতে লাগলাম। মিনিট তিনেক বাদে কথার তোড় থামলো। সতীশ একটু হেসে আমাকে বললে—ব্যাপারটা কি হয়েছে জানেন স্যার ? 'আং চু' মানে এই লোকটি একজন গরীব চাষী। সামান্য একফালি ধানের জমি চাষ করে আর মুরগী বিক্রি করে কোনো রকমে দিন চালায়। ওর প্রতিবেশী 'ফিং লু'র সঙ্গে ওর অনেক দিনের ঝগড়া। আজ সকালে বাজারে বিক্রি করবে বলে মুরগী নিতে গিয়ে দেখে, বড় বড় তিনটে মুরগী নেই। ওর দৃঢ় বিশ্বাস ফিং লু-ই ওর মুরগী চুরি করেছে অথবা খেয়ে ফেলেছে। ও কেস লেখাতে এসেছে।

চুপ করে আছি দেখে সতীশ টেবিলের বাঁ ধারের ডেস্কটা খুলতে বললে। ড্রয়ারটা টেনেই দেখি কেস-ডায়েরির মতো লম্বা দু'খানা খাতা রয়েছে। সতীশেরই নির্দেশে নিচের খাতাখানা টেনে বার করলাম। খাতা খুলে দেখি, কেস-ডায়েরির মতো দেখতে হলেও খাতাটা তা নয়, আজে বাজে কি সব লেখায় প্রথম দু' তিন পাতা ভর্তি।

একখানা সাদা পাতা বার করে সতীশ বললে—এইবার আমি যা যা বলে যাই, লিখে যান।

দোয়াত কলম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসলাম। সতীশ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে—নামে জালে ?

উত্তর এল—আং চু উ-উ-উ।

সতীশ—লিখুন, নাম হচ্ছে আং চু।

আপ্পা নামে জালে ?

উত্তর এল—ওয়াং চু উ-উ-উ-উ-উ।

লিখলাম বাপের নাম—ওয়াং চু।

তারপর আবার সতীশের প্রশ্ন—পাইছি রোয়াজা (কোন পাড়ায় বাড়ি) ?

উত্তর—ওছে রোয়াজা-আ-আ-আ-আ (জেলেপাড়ায় বাড়ি)।

তারপর লিখলাম প্রতিবেশী ফিং লু'র বিরুদ্ধে মুরগী চুরির অভিযোগ।

লেখা শেষ হলে সতীশ মগি ভাষায় বললে—দারোগাবাবু তোমার অভিযোগ কেস-ডায়েরিতে লিখে নিয়েছেন, আজ বিকেল চারটের সময় দারোগাবাবুকে নিয়ে আমি তোমার বাড়িতে এনকোয়ারিতে যাবো। বাড়ি থেকো।

খুশি মনে সেলাম করে আং চু চলে গেল।

বললাম—কিছুই তো বুঝলাম না সতীশ ?

একটু হেসে সতীশ বললে—না বুঝবার কি আছে স্যার ? এই সব আজে-বাজে ছুটকো কেস হাতে নিলে কি আর রক্ষে ছিলো ? আসামী নিয়ে কক্সবাজার ছুটতে ছুটতে জান হয়রান হয়ে যেতো।

মহেন্দ্রবাবুর সাবধানবাণী মনে পড়ে গেল। বললাম—বুঝলাম সতীশ, কিন্তু ও যে অভিযোগটা করে গেল, তার বিচারের কি হবে ?

একটু হেসে সতীশ জবাব দিলে—কিছু একটা হবেই। নতুন এয়েছেন কিনা, আজকেই দেখতে পাবেন।

এর পর সতীশের সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা হলো। মগের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার। জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা সতীশ, মগেরা শেষ কথাটা অতো টেনে বলে কেন বলতে পারো ? ব্যাটা নাম বললো—আং চু-উ-উ-উ-উ, সোজা আং চু বললেই তো ফুরিয়ে যায়।

সতীশ হেসে বললে—না, যায় না। মগদের একটি রীতি হচ্ছে মানী লোকের কাছে কথা বলতে গেলে শেষের অক্ষরটাকে টেনে বলতে হবে। নইলে শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রকাশ করা হয় না। ধরুন, আপনাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, মাং তামাসাং রেলা-আ-আ-আ ? (আপনি ভাত খেয়েছেন ?) উত্তরে আপনাকে বলতে হবে, রেলা-আ-আ-আ (খেয়েছি)।

দেখলাম, সব বিষয়ে সতীশ একেবারে চৌকশ। যতোই আলাপ করি ততই মুগ্ধ হই। এইখানে সতীশের একটু বিশদ পরিচয় দিয়ে রাখি। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, গায়ের রং বেশ ফর্সা। দাড়ি-গোঁফ কামানো, কর্মঠ দেহ, মুখের মাংস অকারণে কুঁকড়ে একটা বীভৎস ছাপ এনে দিয়েছে, দেখলে ভয় হয়। কোটরগত ছোট্ট চোখ দুটো সাপের চোখের মতো হিংস্র ও তীক্ষ্ণ, হাসলে আর দেখা যায় না। জিজ্ঞেস করলাম—কতো দিন পুলিসে আছো ?

বীভৎস মুখখানা হাসলে আরো ভয়ানক দেখায়।

সতীশ হেসে জবাব দিলে—তা বাইশ তেইশ বছর হলো স্যার।

বিস্মিত হয়ে বললাম—বলো কি ? এই তেইশ বছর তুমি কনস্টেবল হয়েই রইলে, প্রমোশন হয়নি কখনও ?

কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়েই সতীশ জবাব দিলে—না। মাঝে ক'বার প্রমোশনের কথা হয়েছিলো, কিন্তু আমি তদ্বির করে তা বন্ধ করে দিয়েছি।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হলো, অবাক হলাম। বললাম—বলো কি সতীশ, তদ্বির করে তুমি নিজের প্রমোশন বন্ধ করেছো ?

সতীশ—হ্যাঁ। কি জানেন স্যার ? লেখাপড়া কিছুই জানিনে। দারোগা হলে দায়িত্ব বাড়বে অনেক, অথচ ঐ বাঁধা মাইনের বেশি উপরি রোজগারগুলো সহজে হজম করতে পারবো না, ধরা পড়বোই। তখন দেবে আবার কনস্টেবল করে। তার চেয়ে বেশ আছি। দু'পয়সা হচ্ছেও বেশ আর ধরা পড়লেও বড় জোর ওয়ার্নিং নয় তো সার্ভিস বই-এ একটা ব্ল্যাক মার্ক, ব্যস। কনস্টেবলের নিচে তো আর কোনো পোস্ট নেই যে, নামিয়ে দেবে।

নিজের রসিকতায় সতীশ নিজেই হেসে উঠলো। সতীশের

হাসির একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম। এ হাসির কোনো আওয়াজ নেই, মুখের কুঞ্চিত মাংসপেশিগুলো আরো কুঞ্চিত হয়ে থর-থর করে কাঁপতে থাকে আর ধবধবে তু'পাটি দাঁতের মধ্যে জিভটা কাটা পাঁঠার মতো ছটফট করে মরে! এ যে কী হাসি না দেখলে বোঝানো অসম্ভব। আরো কিছুক্ষণ আলাপ করে সতীশের পারিবারিক পরিচয় যা পেলাম, তাতে আরো মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ঘুষের পর ঘুষ খেয়ে এবং ধরা পড়ে সতীশের সার্ভিস বুক কালো দাগে ভর্তি হয়ে গেলেও আমাদের আশীর্বাদে সতীশ চট্টগ্রাম শহরের উপর তু'খানা বাড়ি করেছে। একখানা ভাড়া দিয়েছে, অন্যটিতে চারটি ছেলে তিনটি মেয়ে নিয়ে সতীশের পরিবার বাস করে। বড় ছেলেটিকে সতীশ পুলিসে ঢুকিয়েছে। 'এল. সি.' অর্থাৎ লিটারেট কনস্টেবল হয়ে সে ঢাকায় আছে। অন্য ছেলেরা স্কুলে পড়ে, মেয়ে তিনটিরও বেশ ভালো বিয়ে দিয়েছে। কোনো রকমে মা কালীর দয়ায় আরো তুটো বছর কাটিয়ে দিতে পারলেই সতীশ পেনশন নিয়ে বাড়ি বসে একটা দোকান টোকান করে বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দেবে।—এই ইচ্ছা।

ভাবলাম, শুধু টেকনাফ দ্বীপে নয়, সমগ্র পুলিস ডিপার্টমেণ্টে সতীশ একটি স্মরণীয় চরিত্র। চিরদিন মনে রাখবার মতো। রেখেছিও।

বিকেল আন্দাজ চারটে সতীশকে সঙ্গে নিয়ে বেরোলাম মুরগী চুরির এনকোয়ারিতে। থানায় ঢুকে দেখি, মহেন্দ্রবাবু নেই।

সতীশ বললে—কাল রাতে যা মুরগী খাইয়েছেন, এ বয়সে তা হজম করতে মহেন্দ্রবাবুর অন্ততঃ তু'দিন লাগবে।

বললাম—কিন্তু সতীশ, ওঁকে না জানিয়ে আমাদের যাওয়াটা ঠিক হবে কি?

সতীশ—কেন মিছিমিছি ভাবছেন বাবু। আমি যখন সঙ্গে আছি, তখন ভাববার কিছুই নেই। আপনি জানেন না, তেমন শক্ত কেস এলে মহেন্দ্রবাবু আমার পরামর্শ না নিয়ে এক পাও এগোন না। তা ছাড়া তুপুরে মহেন্দ্রবাবুর বাসায় গিয়ে দেখা করে সব বলে এসেছি। চলুন বেরিয়ে পড়ি।

থানা থেকে বেরিয়ে তিন চারটে বাঁশঝাড় পেরিয়ে জেলেপাড়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। দেখলাম, দ্বীপের এ অংশটায় প্রচুর বাঁশ গাছ—যেদিকে ফিরাই আঁখি, বাঁশ আর বাঁশ দেখি। স্রষ্টার রসিকতায় মনে মনে হাসলাম। ভাবলাম, লোকাভাব বলেই এখানে বাঁশের প্রাচুর্য। অথচ যেখানে—

চিন্তায় বাঁধা পড়লো সতীশের কথায় : বললে—এসে গিয়েছি স্যার, এই হলো আং চু-র বাড়ি। দেখলাম জোর করেও এটাকে বাড়ি বলা চলে না, ঝুপড়ি বললেই ঠিক হয়! মাটি থেকে হাত চারেক উঁচু, গোলপাতা দিয়ে ছাওয়া, চার পাশে মাটির দেওয়াল। সামনে ছোট একটা গর্ত, সেই গর্তের মধ্যে দিয়েই যাওয়া আসা করতে হয়। এর মধ্যে যে মানুষ বাস করে তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ছোট্ট ময়লা উঠোনের দু'পাশে এই রকম দুটি ঝুপড়ি ঘর। চার পাঁচটা নোংরা উলঙ্গ ছেলেমেয়ে ধুলো-কাদা মেখে কতকগুলো মুরগীর বাচ্চাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে, না খেলা করছে বুঝলাম না। সতীশ উঠোনে দাঁড়িয়ে আং চু-র নাম করে ডাক দিতেই ঝুপড়ির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল আং চু। আমাদের সেলাম জানিয়েই তাড়াতাড়ি অপর ঝুপড়িটার ভিতর ঢুকলো। একটু পরে নড়বড়ে বেতের একটা আধভাঙা মোড়া এনে উঠোনের মাঝখানে রাখলো। সতীশ আমায় ইশারা করে বসতে বললে, আমি বসলাম। আং চু সতীশের সঙ্গে মগী ভাষায় আস্তে আস্তে দু'-একটা কথা বলে গুঁড়ি মেরে আবার ঝুপড়ির ভিতর ঢুকলো। দেখলাম, মগী ছেলেমেয়েগুলো খেলা থামিয়ে অবাক হয়ে একদৃষ্টে আমাদের দেখছে। একটু পরে ময়লা একখানা রেকাবিতে গোটা চারেক আস্তো পান, তার উপর এক দলা চুন ও একটা প্রকাণ্ড সুপারি এনে আমার সামনে মাটিতে রেখে হাতজোড় করে সোজা হয়ে দাঁড়ালো আং চু। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সতীশের দিকে চাইলাম। সতীশ বললে—ওটা হলো আপনার সম্মানী। বাড়িতে কোনো মানী অতিথি এলে বাটায় করে পান দেওয়াই হচ্ছে মগেদের রীতি। বাটা থেকে একটা পান তুলে নিয়ে তাতে খানিকটা চুন লাগিয়ে সুপারিটা তার মধ্যে দিয়ে তালগোল পাকিয়ে গালে ফেলে দিন।

ফরিয়াদী আং চু আর আসামী ফিং লুকে নিয়ে যখন থানার দিকে পা বাড়ালাম তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

থানায় ঢুকে দেখি, চেয়ারে বসে সামনের টেবিলটার উপর পা তুলে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত আরামে সিগারেট টানছেন মহেন্দ্রবাবু। টেবিলে দেখলাম দু' প্যাকেট কাঁচি সিগারেট পড়ে আছে। বুঝলাম, একটু আগে নিশ্চয়ই কোনো মক্কেল এসেছিলো। আমাদের দেখে পা নামিয়ে সোজা হয়ে বসলেন মহেন্দ্রবাবু। সব শুনে আং চু আর ফিং লুকে মগী ভাষায় জেরা শুরু করে দিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা বিচার চলবার পর সতীশ ফিং লুকে থানার বাইরে ডেকে নিয়ে গেল।

আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মহেন্দ্রবাবু—বুঝছো কিছু?

মাথা নাড়লাম।

একটু হেসে মহেন্দ্রবাবু বললেন—পারবে, একটু পরে।

একটু পরেই সতীশ ফিং লুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। তারপর মহেন্দ্রবাবুর কাছে এসে চাপা গলায় বললে—ও রাজী হয়েছে স্যার। আপনি কেসটা তুলে নিন।

দেখলাম, আং চু আর ফিং লু চাপা গলায় নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে। মহেন্দ্রবাবু আং চুকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন সে রাজী আছে কি না। একটু ইতস্তত করে সতীশের দিকে চেয়ে নিয়ে সে জানালে—হ্যাঁ রাজী।

মহেন্দ্রবাবু ড্রয়ার খুলে false diary-র খাতাখানা বার করলেন। সকালে মুরগী চুরির যে কেসটা আমি লিখে নিয়েছিলাম, সেইখানটা খুলে একবার পড়লেন, তারপর আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে কলম দিয়ে সমস্ত পাতাটায় একটা চিকে কেটে দিলেন।

আং চু আর ফিং লু-র দিকে চেয়ে মগী ভাষায় সতীশ বললে—দেখলে তো? বাবু আমাদের দেবতা। তোমাদের ভাগ্যি ভালো যে বাবু থানায় ছিলেন, তাই কেসটা আপোসে মিটে গেল, নইলে ছোট-বাবু তো তোমাদের নির্ঘাৎ কক্সবাজার চালান দিতেন। অম্লানবদনে এই কথা বলে সতীশ আঙুল দিয়ে আমায় দেখিয়ে দিলে।

হাসবো না কাঁদবো ভাবছি। দেখি, মহেন্দ্রবাবু আর সতীশের

উপর কৃতজ্ঞতায় আং চু আর ফিং লু-র চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছে। তারপর ছেঁড়া ফতুয়ার পকেট থেকে দু'জনে তিনটে করে রূপোর টাকা বার করে মহেন্দ্রবাবুর সামনে টেবিলের উপর রেখে আভূমি নত হয়ে সেলাম করে খুশি মনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সতীশের কাছে ব্যাপারটা যা শুনলাম তা হলো এই—আং চুকে সতীশ বুঝিয়েছে, কোর্টে গেলে অনেক হাঙ্গামা। উকিলের ফি, পথ-খরচ, হয়রানি তো আছেই, তারপর প্রমাণাভাবে আসামী শেষ পর্যন্ত হয়তো খালাস পেয়ে গেল। কেননা, নিজের চোখে সে তো আর ফিং লুকে মুরগী চুরি করতে দেখেনি। আর ফিং লুকে বোঝালে কোর্ট খরচা, হয়রানি তার উপর শেষ পর্যন্ত জেল না হলেও মোটা ফাইন হবেই। তার চেয়ে দু'জনে কিছু কিছু নজর বড়বাবুকে দিয়ে কেসটা আপোসে মিটিয়ে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। কাজির বিচার হয়ে গেল।

টাকা ছ'টি পকেটে পুরতে পুরতে হেসে মহেন্দ্রবাবু বললেন—তোমার হাতে আজ প্রথম বউনিটা বেশ ভালোই বলতে হবে, কি বলো ধীরাজ।

কোনো জবাব না দিয়ে পকেট থেকে চারটে টাকা বের করে মহেন্দ্রবাবুর সামনে রাখলাম।

প্রথমটা একটু অবাক হয়ে পরক্ষণেই টাকা চারটে পকেটে রেখে বললেন—ওঃ, ভুলে গিয়েছিলাম এটা তোমার নজর। তা নজরে নাকাল হয়ে হয়ে আমরা বেশ আরামেই টেকনাফে আছি কি বলো? নিজের রসিকতায় উচ্চকণ্ঠে হো হো করে হেসে উঠলেন মহেন্দ্রবাবু।

কেন জানিনে হাসি পেলো না আমার। থানা ঘরের মিটমিটে হ্যারিকেনের আলোতে দেখি, নিঃশব্দ হাসিতে সতীশের বীভৎস ক্রুর মুখখানা আরো ভয়ানক দেখাচ্ছে।

পরদিন সকালে একাধিক নারীকণ্ঠের অস্পষ্ট মৃদু গুঞ্জনে ঘুম ভাঙলো। প্রথমে মনে হলো, জনবহুল কোনো শহরের একটি বিয়ে

বাড়িতে শুয়ে আছি। চোখ পড়লো ঘরের চেরা বাঁশের বেড়ার দিকে আর কানে ভেসে এল বে অব বেঙ্গলের চাপা হুঙ্কার। রূঢ় বাস্তবে ফিরে আসতে দেরি হলো না। এক লাফে বিছানা ছেড়ে উঠেই দরজা খুলে থানার দিকের ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম, পঞ্চাশ-ষাটটি মগী যুবতী রঙ্‌ বেরঙের লুঙ্গি আর ফতুয়া পরে পাতকুয়োর চারধারে জড়ো হয়ে হাসি গল্পে থানা প্রাঙ্গণ মুখরিত করে তুলেছে। বেশির ভাগই গরীব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, পোশাক দেখে অন্ততঃ তাই মনে হলো। সুঠাম সুন্দর দেহ, গায়ের রং ফর্সা, গোলাকৃতি মুখ, চাপা নাক আর ছোট্ট চোখ। অনেকটা বর্মী ধরনের মঙ্গোলিয়ান চেহারা। শুধু অবাক হয়ে চেয়ে দেখবার জিনিস হচ্ছে ওদের খোঁপা। এ রকম সুন্দর খোঁপা এর আগে কোথাও দেখিনি। দেখলাম, প্রত্যেকের হাতে বা কাঁখে রয়েছে একটা মাটির কলসী ; দু'-একটা পিতলের কলসীও দেখলাম। আমায় দেখে ওদের মধ্যে একটা চাপা হাসির ঢেউ খেলে গেল তাও বেশ বুঝতে পারলাম। আমার তখন ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা ; হঠাৎ নজরে পড়লো বৃন্দাবনে অসংখ্য গোপিনী পরিবেষ্টিত লীলাময় শ্রীকৃষ্ণের মতো ওদের মধ্যে বসে কনস্টেবল হরকি বড়ুয়া দিব্যি আসর জমিয়ে তুলেছে। বেশ খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে একটু উঁচু গলায় ডাকলাম—হরকি।

হরকি আমাকে দেখতে পায়নি। হাসির গুঞ্জন হঠাৎ থেমে যেতেই ও উঠে দাঁড়িয়ে মেয়েদের দৃষ্টি অনুসরণ করে আমাকে দেখে লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল। একটি মেয়ে চুপি চুপি কি বলতেই হরকি এক পা দু' পা করে আমার কাছে এসে স্যালুট করে দাঁড়ালো। ততোক্ষণে পাতকুয়ো থেকে জল তোলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, মেয়ের দল কৌতূহলী চোখ মেলে এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। খানিকক্ষণ এইভাবেই কাটলো, চমক ভাঙলো হরকির কথায়। বললে—আমায় কিছু বলবেন হুজুর ?

লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললাম—হ্যাঁ, ঘর থেকে চেয়ারটা এনে দাও আর আমার স্যুটকেসের উপর থেকে খবরের কাগজটাও আনো।

চেয়ারে বসে প্রায় মাসখানেকের পুরানো খবরের কাগজটার

উপর মিথ্যে চোখ বুলিয়ে আড়চোখে চেয়ে দেখি হরকি দাওয়ায় মাটিতে বসে একটা বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে মেয়েগুলোর দিকে চেয়ে দিব্যি মুচকি হাসছে।

রাগে গা জ্বলে যাচ্ছে অথচ কিছু বলতে পারছি না। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটলো। ভাবলাম, এভাবে চুপচাপ বসে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না। কাগজটা সরিয়ে রেখে হরকিকে বললাম—ওরা এখানে জল নিতে আসে কেন?

হরকি উত্তর দেয়—আর কোথায় যাবে হুজুর? সমস্ত দ্বীপটায় এই একটিমাত্র পাতকুয়ো।

বললাম—না, না, মানে—ওদের বাড়ির ব্যাটাছেলেরাও তো আসতে পারে।

একটু হেসে হরকি বললে—আপনাকে তো আগেই বলেছি হুজুর, এখানে পরিশ্রমের কাজ সব করে মেয়েরা। ধরুন, যদি কোনও মেয়ে তার স্বামীকে এক কলসী জল এনে দিতে বলে তাহলে স্বামী তখনই দেড় হাত লম্বা দাও দিয়ে তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

টুকরো টুকরো করে কাটা হতভাগিনী স্ত্রীর উদ্দেশে একটা সমবেদনার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। চুপ করেই থাকি। পাতকুয়োর দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখি, পাঁচ ছ'টি মেয়ে জল নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রথমেই নজরে পড়লো তাদের অদ্ভুত মনোরম খোঁপা। ওদের মধ্যে চারটি মেয়ের খোঁপা ফুল দিয়ে সাজানো, আর দুটির খোঁপা খালি, ফুল নেই। জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা হরকি, এর মানে কি! এদের কারো কারো খোঁপায় নানা রঙ-এর ফুল গোঁজা রয়েছে, আবার অনেকের নেই।

হরকি বললে—যাদের খোঁপায় ফুল নেই দেখছেন তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তারা সধবা। আর যাদের ফুল রয়েছে তারা হয় কুমারী নয় বিধবা।

অবাক হয়ে বললাম—বিধবা?

হরকি—হ্যাঁ হুজুর, এখানে বিধবা মানে যার স্বামী সব সম্বন্ধ চুকিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে অথবা মরে গিয়েছে। সে অনায়াসে আবার বিয়ে করতে পারে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পাতকুয়োর ধারে একটি মেয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে হরকি বললে—ঐ চেয়ে দেখুন হুজুর, কনস্টেবল যোগীন দাসের বউ। ঐ যে, এখন যে-মেয়েটি বালতি করে কুয়ো থেকে জল তুলছে।

দেখলাম বছর পঁচিশ ছাব্বিশ বয়সের একটি মেয়ে, রঙ খুব ফর্সা না হলেও মুখশ্রী সুন্দর। গাত্রাভরণ দেখে মনে হলো খুব গরীব। সঙ্গে দুটি ছোট ছেলে মেয়ে।

আমি তাকিয়েই আছি। হরকি বলে চললো—যোগীন এখানে পাঁচ বছর ছিলো হুজুর। মেয়েটির সঙ্গে ঐ যে ছেলে মেয়ে দুটি দেখছেন, ও যোগীনের।

বললাম—কিন্তু কোতোয়ালিতে যে যোগীন দাস রয়েছে তার তো বউ ছেলে মেয়ে তার সঙ্গেই আছে।

এবার অবাক হলো হরকি। হাঁ করে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে—নাঃ, আপনি দেখছি নেহাতই ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝেন না। বউ ছেলে মেয়ে রয়েছে তো কি হয়েছে, এখানে তো আর তাদের আনতে পারেনি। কোনো অফিসারই এখানে ফ্যামিলি নিয়ে আসেন না। হঠাৎ কখন ঝড় উঠবে তার ঠিক কি! কাজেই বেচারা যোগীন পাঁচ বছর এখানে কাটায় কি করে। তাই বিয়ে করে ফেললে।

জিজ্ঞাসা করলাম—এখান থেকে যাবার সময় বিয়েটা ভাঙলো কি করে?

হরকি—খুব সোজা! বউকে শুধু ডেকে বললে, দ্যাখো, আমি বদলি হয়ে কোতোয়ালিতে যাচ্ছি। শীগগির যে এখানে ফিরে আসবো তার কোনও সম্ভাবনা নেই। কাজেই আজ থেকে তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্বন্ধ রইলো না, তুমি আবার বিয়ে করতে পারো। যাঁহা বলা অমনি যোগীনের বউ খোঁপায় ফুল গুঁজে কুমারী হয়ে গেল। তবে একটু মুশকিল হয়েছে ঐ বাচ্চা দুটোকে নিয়ে। নইলে এতো দিনে ওর আবার বিয়ে হয়ে যেতো। মেয়েটা বড় ভালো, খুব খাটতে পারে—

হঠাৎ চুপ করে গেল হরকি। তারপর গলা নামিয়ে চুপি চুপি বললে—চেয়ে দেখুন হুজুর বিশ্বেশ্বরের কাণ্ডটা।

বিশ্বেশ্বর টেকনাফ থানারই আর একটি হিন্দুস্থানী কনস্টেবল। লম্বা চওড়া নাদুসনুদুস চেহারা, প্রচুর ঘি-দুধ খেয়ে ভুঁড়িটা প্রকাণ্ড জালার মতো করে তুলেছে। চওড়া মুখে মোষের শিং-এর মতো দুটো গোঁফ, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, তার মাঝে শাল গাছের মতো দীর্ঘ এক টিকি, তাতে আবার ফুল বাঁধা। বিশ্বেশ্বরের কপালে বাহুতে ভুঁড়িতে চন্দনের ফোঁটা, বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেলেও কম মনে হয়। রাশভারি লোক, কম কথা বলে। থানার কাজকর্ম বিশেষ থাকে না বলে বেশির ভাগ সময় পুজো আর্চা নিয়েই কাটায়। চেয়ে দেখি, উঠোনের দক্ষিণদিকে নিজের ঘরের দরজায় বসে সর্বাঙ্গে ফোঁটা কেটে কনস্টেবল বিশ্বেশ্বর পাঁড়ে পুজো করতে করতে লোলুপ দৃষ্টিতে যোগীন দাসের কুমারী স্ত্রীর দিকে বারবার চাইছে।

হরকি বললে—ব্যাটা ভণ্ড! জানেন বাবু, অনেকদিন ধরেই ঐ মেয়েটার উপর নজর, ছুঁক ছুঁক করে বেড়ায়। কেবল আমাদের ঠাট্টার ভয়ে কিছু করে উঠতে পারে না।

বিশ্বেশ্বর পাঁড়ের চরিত্র সম্বন্ধে আরো অনেক কিছুই হয় তো শুনতে পেতাম, কিন্তু থানার দিকে চেয়ে দেখি একটি বারো তেরো বছরের ছেলেকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে একটি আধাবয়সী মুসলমান পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক বুক-ফাটা কান্নায় আকাশ বাতাস ভরিয়ে থানা ঘরে ঢুকলো। আমি আর হরকি তাড়াতাড়ি থানার দিকে পা বাড়ালাম। ততোক্ষণে পাতকুয়োর ধারের ভিড় অনেক কমে গিয়েছে, চার পাঁচটি মেয়ে জল তোলা বন্ধ করে থানা ঘরের দিকে কৌতূহলী চোখ মেলে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরে ঢুকে দেখলাম, মহেন্দ্রবাবু চেয়ারে বসে আছেন আর তাঁর পাশেই সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে কনস্টেবল সতীশ ব্যানার্জি। ঘরের মেঝেতে পড়ে আছে সেই ফুটফুটে কিশোর ছেলেটি আর তার বুকের উপর হুমড়ি খেয়ে বুক-ফাটা কান্না কাঁদছে সেই মুসলমান দম্পতি। ছেলেটির দিকে ভালো করে চাইলাম। ধবধবে সুন্দর স্বাস্থ্যবান চেহারা। মাথায় এক রাশ কোঁকড়া ঈষৎ সোনালী চুল, এক গুচ্ছ কপালে এসে পড়েছে। এক কথায় এরকম সুন্দর ছেলে কদাচিৎ নজরে পড়ে, দেখলেই

ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। মনে হলো, ছেলেটি নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার হতভম্ব ভাব দেখে সতীশ ইশারায় আমাকে থানা ঘরের শেষপ্রান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে—ছেলেটির বাপ মা আজ এক বছর হলো নাফ নদীর ঝড়ে নৌকা ডুবে মারা গিয়েছে। আপনার বলতে ঐ খুড়ো আর খুড়ী ছাড়া আর কেউ নেই, ওদেরও কোনো ছেলেপিলে নেই। আজ সকালে পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে উঁচু ডাল ভেঙে মাটিতে পড়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে মারা যায়।

দেখি খুড়ো খুড়ীর কান্নার বেগ কিছুটা কমে এসেছে। মহেন্দ্রবাবু জেরা শুরু করলেন মগী ভাষায়। বুঝলাম, জাতে মুসলমান হলেও এই মগের মুলুকে থেকে ওরাও প্রায় মগ হয়ে গিয়েছে। দু' চারটে কথা জিজ্ঞাসা করে মহেন্দ্রবাবু হরকিকে বললেন—যাও তো, জামাল মিঞার বাড়িতে যে গাছ থেকে ছেলেটা পড়ে গিয়েছে, তার তলায় কিছু দেখতে পাও কিনা।

হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়তেই বললেন—তুমিও সঙ্গে যাও ধীরাজ। শুধু দেখে আসবে এরা যা বলছে সত্যিই তাই কিনা। উঁচু গাছ থেকে পড়লে নিচে মাটিতে নিশ্চয়ই কোনো দাগ দেখতে পাবে।

হরকিকে সঙ্গে নিয়ে তখনি বেড়িয়ে পড়লাম। আমাদের সঙ্গে জামাল মিঞা যেতে চেয়েছিলো, কিন্তু মহেন্দ্রবাবু নিষেধ করলেন।

পথে নেমে হরকিকে বললাম—পুলিস লাইনটাই এই! সবতাতেই মানুষকে সন্দেহ করে বসে আছে।

হরকি বললে—আপনার কি বিশ্বাস ও গাছ থেকেই পড়ে মারা গিয়েছে?

বললাম—নিশ্চয়ই! অন্য কিছু হলে গায়ে আঘাতের চিহ্ন থাকতো। তাছাড়া ওকে মেরে কার কি লাভ বলতে পারো?

হরকি বললে—ওর বাপ বেশ কিছু টাকা-কড়ি রেখে গিয়েছে শুনেছি।

এবার রেগে গেলাম। বললাম—তুমি বলতে চাও টাকার লোভে খুড়ো খুড়ী ওকে মেরে ফেলেছে? কিন্তু তাতে ওদের লাভ?

ওদেরও তো কোনো ছেলেপিলে নেই, তাছাড়া ওদের কান্না দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়, কতো বড় আঘাত ওরা পেয়েছে!

এবার হরকি আর কোনো জবাব দিলো না। বাকি পথটুকু চুপচাপ কাটিয়ে মুসলমান পাড়ায় ঢুকলাম। দ্বীপের দক্ষিণদিকে মুসলমান পাড়া। জামালের বাড়ি হরকি চিনতো। ঢুকে দেখি, উঠোনে অনেকগুলো প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষ জটলা করছে। আমাদের দেখে সব চুপ হয়ে গেল। দেখলাম, জামাল বেশ অবস্থাপন্ন মুসলমান। উঠোনে ত্নটো ধানের গোলা, গোয়ালে চার পাঁচটি চাষের গরু। তাছাড়া অনেকগুলো ছাগল মুরগীও রয়েছে। উঠোনের চারিদিকে বেশ বড় বড় চারখানা ঘর। হরকি একজন প্রতিবেশীকে পেয়ারা গাছের কথা জিজ্ঞাসা করতেই সে হাত দিয়ে পুবদিকের ঘরের পিছনটা দেখিয়ে দিলে। গিয়ে দেখি, শুধু পেয়ারা নয়, নানারকমের গাছপালায় ছোট্ট বাগানটা ঠাসা। এমন কি দিনের আলোও সেখানে ভালো করে ঢুকতে পায় না, মাটি স্যাঁতসেঁতে নরম। পেয়ারা গাছের তলায় গিয়ে উপরের দিকে তাকালাম। অনেক উঁচুতে একটা পলকা সরু ডাল ভেঙে ত্নমড়ে আছে। দৃষ্টি নামিয়ে ঠিক তার নিচে দেখি নরম মাটিতে উঁচু থেকে পড়া একটা মানুষের দেহের ছাপ বেশ পরিষ্কার আঁকা রয়েছে। দেখলাম, যেখানে ছেলেটি গাছ থেকে পড়েছে সে জায়গায় নরম মাটি ত্ন' তিন ইঞ্চি গভীর হয়ে গিয়েছে। হরকির দিকে তাকালাম।

আমার মুখের দিকে না তাকিয়েই হরকি বললে—আপনার কথাই ঠিক বাবু! চলুন ফেরা যাক।

থানায় ঢুকে দেখি মহেন্দ্রবাবু নেই, প্রাতঃকৃত্য সারতে বাড়ি গিয়েছেন। মেজেয় একখানা কাঁথার উপর ছেলেটি শুয়ে আছে—আর জামাল-দম্পতি হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। শুধু সতীশ একটা চেয়ারে উবু হয়ে বসে বাজপাখির মতো মরা ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আছে। হরকি মহেন্দ্রবাবুকে খবর দিতে চলে গেল। সতীশের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম, ওর খেয়ালই নেই। ঠায় বসেই আছে। ডাকলাম—সতীশ!

ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো সতীশ। একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললে—আমি জানতেই পারিনি বাবু।

মহেন্দ্রবাবু ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে হরকি। বুঝলাম সব শুনেছেন। ড্রয়ার থেকে কেস ডাইরীটা বার করে আমার দিকে চেয়ে বললেন—জানাই ছিলো, তবুও তোমায় পাঠালাম যাতে আর সন্দেহের কোনোও অবকাশ না থাকে। আনন্যাচরল ডেথ কেস (অপমৃত্যু) বলে রিপোর্টটা আমি লিখে ফেলছি। ইনভেস্টিগেটিং অফিসার হিসেবে তুমি এতে একটা সই করে দাও।

মহেন্দ্রবাবু লিখতে যাবেন এমন সময় পিছন থেকে সতীশ বললে—দাঁড়ান।

বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখি মহেন্দ্রবাবুর চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ভাবলেশশূন্য মুখে সতীশ। বিরক্ত হয়ে মহেন্দ্রবাবু তাকাতেই সতীশ ঝুঁকে পড়ে মহেন্দ্রবাবুর কানে কানে কি বললে শুনতে পেলাম না।

মহেন্দ্রবাবু অবাক হয়ে বললেন—বলো কি? না, না, এ কখনই হতে পারে না।

সতীশ—আমার অনুমান কখনো মিথ্যে হয়েছে বড়বাবু?

মহেন্দ্রবাবু তবুও সংশয়ভরে মাথা নাড়ছেন দেখে সতীশ বললে—আমায় মিনিট পনেরো সময় দিন স্যার, তারপর আপনার যা খুশি করবেন।

কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছিলাম না। মহেন্দ্রবাবুর টেবিলে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি স্যার?

ফিস ফিস করে মহেন্দ্রবাবু বললেন—সতীশ বলছে গাছ থেকে পড়ে ছেলেটি মারা যায়নি, ওকে খুন করা হয়েছে।

তড়াং করে লাফিয়ে উঠলাম। কিছু বলবার আগেই সতীশ ইশারা করে কিছু বলতে বারণ করে দিলে, তারপর নির্লিপ্ত মুখখানা আমার কানের কাছে এনে আস্তে আস্তে বললে—ছেলেটার গলার নিচে কণ্ঠনালীর দু' পাশে দুটো অস্পষ্ট আঙুলের ছাপ রয়েছে দেখেছেন?

হাঁ করে একবার সতীশের দিকে একবার মরা ছেলেটির দিকে তাকাচ্ছি।

সতীশ বললে—পনেরো মিনিট বাদেই সব বুঝতে পারবেন।

জামাল-দম্পতির দিকে তাকিয়ে দেখি ওরা এরই মধ্যে কখন

উঠে দাঁড়িয়েছে, আতঙ্কে ও ভয়ে মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

সতীশ বললে—তাহলে হুকুম করুন স্যার, ব্যাটাকে ঠাণ্ডা ঘরে নিয়ে যাই।

একটু ইতস্তত করে মহেন্দ্রবাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলেন, হরকিকে ডেকে জামালের স্ত্রীকে বাইরে নিয়ে যেতে বললেন। আর্তনাদ করে জামালের স্ত্রী মহেন্দ্রবাবুর পায়ের উপর পড়লো। সে কী কান্না! কিন্তু কোনো ফল হলো না। নিষ্ঠুর হাতে হরকি টানতে টানতে বাইরে নিয়ে গিয়ে দূরে এক গাছ তলায় তাকে বসিয়ে রাখলো। দেখলাম সেখানে রমেশ, বিশ্বেশ্বর এবং আরও চার পাঁচটি কনস্টেবল জটলা করছে।

ঠাণ্ডা ঘর? এই টেকনাফ থানায় ঠাণ্ডা ঘর রয়েছে অথচ এই ক'দিনের মধ্যে আমি তার অস্তিত্বও জানতে পারিনি? আকাশ পাতাল ভাবছি—দেখি সতীশ জামালের ঘাড় ধরে ধাক্কা দিতে দিতে ঘরের দক্ষিণ দিকে একটা ছোট্ট পার্টিশন দেওয়া ঘরে ঢুকলো। রাইফেল বন্দুক এই সব থাকতো বলে ঘরটি প্রায় সব সময় বন্ধই থাকতো। আজ বুঝলাম উনিই ঠাণ্ডা ঘর, সময় বিশেষে ওঁরও মস্ত প্রয়োজন রয়েছে।

ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে সতীশ। ছ' তিন মিনিট চুপ চাপ তারপর শুরু হলো জামালের মর্মভেদী আর্তনাদ; অসহ্য যন্ত্রণা দিয়ে যেন একটা লোককে কেউ মেরে ফেলছে, বেশিক্ষণ শুনলে পাগল হয়ে যেতে হয়। আমার সর্বাঙ্গ তখন থর থর করে কাঁপছে, বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করছে। মহেন্দ্রবাবুর দিকে চাইলাম, ভদ্রলোক নির্লিপ্তভাবে চোখ বুজে বসে একটি সিগারেট টানছেন আর পা দোলাচ্ছেন। একরকম ছুটে থানা থেকে বেরিয়ে নিজের কোয়ার্টার্সে এসে বিছানার উপর শুয়ে পড়লাম।

আধ ঘণ্টা পরে।

কৌতূহল বেশিক্ষণ শুয়ে থাকতে দিলে না। কান খাড়া করে শুনি থানার দিক থেকে কোনো কান্নার আওয়াজ আসছে কিনা। শুনতে পেলাম না। উঠে আস্তে আস্তে থানার দিকে পা বাড়ালাম।

দেখলাম মহেন্দ্রবাবু একমনে কি সব লিখে চলেছেন, ঘরের মেজেতে আধমরা জামাল স্ত্রীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে আর জামালের স্ত্রী তার বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কিছু দূরে ভাবলেশশূন্য মুখে দাঁড়িয়ে আছে সতীশ। মহেন্দ্রবাবুর পাশের চেয়ারটিতে চুপ করে বসে পড়লাম। নিস্তব্ধ ঘরে শুধু কাগজের উপর কলমের একঘেয়ে খস খস আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। এইভাবে আরও পাঁচ মিনিট কাটলো।

লেখা শেষ করে মহেন্দ্রবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন—সতীশ ইজ রাইট। পড়ে দেখো।

জামালের স্বীকারোক্তি পড়ে থ' হয়ে গেলাম। ব্যাপারটা হচ্ছে এই—মন্নুর (মৃত ছেলেটি) বাবা সওকৎ বেশ সঙ্গতিপন্ন চাষী ও হিসেবী লোক ছিলো। ধানের জমি, গোলা, নগদ টাকা এসবই তার রোজগারের সঞ্চয়। ছোট ভাই জামাল ছেলেবেলা থেকেই বাউণ্ডুলে, রাতদিন মদ আর তাড়ি খেয়ে কাটিয়ে দিতো। কাজকর্ম কিছুই করতো না। সওকৎ হঠাৎ নৌকাডুবিতে মারা যাওয়ায় জামাল হাতে পেলো সব কিছুই। কিন্তু ঐ পথের কাঁটা মন্নু বেঁচে থাকলে নিশ্চিন্ত হয়ে কিছুই ভোগ করা চলবে না। বড় হয়ে ও যেদিন ওর ন্যায্য পাওনা দাবি করে বসবে তখন ? কাজেই এক বছর ধরে অনেক জল্পনা-কল্পনা করে গত রাত্রে জামাল ওর গলা টিপে মেরে পেয়ারা গাছের উঁচু ডাল থেকে নিচে ফেলে দেয়, যাতে নরম মাটিতে দেহের দাগ পড়ে। সব দিক বাঁচিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারলো না জামাল। তীরে এসে তরী ডুবলো। গলার নিচে আঙুলের দাগ সাধারণ লোকের চোখে পড়বার কথা নয়, কিন্তু সতীশের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। ঠাণ্ডা ঘরের ঠাণ্ডি দাওয়াই খেয়ে জামাল বেসামাল হয়ে সব স্বীকার করে ফেলেছে।

পড়া শেষ করে সতীশের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি সতীশ ঘরে নেই, এরই মধ্যে কখন জামালকে ডেকে নিয়ে থানার বারান্দায় এক পাশে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে কি বলছে।

একটু পরে সতীশ ফিরে এল। মহেন্দ্রবাবুর কানের কাছে মুখ এনে কি যেন বলতেই মহেন্দ্রবাবু রাজী হয়ে গেলেন। সতীশ বারান্দা থেকে জামালকে ডেকে নিয়ে এলে পর ব্যাপারটা

বুঝলাম। সতীশ জামালকে জানিয়েছে এখন তার মাত্র দুটি রাস্তা খোলা। হয় নগদ পাঁচ হাজার টাকা এনে মহেন্দ্রবাবুর শ্রীপাদপদ্মে প্রণামী দেওয়া, নয় তো এখনই সস্ত্রীক পুলিস পাহারায় মড়া নিয়ে কক্সবাজার রওনা হওয়া। একটু ইতস্তত করে জামাল প্রথম পথটাই বেছে নিয়েছে।

এর পর এক ঘণ্টার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে গেল। দু' তিনজন কনস্টেবল সঙ্গে করে জামাল বাড়ি থেকে টাকা এনে দিলে। মহেন্দ্রবাবু আনন্যাচরল ডেথ কেস বলে একটা রিপোর্ট লিখে নিলেন আর জামালের পথের কাঁটা মন্নুকে কবর দেওয়ার অনুমতি দিলেন।

নিশ্চিন্ত মনে মহেন্দ্রবাবু, সতীশ ও আর সবাই নাওয়া খাওয়া করতে কোয়ার্টার্সে চলে গেলেন। ঠায় বসে রইলাম চেয়ারে। কতোক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না, চেয়ে দেখি থানা-ঘরের পশ্চিম দিকের বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে অপরাহ্ণের পড়ন্ত রোদের কতকগুলো টুকরো ঘরের মেজেতে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়েছে। মন্নু যেখানটায় শুয়েছিল সেখানেও দেখলাম একটুকরো রোদ। মনে হলো থানা-ঘরের মাটির মেজেতে শত শত মন্নুকে কবর দেওয়া হয়েছে আর ওগুলো রোদের টুকরো নয়, সতীশের চেয়ে শত সহস্র গুণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে আর একজন মেজের শক্ত মাটি ভেদ করে কবরগুলো দেখছে।

আর বসতে পারলাম না। আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে গেলাম।

দু' তিনদিন পরের কথা। এখন আমার নিত্য নৈমিত্তিক কাজ হলো দু'বেলা বারান্দায় চেয়ারে বসে কাগজ পড়ার ভান করে মগী যুবতীদের জল তোলা দেখা। ওদের ঐ দুর্বোধ্য ভাষার কিচির মিচির কানে মধুবর্ষণ না করলেও বেশ লাগে। সেদিন একটু সকাল সকাল ঘুম ভেঙে গেল। যথারীতি চেয়ারে বসে ডিউটি দিচ্ছি। পাতকুয়োর ধারে সবেমাত্র তিন চারিটি যুবতীর জটলা শুরু হয়েছে, অন্যান্যরা এখনও এসে জড়ো হয়নি। হঠাৎ

কিছু দূরে নজরে পড়লো, চৌদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ে। কাঁখে ঝকঝকে একটা পেতলের কলসী ; পরনে সিল্কের দামী লুঙ্গি, গায়েও দামী রেশমী ফতুয়া। মেয়েটি ধীরে ধীরে এসে পাতকুয়োর ধারে কলসী রেখে দাঁড়ালো। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এরকম রূপযৌবনে লাবণ্যময়ী মেয়ে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। নাক চোখ মুখ সুন্দরী বাঙালী মেয়েদের মতোই নিখুঁত, তার উপর ঐ নয়নমনোহর খোঁপা। মনে হলো, সমুদ্র থেকে কোনো জলপরী উঠে এসেছে টেকনাফের পাতকুয়ো থেকে জল নিতে। স্থান কাল পাত্র ভুলে বিমুগ্ধ চোখে হা করে চেয়ে আছি। মেয়েটি দু'-একবার আমার দিকে তাকিয়ে লজ্জায় মুখ নিচু করে মাটির দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবেই কাটলো।

পা টিপে টিপে দুষ্টু হরকিটা যে কখন এসে পড়েছে খেয়াল হয়নি। একটু হেসে হরকি বললে—আর কতোক্ষণ চেয়ে থাকবেন বাবু, মাথিনের জল নেওয়া আজ আর তা'হলে হবে না।

বেশ একটু বিরক্ত হয়েই বললাম—মাথিন! মাথিন আবার কে?

—ঐ যে মেয়েটি আপনার চাউনির ধাক্কা সামলাতে না পেরে লজ্জায় লাল হয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে ঐ তো মাথিন। এখানকার জমিদার ওয়াং থিনের একমাত্র আদুরে মেয়ে।

লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, ও কি রোজ কুয়ো থেকে জল নিতে আসে?

হরকি বলে—প্রায়ই তো আসে, তবে খুব সকালে। অন্য মেয়েরা জল নিতে আসবার আগেই ও জল নিয়ে চলে যায়। জল নিতে আসা ওর একটা শখ। বাড়িতে পাঁচ ছ'টি চাকরানী রয়েছে, তবু ওর জল নিতে আসা চাই। ওর বাপ মেয়েঅন্ত প্রাণ, তাই কোনো কিছুতেই আপত্তি করে না।

কথায় কথায় বেলা হয়ে উঠলো। চেয়ে দেখি পাতকুয়োর ধারে ভিড় বেশ জমে উঠেছে কিন্তু তাদের মধ্যে মাথিন নেই। কোন্ ফাঁকে জল নিয়ে সে সরে পড়েছে জানতেও পারিনি।

কৌতূহল হলো। চেয়ে দেখি সর্বাঙ্গে চন্দনের ফোঁটা কেটে

পূজার আসনে বসে লোলুপ দৃষ্টিতে পাতকুয়োর দিকে চেয়ে ডিউটি দিচ্ছে বিশ্বেশ্বর পাঁড়ে। অন্যদিন হলে হেসে ফেলতাম, আজ পারলাম না। থানার দিকে পা বাড়ালাম। ঘরে ঢুকে কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করছি, একখানা সাদা কাগজ হাতে রমেশ এসে স্যালুট করে দাঁড়ালো।

—ব্যাপার কি রমেশ? জিজ্ঞাসা করলাম।

রমেশ বললে—আজ্ঞে, একটা ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্ত লিখে দিন।

বললাম—ছুটি পেলেও এখন যাবে কি করে? স্টীমার তো বন্ধ।

রমেশ—তিন চার দিনে হেঁটেই মেরে দেবো।

রমেশের বাড়ি চট্টগ্রাম জেলারই কোনো গ্রামে। দরখাস্ত নিয়ে খুশি মনে রমেশ মহেন্দ্রবাবুর কোয়ার্টার্সে সই করাতে নিয়ে গেল।

ভাবলাম, আমারও তো চৌদ্দ দিন ক্যাজুয়াল লিভ পাওনা হয়েছে, করবো নাকি একটা দরখাস্ত? হাসি পেলো। রমেশ না হয় হেঁটেই মেরে দেবে, কিন্তু আমি? অন্ততঃ ছ' মাসের মধ্যে স্টীমার আসবার কোনো সম্ভাবনা নেই। মাথিন আর স্টীমারের কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে লিখে ফেললাম একখানা দরখাস্ত। তারপর পড়ে নিয়ে সেটা মহেন্দ্রবাবুর টেবিলে ডেলি রিপোর্টের ফাইলের ওপর রেখে দিলাম।

থানার সামনে সরু রাস্তার উপর চোখ পড়তেই দেখি, আগে সতীশ, তার পিছনে রক্তমাখা প্রকাণ্ড একটা পোঁটলা হাতে চার পাঁচজন মগ উত্তেজিতভাবে কি বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। গোলমাল শুনে মহেন্দ্রবাবুও এসে পড়লেন, তখন খোলা হলো পোঁটলা। দেখলাম, আধাবয়সী একটি মগ মেয়ের ছিন্ন ভিন্ন দেহের রক্তাক্ত টুকরোগুলো এক সঙ্গে জড়ো করে বাঁধা। বীভৎস দৃশ্য। আমার মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। দেখলাম, দিব্যি সহজভাবে ঝুঁকে পড়ে মহেন্দ্রবাবু সেগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখে নিলেন। সতীশের কাছে ব্যাপারটা যা শুনলাম, তা হলো এই—থানার পশ্চিমদিকে চিটাগং হিলস্-এর পাদদেশে খানিকটা সমতল জমি আছে, সেখানে ধানের চাষ করা হয়। কিছুদিন

হলো ধানকাটা হয়ে গিয়েছে। আজ ভোরে এই মেয়েটি আরও অনেকগুলো মেয়ের সঙ্গে কাঠ কুড়োতে চিটাগং হিলস্-এর দিকে যায়। এদের উপজীবিকাই হলো কাঠ কুড়িয়ে বাজারে বিক্রি করা। হঠাৎ সেই সময় একপাল বুনো হাতী হিলস থেকে নেমে আসে সমতল ভূমিতে ধানের গোড়া খাবার জন্যে। এই মেয়েটি সেই হাতীর পালের সামনে পড়ে যায়। একটা হাতী মেয়েটাকে শুঁড়ে জড়িয়ে ধরে আছাড় মারে, ফলে এর হাত পা ধড় মুণ্ডু সব টুকরো টুকরো হয়ে দূরে ছিটকে পড়ে।

সব শুনে মহেন্দ্রবাবু বললেন—হুঁ, আর একটা আনন্যাচরল ডেথ কেস। আমি রিপোর্টটা লিখে নিচ্ছি। ওর আপনার লোক কেউ যদি থাকে তো লাস তাদের দিয়ে দাও, নইলে পোঁটলাটা শক্ত করে বেঁধে নদীতে ফেলে দাও।

সেদিন দুপুরে ভাত খেতে বসে খেতে পারলাম না। পেট গুলিয়ে উঠলো আর চোখের সামনে ভেসে উঠলো রক্তমাখা পোঁটলাটা। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে বমি করে ফেললাম।

বিকেলের দিকে একটু সকাল সকাল নিজেই বেড়াতে বেরুলাম। বাজারে ঢুকে দেখি, রঙ-বেরঙের লুঙ্গি ফতুয়া পরে একদল মেয়ে পুরুষ জিনিসপত্তোর নিয়ে বসে গিয়েছে, আরও অনেকে আসছে। বুঝলাম, আজ হাটবার। ওখানকার সবচেয়ে বড় দোকানদার হলেন নিবারণ সাহা। তিনি আমায় দেখতে পেয়ে মহা সমাদরে ভেতরে নিয়ে বসালেন। প্রকাণ্ড ঘর, উপরে টিনের চাল। ভালো করে চেয়ে দেখলাম, এখানে না পাওয়া যায় এমন জিনিসই নেই। কাপড় চোপড় থেকে শুরু করে চাল ডাল তেল নুন চাই কি পান বিড়ি সিগারেট মায় তেলেভাজা পর্যন্ত। চওড়া তক্তাপোশের উপর পরিষ্কার মাদুর পাতা। সেইদিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে নিবারণবাবু বললেন—বসতুক—মানে বসুন। বসে পড়লাম। এঁদের চট্টগ্রামের ভাষায় সবতাতেই একটা 'তুক' জুড়ে দেওয়াই হচ্ছে ভদ্রতা বা নিয়ম। যেমন ধরুন—আসুন, বসুন, খান, যান। ওঁরা বলবেন আসতুক, বসতুক, খাতুক, যাতুক ইত্যাদি। নিবারণবাবুর কাছে টেকনাফ সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা জানতে

পারলাম। মগের মুলুক বললেও আসলে কিন্তু এরা হচ্ছে বার্মিজ। রেঙ্গুনের দিকটা হচ্ছে আপার বার্মা আর এদিকটা হচ্ছে লোয়ার বার্মা। ভাষা ধর্ম আচার ব্যবহার সব এক। তফাত হলো, বার্মিজরা শিক্ষিত, তাদের ভাষাও মার্জিত। আর এরা অধিকাংশ অশিক্ষিত কাজেই ভাষাটাও অনেকটা গেঁয়ো। যেমন আমাদের দেশের শিক্ষিত ভদ্রলোকের ভাষা আর অশিক্ষিত চাষার ভাষা।

দেখলাম, বাজারের অধিকাংশ মগের হাতে রয়েছে দু'তিন হাত লম্বা দা'। খুব ধারালো, তার উপর পড়ন্ত রোদের আলো পড়ে চক চক করছে।

নিবারণবাবু বললেন—কি জানেন, ওদের অনেককেই বহুদূর থেকে ঐ চিটাগং হিলস্-এর মধ্যে দিয়ে আসতে হয়। পথে অনেক সময় বাঘ, ভালুক সাপ পড়ে। ঐ দা' দিয়ে সেগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে তবে ওরা নিরাপদে পথ চলতে পারে।

চকচকে দা'গুলোর দিকে চেয়ে আকাশ পাতাল ভাবছি, হঠাৎ নজরে পড়লো, প্রকাণ্ড মূলোর মতো গাঢ় হলুদ রঙের এক কাঁদি মর্তমান কলা। এত বড় কলা আগে দেখিনি। নিবারণবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, ওর এক ছড়া কলার দাম কতো হবে?

নিবারণবাবু হেসে জবাব দিলেন—আপনার পরিচয় জানতে পারলে ও দামই নেবে না। আমরা কিনলে দু'পয়সা নেবে।

বিশ্বাস হলো না। বললাম—আমায় এক ছড়া আনিয়ে দিন।

দুটো পয়সা দিয়ে নিবারণবাবু একজন কর্মচারীকে পাঠিয়ে কিছু পরে এক ছড়া কলা এনে আমার হাতে দিলেন। দাম দিতে গেলাম, জিভ কেটে নিবারণবাবু বললেন—আপনাদের কিছু দিতে পারলে আমরা ধন্য হয়ে যাই। খুশি হয়ে মনে মনে বললাম, না দেখিয়ে এটা যে সত্যিই দিলেন এর জন্য ধন্যবাদ। এর পরে সব জিনিসের দাম যা শুনলাম, তাতে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। ধরুন, মাঝারি লাউ-এর মতো একটা পাকা পেঁপে, দাম এক পয়সা। হাঁসের বা মুরগীর ডিম পয়সায় চারটে, একটু দর-কষাকষি করলে পাঁচটাও পাওয়া যায়। সবচেয়ে উৎকৃষ্ট চাল বারো আনা মণ, নইলে আট দশ আনায় মাঝারি ভালো চাল পাওয়া যায়। মুরগী, পাঁঠা, মাছ, দুধের কথা আগেই বলেছি।

এইসব কথা কলকাতার আমার এক সহপাঠী বন্ধুকে টেকনাফ থেকে লিখেছিলাম। উত্তরে সে লিখলে—অতিরঞ্জন করা চিরদিনই তোর অভ্যাস জানতাম। আজগুবি গল্প বানিয়ে বলতেও তোর জুড়ি নেই জানি। কিন্তু সুদূর মগের মুলুকে গিয়ে তুই তারও উপরে চলে গিয়েছিস। মনে হয়, সঙ্গদোষে আবগারির সস্তা শুকনো নেশার কবলে পড়ে আজকাল তুই যা তা লিখছিস। সত্যি ব্যাপারটা জানাবি কি? রাগে দুঃখে সেই থেকে তাকে আর কোনো চিঠিপত্তোর দিইনি।

নিবারণবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—জিনিসপত্তোর এখানে এতো সস্তা হওয়ার কারণ কি?

নিবারণবাবু বললেন—এখন স্টীমার বন্ধ। এ দ্বীপের বা এর আশেপাশের দ্বীপের তরি-তরকারি, মুরগী, ছাগল, মাছ কিছুই বাইরে চালান দেবার উপায় নেই। কাজেই সস্তায় না দিলে কেনবার পয়সা এদের নেই। তবে হ্যাঁ, জিনিসপত্তোর একটু আক্রা হয় শীতকালে, তখন ভালো ভালো জিনিস সব বাইরে চালান করে দেয়।

কথা বলা নিবারণবাবুর একটা নেশা। মনে হলো, অনেকদিন ভালো শ্রোতা পাননি, তাই আজ আমায় পেয়ে উৎসাহ বেড়ে গেল। বললেন—এই মগ জাতটার একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন দারোগাবাবু? অসম্ভব সরল এরা। ঠাট্টা-তামাশা, ঘোরপ্যাঁচ কিছুই এরা বোঝে না। আর এদের যৌন ব্যাপারটা আরো অদ্ভুত। ব্যভিচার বলে কিছু এদের মধ্যে নেই। যদি কদাচিৎ কেউ অবিবাহিতা কুমারী বা পরস্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় আর তা হাতে নাতে ধরা পড়ে, তাহলে আর রক্ষে নেই। ঐ ধারালো চকচকে দা' দিয়ে মেয়েটির অভিভাবক বা স্বামী দু'জনকেই কেটে টুকরো টুকরো করবে, পুলিসের বিচারের তোয়াক্কা না করেই। তারপরে নিজেই এসে থানায় হাজির হবে শাস্তির জন্যে। জেল, ফাঁসি, দ্বীপান্তর যা হয় হাসিমুখে মাথা পেতে নেবে, পালাবে না।

সভয়ে হাটের দিকে চাইলাম। অস্তগামী সূর্য তখন চিটাগং হিলস্-এর আড়ালে আত্মগোপন করেছে। সন্ধ্যার পাৎলা আঁধার

আস্তে আস্তে নেমে আসছে। দেখলাম, অস্পষ্ট আলোতেও দূরের যাত্রী মগদের হাতের প্রকাণ্ড দা'গুলো চকচক করছে। উঠে দাঁড়ালাম। বললাম—সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে, এবার উঠি। আর একদিন এসে সব শুনবো। দু'-এক পা এগিয়ে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, এখানে জমিদার ওয়াং থিনের বাড়িটা কোথায় বলুন তো ? শুনেছিলাম বাজারের মধ্যে।

বাইরে বেরিয়ে এসে দক্ষিণদিকে হাত দিয়ে দেখিয়ে নিবারণবাবু বললেন—ঐ যে দোতলা বাড়িটা।

বাড়িটা কাঠের হলেও দোতলা। মোটা শালগাছের গুঁড়ির উপর পুরু তক্তার মেজে, দেওয়ালও তক্তার। উপরে টিনের ছাউনি। ছবির মতো সুন্দর বাড়িটা। দোতলায় হাটের দিকে এক হাত লম্বা ও আধ হাত চওড়া একটা ফোকর বা জানলা। বাড়ির চার পাশে অনেকখানি জায়গা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। তার মধ্যে নানা রং-এর ফুলের গাছ। মোটকথা গৃহস্বামী যে সঙ্গতিসম্পন্ন এবং রুচিবান বাড়িটার দিকে এক নজর চাইলেই বেশ বোঝা যায়। দোতলার সেই ফোকরটার দিকে উৎসুক ব্যাকুল চোখ মেলে চেয়ে আছি, যদি একবার মাথিন উঁকি দেয়। দিলো না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে এগোতে যাবো, নিবারণবাবু বললেন—একটু দাঁড়ান। ছুটে গিয়ে দোকান থেকে একটা টর্চ এনে দিয়ে বললেন—অন্ধকার হয়ে গিয়েছে। এ সময় পথে সাপ টাপ থাকতে পারে। এটা নিয়ে যান, পরে সুবিধে মতো পাঠিয়ে দেবেন।

ধন্যবাদ দিয়ে এগোলাম। এক হাতে প্রকাণ্ড একছড়া মর্তমান কলা, অন্য হাতে টর্চ। বাজার ছেড়ে খানিকটা পথ বেশ খোলা, কোনও গাছপালা নেই। টর্চ না জ্বেলেই বেশ এগিয়ে চললাম। কিছু দূর গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বটগাছ পড়ে, তার তলাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। গা'টা ছমছম করে উঠলো। হাওয়ায় শুকনো গাছের পাতার ঝুরঝুর শব্দে মনে হয় বুঝি সাপ। একটু পরে একটা অস্পষ্ট ধস্তাধস্তির শব্দ পেলাম, মনে হলো, কারা যেন ফিসফিস করে কথা কইছে। কান খাড়া করে রইলাম। কই, কিছুই তো শোনা যায় না। শুধু হাওয়ায় ভেসে আসছে

বে অব বেঙ্গলের চাপা আক্রোশ। ভাবলাম, নিবারণবাবুর দোকান থেকে একজন লোক সঙ্গে নিয়ে আসি। আবার মনে হলো, কি ভাববে ওরা। না, থাক, কাজ নেই। যা থাকে কপালে এগিয়ে যাই। টর্চটা জ্বাললাম, সঙ্গে সঙ্গে কলাগুলো হাত থেকে রাস্তার পাশের একটা গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। সমস্ত ঘটনাটা বোধ হয় একমিনিটের মধ্যেই ঘটে গেল। টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, রাস্তার পাশে ঘুটঘুটে অন্ধকারে সাপের ভয়কেও তুচ্ছ করে যোগীন দাসের কুমারী স্ত্রীকে জাপটে ধরে আদর করছে কনস্টেবল বিশ্বেশ্বর পাঁড়ে। জল ভরা মাটির কলসীটা হাত দুই দূরে পড়ে রয়েছে। তাড়াতাড়ি আলো নিবিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে বটগাছের সীমানা পেরিয়ে এলাম।

কি জানি কেন, হঠাৎ হাসি পেল আমার। ভাবলাম, এতদিনে বিশ্বেশ্বর পাঁড়ের আকুল প্রার্থনা বোধ হয় বিশ্বেশ্বরের দরবারে পৌঁচেছে। পরক্ষণেই আঁৎকে উঠলাম। ভাবলাম, আজ আমি না হয়ে যদি লম্বা দা' হাতে কোনও মগের সামনে ঐ দৃশ্যটি পড়তো, তাহলে? বিশ্বেশ্বরের ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করে আবার শিউরে উঠলাম।

এরপর দু' তিনদিন কেটে গিয়েছে। ছোটোখাটো উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটলেও সেদিকে নজর দেবার ইচ্ছা বা অবকাশ আমার ছিল না। ভোর হবার আগেই বারান্দায় চেয়ারে গিয়ে বসি, মাথিন আসে। পরস্পরের দিকে চেয়ে দু'জনে সম্ভব অসম্ভব নানা কল্পনার রঙিন জাল বুনে চলি। অন্য মেয়েরা আসে, হাসাহাসি করে, গা টেপাটেপি করে, ভ্রূক্ষেপ নেই। পরে ভিড় বেশি বেড়ে গেলে অনিচ্ছায় জল নিয়ে মাথিন চলে যায়, আমিও উঠে পড়ি। মুখের ভাষা না বুঝলেও দু'জনের মধ্যে চোখের ভাষার পরিচয় ততোদিনে বেশ ঘনীভূত হয়ে এসেছে। আমি সন্ধ্যেবেলায় আবার আসবার মিনতি জানাই, সেও সানন্দে সম্মতি দিয়ে চলে যায়। আবার সন্ধ্যেবেলায় চলে ঐ একই খেলার পুনরাভিনয়। সবাই জল নিয়ে চলে গেলে মাথিন আসে, দু'জনে দু'জনার দিকে চেয়ে থাকি যতোক্ষণ দেখা যায়। পরে সন্ধ্যার আঁধার গাঢ় হয়ে

আসে, কাছের মানুষও ভালো দেখা যায় না। জল নিয়ে ধীরে ধীরে মাথিন চলে যায় আর ওর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখেও সমস্ত বিশ্ব-সংসার অন্ধকার হয়ে আসে। রাত্রে ঘুমুতে পারি না। মাথিনের কথা ভাবি, কল্পনায় মাথিনকে দেখি। বুঝলাম, আমার জীবনে প্রথম বসন্ত এল এই সুদূর টেকনাফে। মাথিনকে আমি ভালোবেসেছি। অনেক কষ্টে ঘুম এলেও স্বপ্ন দেখি মাথিনদের কাঠের দোতলায় আধ হাত চওড়া জানলায় মুখ বাড়িয়ে আমি আর মাথিন হাটে মগদের বিচিত্র বেচাকেনা দেখছি। মুখ ফেরাতে গিয়ে মাথা ঠোকাঠুকি হয়ে যায়, দু'জনে এক সঙ্গে হেসে উঠি। ঘুম ভেঙে যায়, ততোক্ষণে ভোর হয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠে বাইরে চেয়ারে গিয়ে বসি।

এমনি করে চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিনগুলি আমার কেটে যাচ্ছে ; মনে হয়, এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না। সেদিনও যথারীতি বারান্দায় বসে আছি, হরকি এসে কাছে বসলো। কোনোরকম ভূমিকা না করেই বললাম—আমায় মগী ভাষা শিখিয়ে দিবি হরকি ?

কিছুক্ষণ হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থেকে হরকি বললে—ভাষা না শিখেই যা করেছেন বাবু এর পরে ভাষা শিখলে টেকনাফের সুন্দরী মেয়ে আর একটাও বেঁচে থাকবে না, সব মরে যাবে। মগী রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠলো হরকি।

রাগ হলো না, বললাম—ঠাট্টা রাখ, সত্যিই আমি শিখবো।

—তার চেয়ে এক কাজ করুন না বাবু, মাথিনকে বিয়ে করে ফেলুন, ওই আপনাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেবে।

জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, ওদের বিয়ের নিয়ম-কানুনগুলো কি রকম ?

হরকি বললে—খুব সোজা। বিয়ের ব্যাপারে অভিভাবকদের কোনও হাত নেই, যা করবে মেয়ে। মেয়ের যদি ছেলে পছন্দ হয় তাহলে সে যৌতুক চাইবে। ধরুন, দু'ভরি সোনা। ছেলের যদি ক্ষমতা থাকে এনে দেবে। মেয়ের আত্মীয়স্বজন সবাই এক

সঙ্গে ক্যাং ঘরের কাঠের মেজেতে বসে শুঁকটি মাছের গুঁড়ো দিয়ে ভাত খাওয়া হলেই বিয়ে হয়ে গেল। আপনার ভরণপোষণের সব ভার নিয়ে নিলো মেয়ে। আপনি নিশ্চিন্তমনে খেয়ে দেয়ে আড্ডা দিয়ে সময় কাটিয়ে দিন।

পাতকুয়োর দিকে চোখ পড়লো। দেখি, কৌতূহলী দৃষ্টি আমাদের দিকে মেলে দাঁড়িয়ে আছে মাথিন। হরকি বললে—ঐ যে! না এসে আর উপায় আছে? আমি বলছি বাবু, ওর আপনাকে খুব পছন্দ হয়েছে।

লজ্জা পেলাম, বললাম—যাঃ।

—আমি বলছি বাবু। একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আমাদের থানার নতুন বাবুকে ওর কেমন লাগে।

ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—কি বললে?

—বললে—

বলতে গিয়ে থেমে গেল হরকি। থানার দিকে চেয়ে দেখি, দরজায় দাঁড়িয়ে সতীশ শ্যেনদৃষ্টি দিয়ে আমাদের নিরীক্ষণ করছে। একটু পরে চট করে ও সরে গেল।

হরকি বললে—বাবু, ব্যাটা সতীশ সব দেখে গেল। বড়বাবুর কাছে গিয়ে এখুনি পাঁচখানা করে লাগাবে। আমি যাই, পরে আপনাকে সব বলবো।

হরকি থানার দিকে চলে গেল। কুয়োর দিকে চেয়ে দেখি, দুটি মেয়ে হাসি ঠাট্টা করতে করতে মাথিনের কলসীতে জল তুলে দিচ্ছে আর গম্ভীর মুখে মাথিন তাই দেখছে। আমার দিকে একবারও তাকালো না। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে বিছানার ওপর শুয়ে পড়লাম। কিছুই ভালো লাগছিল না, খানিক বাদে উঠে বসলাম। চোখ পড়লো ঘরের কোণে একটা ভাঙা কাঠের বাক্সের উপর। মনে পড়লো, বাজারের সেই হারমোনিয়মটার কথা। কবে দিয়ে গিয়েছে মনেও নেই আর প্রয়োজনও হয়নি। হঠাৎ গান গাইতে ইচ্ছা হলো। ভাঙা বাক্সটা খুলে ততোধিক ভাঙা নড়বড়ে হারমোনিয়মটা বার করলাম। অযত্নে ও অব্যবহারে ধুলো জমে গিয়েছে। যতোদূর পারলাম পরিষ্কার করে 'সা'-এর পর্দা টিপতেই সমবেদনায় 'মা' আর

'পা'ও বেজে উঠলো। চড় চাপড় দিয়ে আলগা স্ট্র্যাপার স্ক্রুগুলো দুমড়ে শক্ত করে বাজাতে শুরু করলাম। ও হরি, এবার আরও পাঁচ সাতটা পর্দা চিৎকার করে উঠলো। হতাশ হয়ে ভাবলাম, আমার গান শোনা টেকনাফবাসীর ভাগ্যে নেই। হারমোনিয়মটা বন্ধ করতে যাচ্ছি, দেখি, দরজায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে সতীশ। সত্যি কথা বলতে কি, ওকে ঐরকম হাসতে দেখলে কি এক অজানা ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠতো।

সতীশ বললে—গানের চর্চা করছিলেন বুঝি ?

রাগ চেপে জবাব দিলাম—চর্চা আর করতে পেলাম কই। হারমোনিয়মটা ভাঙা।

হাসিতে মুখখানা কুঁচকে গেল সতীশের। একটু পরে বললে—তা গানের চেয়েও ভালো জিনিসের চর্চা যখন করছেন—

বাধা দিয়ে বললাম—কি যা তা বলছো সতীশ।

গলায় মধু ঢেলে সতীশ বললে—বাবু, আপনি ছেলেমানুষ, তার উপর অজানা দেশ। হঠাৎ যদি কোনও বিপদে পড়েন, বেঘোরে মারা যাবেন।

বললাম—তুমি কি বলতে চাইছো সতীশ ?

সতীশ বললে—বলছিলাম, কষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক। বিশেষত এ বয়সে। তা হরকিকে না বলে আমাকে দয়া করে হুকুম করবেন। একটু ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দেবেন পাতকুয়োর ধারে কোনটাকে আপনার চাই। রাত্রে আপনার ঘরে এনে হাজির করে দেবো, কাক-পক্ষীও জানতে পারবে না। হরকি হলো ওদেরই লোক, ওকে অতোটা বিশ্বাস না করাই ভালো। শুধু মাঝে মাঝে টাকাটা-সিকিটা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। আবার সেই শয়তানি হাসি।

রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেলেও মুখে কিছুই বলতে পারলাম না। মুখ নিচু করে হারমোনিয়মের পর্দাগুলোর উপর হাত বুলোতে লাগলাম।

একটু পরে মুখ তুলে চেয়ে দেখি, বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাতকুয়োর দিকে চেয়ে একটা বয়স্কা মেয়েকে কুৎসিত ইশারা

করছে সতীশ, আর আশপাশের মেয়েগুলো হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিলাম।

আজ ক'দিন হলো স্ত্রীর অসুখ বলে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গিয়েছে যতীনবাবু। ডেলি রিপোর্ট লিখবার ভার পড়েছে আমার উপর। সন্ধ্যের পর থানায় বসে তাই লিখছিলাম, চোরের মতো চারদিক তাকাতে তাকাতে ঘরে ঢুকলো হরকি। লেখা শেষ করে ওর দিকে চাইলাম। চাপা গলায় হরকি বললে—সতীশ আপনাকে কি বলেছে আমি জানি বাবু, আপনি মন খারাপ করবেন না। ব্যাটা জ্যান্ত শয়তান। এখানে এসে অবধি খালি আমায় বলে—তোরই তো স্বজাত, দে না একটা মেয়ে ঠিক করে।

বললাম,—কেন ? আজই তো পাতকুয়োর ধারে একটা মেয়ের সঙ্গে জঘন্য ইয়ার্কি দিচ্ছিলো—আর মেয়েগুলোকেও আমার মোটেই ভালো মনে হলো না।

গম্ভীরভাবে হরকি বললে—ঐ কথাটা বলবেন না বাবু। মগেরা গরীব, লেখাপড়া জানে না, সবই সত্যি। কিন্তু একটা জিনিষ ওরা এখনও আঁকড়ে ধরে আছে, সেটা হলো ধর্ম। জান দেবে তবু ধর্ম দেবে না।

সংশয়ভরে বললাম—কিন্তু সতীশ যে বললে—আপনি শুধু দেখিয়ে দিন কাকে চাই, রাত্রে আপনার ঘরে এনে হাজির করে দেবো ?

তাচ্ছিল্যভাবে হরকি বললে—সব ফক্কুড়ি! সে মুরোদ থাকলে ও ব্যাটা আমার হাতে পায়ে ধরে ? আপনি বিশ্বাস করুন বাবু, বিয়ে না করলে মগী মেয়েরা কাউকে জাত দেবে না। মুহূর্তের ভুলে কেউ যদি সেকথা ভুলে যায়, আর ধরা পড়ে, তাহলে ভগবান বুদ্ধও তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন না। মুখে ঠাট্টা ইয়ার্কি সব করবে। কিন্তু আসলে খুব হুঁশিয়ার।

মন অনেকটা হাল্কা হয়ে গেল, বললাম—আজ সন্ধ্যেবেলায় মাথিন জল নিতে এল না কেন ?

দুষ্টুমি হাসি হেসে হরকি বললে—আসবে কি করে ? আমি এতোক্ষণ ওদের ওখানেই ছিলাম যে। অনেক কথা হলো। বখশিস দেন তো বলি।

বললাম—দু'টাকা বকশিস—বল কি কথা হলো।

খুশি হয়ে মহা উৎসাহে হরকি বললে—আপনার কথা বলতেই মাথিন বলে উঠলো, থানাগিরি কুং কুং রে এ এ এ এ···।

রীতিমতো রেগে গিয়ে বললাম—ঠাট্টা রাখ, সত্যি বল কি বললে ?

—ভগবান বুদ্ধের দিব্যি বাবু, মাথিন ঐ কথাই বললে। ওর মানে হলো—থানার বাবুকে চমৎকার দেখতে।

সমস্ত শরীরে একটা আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। বললাম —আচ্ছা হরকি, মাথিনের সঙ্গে যদি কোনোদিন কথা কইবার সুযোগ পাই, যদি ওকে বলতে চাই—তোমায় চমৎকার দেখতে। তাহলে মগী ভাষায় কি বলতে হবে ?

দ্বিরুক্তি না করে হরকি বললে—মাগো কুং কুং রে এ এ এ এ···।

জিজ্ঞাসা করলাম—যদি বলতে চাই—মাথিন, তুমি যে কোনো যৌতুক চাও তাই দিয়ে তোমায় আমি বিয়ে করবো—তা হলে ?

হরকি বললে—মাগো জাই ফলেয়ু মাগোঙা নিজ্জামে এ'এ এ এ এ। শেষের কথাটা একটু টেনে বলতে ভুলবেন না বাবু।

হেসে বললাম—না, ভুলবো না। মগী কথার উচ্চারণে হয় তো ভুল হবে—কিন্তু শেষের অক্ষরটা মাইল খানেক টেনে নিয়ে যেতে কোনো দিনই ভুল হবে না।

পাছে ভুলে যাই, একটা কাগজে কথাগুলো লিখে নিলাম। আরও অনেকগুলো চলতি কথাও ঐ সঙ্গে টুকে রাখলাম।

হরকি বললে—মেয়েটা আপনার জন্যে একেবারে পাগল। বলে কি জানেন ? বাবু যদি কোনও দিন আমাকে বিয়ে করতে চায়, আমি যৌতুকই চাইবো না।

অবাক হয়ে বললাম—সে কি!

—সত্যি বাবু। কোনো সুন্দরী মগ মেয়ে যদি কাউকে বলে—তুমি যদি আমায় বিয়ে করো আমি কোনো যৌতুকই চাইবো না। এটা যে পুরুষের পক্ষে কতো বড় সম্মান ও গৌরব তা আপনি হয়তো বুঝবেন না বাবু। কোনও মগের ছেলে হলে আহ্লাদে দম ফেটেই মরে যেতো।

দম ফেটে মরিনি সত্যি, কিন্তু খুশি হইনি একথা বললে মিথ্যা বলা হবে। একটু চুপ করে থেকে বললাম—কাল তুই এক ফাঁকে ওকে বলে দিস হরকি, ও যেন দু'বেলাই জল নিতে আসে। ওকে না দেখলে সে দিনটাই আমার বিশ্রী লাগে।

হরকি বললে—তার চেয়ে এক কাজ করুন বাবু। আর সাত আটদিন বাদেই চৈত্র-সংক্রান্তি। জাদিমুরায় ভগবান বুদ্ধের উৎসব। ঐ দিন সকাল থেকেই অবিবাহিতা ছেলেমেয়ের দল সেজেগুঁজে মন্দিরে গিয়ে জড়ো হবে। তারপর ভগবান বুদ্ধের মূর্তির সামনে পরস্পরে প্রেম নিবেদন করে বিয়ের প্রস্তাব করবে। আপনি আর মাথিনও চলুন না বাবু।

বললাম—কিন্তু ওদের ঐ পবিত্র ধর্মমন্দিরে আমাকে ঢুকতে দেবে কেন?

হরকি হেসে ফেললে—আপনি কিছুই জানেন না বাবু। একমাত্র মুসলমান ছাড়া সব জাতই ওখানে ঢুকতে পারে আর বিয়ের প্রস্তাবও করতে পারে।

মনে পড়লো প্রথম দিন হরকিকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড় দেখেছিলাম, তার উপরই হলো বুদ্ধের মন্দির—জাদিমুরা। এখনও মনে আছে কেমন একটা শান্ত মৌন স্তব্ধতা পাহাড়টার চারদিকে বেড়ার মতো ঘিরে রয়েছে।

মহা উৎসাহে হরকি বলে চললো—সারা বছর ধরে মগী ছেলেমেয়েরা ঐ দিনটির পানে অধীর আগ্রহে চেয়ে থাকে। সকাল থেকে মেয়েরা দামী রেশমী লুঙ্গি ফতুয়া ওড়না পরে যত্ন করে বাঁধা খোঁপায় রঙ-বেরঙের ফুল গুঁজে ঐ আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে পাহাড়ে উঠতে থাকে। সঙ্গে থাকে নতুন পোশাকপরা স্বাস্থ্যবান মগী যুবার দল, চাইলে চোখ ফেরানো যায় না বাবু।

অবশেষে তাই ঠিক হলো। হরকিকে শুধু বলে দিলাম কথাটা এখন গোপন রাখতে। এমন কি মাথিনকেও বলতে মানা করে দিলাম। ঠিক হলো চৈত্র-সংক্রান্তির দিন দুই আগে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে হরকি একটা নতুন রেশমী লুঙ্গি আর ফতুয়া এনে দেবে আর মাথিনকেও জানিয়ে দেবে। আমার একান্ত ইচ্ছা চৈত্র-সংক্রান্তির আগে ব্যাপারটা কেউ না জানতে পারে, বিশেষ করে সতীশ। কি জানি হয়তো সব ভণ্ডুল করে দেবে, ওর অসাধ্য কাজ নেই।

হরকির উৎসাহ দেখে কে! বললে—কচি কলাপাতা রঙের রেশমী লুঙ্গি, ফিকে গোলাপী রেশমী ফতুয়া, আর মাথায় পাতলা সিল্কের রুমাল। আপনাকে যা দেখতে হবে বাবু, ওঃ! মগী ছেলের দল নির্ঘাৎ হিংসায় ফেটে মরে যাবে। এই বলে উত্তেজিতভাবে হরকি টেবিলের উপর মারলো এক বিরাট কিল। ফলে চওড়া মুখ দোয়াত থেকে এক ধাবড়া ব্লু-ব্ল্যাক কালি ছিটকে গিয়ে পড়লো হরকির মুখে। নিমেষে সব উৎসাহ নিবে গেল। বিচিত্র মুখে বেকুবের মতো আমার দিকে চেয়ে রইলো হরকি। আর আমি হাসিতে দম ফেটে চেয়ার শুদ্ধ উল্টে পড়তে গিয়ে কোনো রকমে টাল সামলে টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

রাত্রে খেতে বসে অন্যমনস্কভাবে অনেকগুলো ভাত খেয়ে ফেললাম।

বিছানায় ছটফট করছি, ঘুম আর আসে না। কখনও ভাবি বিয়ের পর মাথিনকে আমি শেখাবো বাঙলা আর মাথিন আমায় শেখাবে মগী ভাষা। সে যা মজা হবে! আবার ভাবি, এখানেই সারা জীবন কাটিয়ে দেবো কিসের জন্য? মাথিনকে নিয়ে কলকাতায় চলে যাবো। চোখের সামনে ফুটে উঠলো আমাদের ছোট্ট মধ্যবিত্ত সংসার। উৎসাহে একটু ভাঁটা পড়লো। বাবা মা মাথিনকে ভালো মনে গ্রহণ করবেন কি? মা পারবেন না এটা ঠিক। চোখের সামনে ভেসে উঠলো বাবার শান্ত সৌম্য মুখখানা—বুকে খানিকটা বল পেলাম। বুঝলাম বাবার আশীর্বাদ থেকে আমরা বঞ্চিত হবো না। গরম লাগছিল, উঠে পশ্চিম

নির্জন স্থানে গিয়ে বললে, 'বসুন বাবু।' কোনো দিকে না তাকিয়ে পথের পাশে ধুলোর উপরেই বসে পড়লাম, সামনে উবু হয়ে বসলো হরকি।

সোজা জিজ্ঞাসা করলাম—আজ সন্ধ্যাবেলা মাথিন এল না কেন?

—আসবে কি করে! ঘরে বন্ধ করে রাখলে কেউ আসতে পারে? কেঁদে কেঁদে চোখ দুটো ফুলে গিয়েছে মেয়েটার!

প্রথমটা বিস্ময়ে কথা কইতে পারলাম না। একটু পরে বললাম—ঘরে বন্ধ করে রেখেছে! কে? কেন?

একটু চুপ করে থেকে হরকি বললে—এখনও বুঝতে পারেননি বাবু? সব কিছুর মূলে আছে ঐ শয়তান বেটা সতীশ।

—সতীশ মাথিনকে ঘরে বন্ধ করে রেখেছে?

এতো দুঃখের মধ্যেও হেসে উঠলো হরকি। বললে—নাঃ, আপনি দেখছি পাগল হয়ে যাবেন। সতীশ বন্ধ করবে কেন? সতীশ ব্যাটা আজ ক'দিন থেকেই আপনাদের লক্ষ্য করছিল। আজ সকালে সে মাথিনের বাবা ওয়াং থিনের সঙ্গে দেখা করে সব বলে এসেছে। আরও বলেছে আপনার স্বভাব চরিত্র নাকি খুব খারাপ। চট্টগ্রামে কি একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারি করেছিলেন, যার জন্যে বড় সাহেব রেগে আপনাকে এখানে বদলি করেছেন। শালা ভালো কারুর করবে না, মন্দ করতে পেলে নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়।

খুন চেপে গেল মাথায়। বললাম—আমায় একটা মগী লম্বা দা' যোগাড় করে দিবি হরকি? ওকে আমি কেটেই ফেলবো।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি ধরে বসিয়ে দিয়ে হরকি বললে—কি সব ছেলেমানুষী করছেন বাবু। আগে সবটা শুনুন। মাথিনের বাবাকে আমি সব খুলে বলে এসেছি যে, বাবুর আমাদের কোনো খারাপ মতলব নেই। চৈত্র-সংক্রান্তির দিন জাদিমুরায় মাথিনকে উনি বিয়ের প্রস্তাব করবেন। তারপর একটা ভালো দিন দেখে বিয়ে করবেন। এসব বলার পর তবে ঠাণ্ডা হলো। কিন্তু মাথিনকে আর জল নিতে আসতে দেবে না।

অসহায়ভাবে বললাম—তাহলে উপায়?

—ভালোই হলো বাবু। ক'টা দিন কোনোরকমে চোখ কান বুজে কাটিয়ে দিন, তারপর চৈত্র-সংক্রান্তির পর যখন-তখন ওদের বাড়ি যেতে পারবেন। সতীশ ব্যাটা তখন জ্বলে পুড়ে মরবে।

থানায় চলে এলাম। রাত্রে শুয়ে ঘুম এল না। সতীশ তাহলে মিসেস মুলাগুের ব্যাপারটা বিকৃত করে মাথিনের বাবাকে লাগিয়েছে। মাথিনের কানেও ব্যাপারটা নিশ্চয় পৌঁচেছে। সে কী ভাবছে কে জানে। ঠিক করলাম বিয়ের পর সবার আগে মাথিনের ঐ ভুল ধারণাটা ভেঙে দিতেই হবে।

আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙলো অনেক বেলায়। উঠবার তাড়া আজ আর নেই। চোখ বুজে শুয়ে গত রাত্রের বিচ্ছিন্ন ঘটনার জটগুলো খুলতে শুরু করে দিলাম। আচ্ছা, হরকি যে বললে—বিয়ের প্রস্তাব করলে এবং মাথিন মত দিলে যখন-তখন ওদের বাড়ি যেতে পারবো। গিয়ে কি করবো আমি? ওদের বাড়ি গিয়ে মাথিনের মুখের দিকে নীরবে চেয়ে বসে থাকাটা ঠিক হবে কি? ভাষা জানি না, কিছু জিজ্ঞাসা করলে জবাবও দিতে পারবো না। উপায়? প্রথম প্রথম কয়েক দিন হরকিটাকে সঙ্গে নিয়ে যাবো ইণ্টারপ্রেটারের কাজ করবে। সহজ মীমাংসায় মন খানিকটা হাল্কা হলো।

সতীশ মিসেস মুলাগুের ব্যাপারটা শুনলো কি করে? তখনই মনে পড়লো সারা চিটাগং শহর যে খবর জানে, সতীশের মতো ধড়িবাজ লোকের পক্ষে সেটা শোনা মোটেই আশ্চর্য নয়। চিন্তায় বাধা পড়লো। বাইরে থেকে কে যেন দরজার কড়া নাড়ছে। উঠে দরজা খুলে দেখি সর্বাঙ্গে চন্দনের ফোটা কেটে কনস্টেবল বিশ্বেশ্বর পাঁড়ে। কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বিশ্বেশ্বর বললে—শিগ্গির একবার থানায় আসুন। বড়বাবু ডাকছেন।

কি এক অজানা আশঙ্কায় মনটা চঞ্চল হয়ে উঠলো। ভয়ে ভয়ে থানায় ঢুকে দেখি লোকে লোকারণ্য। মহেন্দ্রবাবু চেয়ারে বসে আছেন, পাশে দাঁড়িয়ে সতীশ। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে রমেশ, হরকি, বিশ্বেশ্বর, মহবুব এবং আরও তিন চারজন কনস্টেবল। তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিরাটকায় এক মগ, সর্বাঙ্গে রক্তমাখা। হাতে একখানা বিরাট দা' রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে।

সামনে একটা প্রকাণ্ড জালার মতো মাটির হাঁড়ি বড় বড় করে কাটা মাংসের টুকরোয় ভর্তি। তার উপর রয়েছে একটি মগ মেয়ের রক্তমাখা এলিয়ে পড়া খোঁপা। মাথা ঘুরে গেল। তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে ঝুপ করে বসে পড়লাম। কি একটা লিখতে লিখতে মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে মহেন্দ্রবাবু বললেন—ছ্যাখো ফ্যাসাদ! যতীন নেই এখন কি যে করি! আবার রিপোর্ট লিখতে শুরু করলেন মহেন্দ্রবাবু। ইচ্ছে হচ্ছিলো জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, আওয়াজ বেরোলো না। কাঠের চেয়ারটার হাতল জোর করে চেপে ধরে চুপ করে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে মহেন্দ্রবাবুর কাছে ব্যাপারটা শুনলাম। আওলিং বলে ঐ বিরাটাকার মগটি দিন মজুরি করে খায়। কাজের জন্য মাঝে মাঝে ওকে নাফ নদী পেরিয়ে আকিয়াবেও যেতে হয়। সেখানে ইয়াসুল বলে একটি মুসলমান ছেলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়। তারই সুযোগ নিয়ে ইয়াসুল মাঝে মাঝে টেকনাফে এসে আওলিং-এর সুন্দরী যুবতী স্ত্রী মাও তুং-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা শুরু করে এবং কিছুদিন বাদে তু'জনেই পরস্পরের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। আওলিং-এর সন্দেহ হয় অনেকদিন আগে থেকেই, কিন্তু হাতে-নাতে ধরতে না পেরে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। গতকাল সুযোগ এসে গেল। মজুরি খাটতে নদী পেরিয়ে আকিয়াবে আসতেই ইয়াসুলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আওলিং-এর। ইচ্ছে করেই আওলিং তাকে বললে যে, সে কাজ নিয়ে বাইরে যাচ্ছে, বাড়ি ফিরতে তু'দিন লাগবে। কিছু পরে একটা বাজে অছিলায় সরে পড়লো ইয়াসুল। আওলিংও গাছ কাটবার করাত ও দা' নিয়ে ঢুকে পড়লো আরাকান হিলস্-এ। তারপর সকলের অলক্ষ্যে একটা লম্বা গাছের মাথায় উঠে পাতার আড়ালে লুকিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগলো। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আওলিং দেখলে চোরের মতো চারদিক চাইতে চাইতে ইয়াসুল ছোট্ট একখানা নৌকো নিয়ে ওপারে রওনা হলো। গাছের উপর থেকে আওলিং স্পষ্ট দেখতে পেলো সব। তারপর ইচ্ছে করেই ঘণ্টা খানেক দেরি করে অপর একখানা নৌকোয় ওপারে গিয়ে উঠলো। সোজা পথে না গিয়ে অনেক ঘুরে বাড়ি গিয়ে

দেখলে ঘরের দরজা বন্ধ। স্ত্রীর নাম ধরে জোরে ডাকতে লাগলো আওলিং, কিন্তু দরজা আর খোলে না। অধৈর্য হয়ে হাতের লম্বা দা' দিয়ে দরজা কেটে ঘরে ঢুকে দেখে উত্তর দিকের বেড়া ফাঁক করে ইয়াসুল পালিয়েছে, আর পাংশু মুখে অর্ধ উলঙ্গ মাও তুং ঘরের একটা বাঁশের খুঁটি ধরে বলির পাঁঠার মতো কাঁপছে। সঙ্গে সঙ্গে আওলিং দা' দিয়ে স্ত্রীকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললো। তারপর রক্তমাখা দা' হাতে করে ছুটলো নদীর ধারে। দেখলে ইয়াসুল নৌকোর অপেক্ষা না করেই সাঁতার দিয়ে নাফ নদী পেরিয়ে ওপারে গিয়ে উঠেছে। তারপর এদিকে নজর পড়তেই দা' হাতে আওলিংকে দেখে লোকালয় ছেড়ে ছুটে গিয়ে ঢুকলো আরাকান হিলস্-এর গভীর জঙ্গলে। বাড়ি ফিরে একটা প্রকাণ্ড মাটির জালায় কাটা মাংসগুলো তুলে ঘাড়ে করে থানায় এসে সব স্বীকার করে রাজার আইনের শাস্তির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে।

সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গিয়েছিল। পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাম মুছে ভয়-বিস্ফারিত চোখে আওলিং-এর দিকে চেয়ে বসে রইলাম।

আমার দিকে ফিরে চুপি চুপি মহেন্দ্রবাবু বললেন—ব্যাটা যদি পালিয়ে কিছু দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতো, তাহলে নিজেও বাঁচতো আমরাও বাঁচতাম। কিন্তু এখন তো কেস টেক-আপ না করে উপায় নেই। তুমি তো একেবারে নতুন, আনাড়ি। মার্ডার কেস কণ্ডাক্ট করতে পারবে না। যতীন থাকলে তাকেই পাঠাতাম। আমি গেলে চলবে না। একটু ভেবে বললেন, —সতীশ! তুমিই আওলিংকে সঙ্গে নিয়ে কক্সবাজার রওনা হয়ে পড়ো। সঙ্গে বিশ্বেশ্বর আর মহবুবকে নিয়ে যাও।

ভাবলেশহীন মুখে সতীশ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ঘণ্টা খানেক বাদে নরমাংসের জালাটা আওলিং-এর মাথায় চাপিয়ে তার কোমরে একটা শক্ত মোটা দড়ি বেঁধে কনস্টেবলের ইউনিফর্ম পরে বিশ্বেশ্বর আর মহবুব দু'পাশের সেই দড়ি ধরে হাঁটতে শুরু করলো। সবার পিছনে কাপড়টা হাঁটুর ওপর তুলে নম্বর দেওয়া খাঁকি কোটটা গায়ে দিয়ে এক হাতে ছাতি আর লাঠি অপর

হাতে বন্দুক নিয়ে এক অপরূপ ভঙ্গিতে চললো সতীশ। মনে হলো, পচে ফুলে ওঠা একটা মৃতদেহ নদীর তীর ঘেঁষে আস্তে আস্তে ভেসে চলেছে, আর তারই উপর লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে লাফাতে লাফাতে চলেছে একটি বয়স্ক শকুন।

খেতে বসে এক গ্রাস ভাতও মুখে তুলতে পারলাম না দুপুর বেলা। সকালের বীভৎস দৃশ্যটা খালি চোখের উপর ভেসে ওঠে। কিছু না খেয়েই উঠে পড়লাম। রমেশ এক বাটি দুধ এনে দিলে, কোনোরকমে চোখকান বুজে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসে না, ছটফট করে কাটাই। মাথিনের কথা ভাবতে চেষ্টা করি, সঙ্গে সঙ্গে রক্তমাখা দা' হাতে বিরাটকায় আওলিং এসে সামনে দাঁড়ায়—মাথিন ভয়ে পালিয়ে যায়। চারটে বাজবার আগেই উঠে পড়লাম। কাপড় জামা পরে কোঁকড়ানো বাবরি চুলগুলো ভালো করে আঁচড়ে বেড়িয়ে পড়লাম। থানার পুবদিকের বারান্দায় বেঞ্চির উপর হরকি বসেছিল লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ ডাক শুনলাম—বাবু।

দাঁড়াতেই কাছে এসে বললে—এতো রোদ্দুরে কোথায় চললেন বাবু?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম—কিছু ভালো লাগছে না হরকি, তাই একটু বেড়াতে বার হলাম। আয় না সঙ্গে!

দ্বিরুক্তি না করে সঙ্গ নিলো হরকি। সবেমাত্র একটু এগিয়েছি, হরকি বললে—আপনার ভাগ্য খুব ভালো বলতে হবে বাবু!

সঙ্গে সঙ্গে চলা থেমে গেল। জিজ্ঞাসা করলাম—কেন বল তো?

—ব্যাটা সতীশের হাত থেকে তো পাঁচ-সাত দিনের মতো রেহাই পেলেন। আমি বলছি বাবু ও থাকলে চৈত্র-সংক্রান্তির মধ্যেই একটা অনর্থ বাঁধিয়ে সব পণ্ড করে দিতো।

ভেবে দেখলাম হরকি সত্যি কথাই বলেছে। আজকের

ঘটনায় অন্ততঃ সে দিক দিয়ে আমার মস্ত লাভ হয়েছে বলতে হবে। অকারণে মনটা খুশি হয়ে উঠলো। বললাম—চল হরকি, আজ জাদিমুরার ওদিকটা বেড়িয়ে আসি।

লোকালয় ছেড়ে চিটাগং হিলস্-এর প্রায় গা ঘেঁষে ছোট্ট পাহাড়টা যেন শান্তির কোলে ঘুমিয়ে আছে। ঐখানটায় এলেই চঞ্চল মন আপনা হতেই শান্ত হয়ে আসে। কোনো কথা না বলে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম।

হরকি বললে—উপরে উঠবেন না বাবু?

বললাম—আজ না। চৈত্-সংক্রান্তির দিন উঠবো।

কতোক্ষণ চোখ বুজে শুয়েছিলাম মনে নেই। হরকি বললে—বাড়ি চলুন বাবু, রাত হয়ে গিয়েছে। অগত্যা থানার দিকে রওনা হলাম।

বাজারে এসে হরকি বললে—আপনি এগিয়ে যান, আমি মাথিনের ওখানটা ঘুরে আসি।

বাড়ি ফিরে এসে অন্ধকার বারান্দার কাঠের চেয়ারটায় চুপ করে বসে আছি। আধঘণ্টা বাদে হরকি ফিরে এল। মাথিনের খবর জানবার জন্য মন আকুলিবিকুলি করলেও মুখে কিছুই বললাম না। কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো।

হরকিই প্রথমে কথা বললে—কি ভাবছেন বাবু?

কোনো জবাব না দিয়ে একটা সিগারেট ধরালাম। আমার দিকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে হরকি বললে—আমাকে একটা দিন বাবু। যদিও যা খবর এনেছি তাতে এক সের সন্দেশ খাওয়ানো উচিত।

সিগারেট দিয়ে হেসে বললাম—হরকি, হয় তুই সব চেয়ে বোকা নয় তো সতীশের চেয়েও শয়তান।

অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে হরকি বললে—কেন বাবু?

বললাম—মাথিনের খবরটা বলবার জন্য তুই যে ছটফট করছিলি তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। আর একটু অপেক্ষা করলে সিগারেট বা সন্দেশ না খাওয়ালেও তুই সব গড়গড় করে বলে ফেলতিস তাও জানি। সেইজন্য তোকে বোকা বললাম। আর শয়তান বলছি এই জন্য যে, মাথিনের ব্যাপারটা হয় তো

কিছুটা সত্যি, বাকিটা তোর রঙ ফলানো। আমায় নিয়ে খানিকটা নাচাচ্ছিস।

হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো হরকি। অন্ধকারেও দেখতে পেলাম ওর চোখ দুটো যেন জ্বলছে। মনে মনে ভয় পেয়ে গেলাম। উত্তেজিতভাবে হরকি বললে—বাবু! পুলিসের চাকরি করি। মিথ্যা কথা ছল চাতুরি অনেক সময় বাধ্য হয়ে করতে হয়, কিন্তু ভগবান তথাগতের নাম নিয়ে কবুল করছি, আজ পর্যন্ত আপনাকে কোনো মিথ্যা বলিনি, বলতে সাহসও করিনি। এ কথাটা সব সময় মনে রাখবেন।

সত্যিই লজ্জা পেলাম। বললাম—আজ ক'দিন ধরে কি জানি কেন মনটা খুব চঞ্চল হয়ে আছে হরকি, কাউকে যেন বিশ্বাস করতে পারছি না। এই টেকনাফে তুই আমার শেষ অবলম্বন। তাই শেষবারের মতো তোকে যাচাই করে নিলাম। অজান্তে যদি তোর মনে ব্যথা দিয়ে থাকি তো তুই আমায় ক্ষমা করিস হরকি। উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে হরকির হাত দুটো চেপে ধরলাম। গলাটাও ধরে এসেছিল, আর কিছু বলতে পারলাম না। খানিকক্ষণ ঐভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঠাণ্ডা হয়ে হরকি বললে—বসুন বাবু।

চেয়ারে বসে পড়লাম, হরকি দাঁড়িয়ে রইলো। একটু পরে বললে—আমার মাথায় খুন চেপে গেল কেন জানেন? ঐ শয়তান সতীশের সঙ্গে আমার তুলনা করলেন বলে। আপনি হয় তো জানেন না বাবু টেকনাফে কেউ ওকে দেখতে পারে না। বড়বাবুর পেয়ারের লোক বলে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। নইলে—

বাধা দিয়ে বললাম,—এখন সতীশের কথা থাক, তুই মাথিনের কথাই বল।

একটু চুপ করে থেকে হরকি বললে—ওর সব ছেলেমানুষী দেখলে হাসি পায়। আজ আমি যেতেই হাত ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল উপরে। তারপর চুপি চুপি বললে—হরকিদা', তোমাদের থানার নতুন বাবু তো বাঙালী হিন্দু। ওদের মেয়েরা তো শাড়ি পরে।

অবাক হয়ে বললাম—হ্যাঁ, তাতে কি হলো?

মাথিন বললে—ভাবছি, আমাদের লুঙ্গি বাবুর যদি পছন্দ না হয়, তাহলে ?

আমি গম্ভীর হবার ভান করে বললাম—তাই তো, সত্যিই ভাবনার কথা।

মাথিন বললে—তুমি আমার একটা উপকার করবে হরকিদা' ? আমায় লুকিয়ে একখানা শাড়ি কিনে এনে দেবে ? এখানে দিনের বেলায় শাড়ি আমি কিছুতেই পরতে পারবো না, সবাই ঠাট্টা করবে। রাতে সবাই ঘুমুলে ঐ শাড়ি পরে আমি ওঁর কাছে যাবো। দেখো কিন্তু কথাটা কাউকে বলো না। তোমাদের নতুন বাবুকেও না। বিয়ের দিন রাত্রে শাড়ি পরে ওঁর কাছে গিয়ে ওঁকে চমকে দেবো।

এই বলে একখানা সিল্কের রুমালে বাঁধা পাঁচটা টাকা আমায় দিয়ে বললে—এই দেখুন বাবু।

রুমালের খুঁট খুলতে দেখা গেল পাঁচটা চকচকে রূপোর টাকা। চোখে জল এসে গিয়েছিল। অন্ধকারে হরকি দেখতে পেলে না। ধরা গলায় বললাম,—বলতে মানা করেছিল যদি, বললি কেন ?

হাল্কা হাসিতে ফেটে পড়ে হরকি বললে—এসব কথা ও আপনাকে বলতে বারণ করে দিয়েছিল। তার মানে দেখা হলেই যেন বলি। বুঝলেন না বাবু ? আবার হাসে হরকি।

চুপ করে থাকি, কথা খুঁজে পাই না। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করি—তুই বিয়ে করেছিস হরকি ?

—হুঁ।

—ছেলে পিলে আছে ?

—হুঁ, এক ছেলে এক মেয়ে।

—কোথায় তারা ?

—কেন বাড়িতে, বাবা-মা'র কাছে।

আবার চুপ করে থাকি। কিছু পরে হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করি—তোর বিয়ের সময় বউ কি যৌতুক চেয়েছিল রে ?

চিৎকার করে হেসে উঠলো হরকি। একটু পরে হাসির বেগ

কমলে একটু রেগেই জিজ্ঞাসা করি—হাসির কথাটা কি বললাম।

গম্ভীর হয়ে হরকি বললে—আপনি আমাকে কি ভেবেছেন বলুন তো ? মগ ?

অবাক হয়ে বলি—হ্যাঁ ! নয় তো কি ?

হরকি বললে,—আমি বাঙালী। বাড়ি আমার চট্টগ্রাম জেলায়। তবে হ্যাঁ, ধর্মটা আমাদের এক। মগদের সঙ্গে শুধু ঐটুকু আমাদের মিল। নইলে আচার-ব্যবহারে, ভাষায়, সামাজিকতায় কোনো দিক দিয়েই মেলে না। আর একটি কথা জেনে রাখুন বাবু। মগদের মধ্যে 'বড়ুয়া' পদবী নেই।

একেবারে বোকা বনে গেলাম। এতোদিন হরকিকে আমি মগ বলেই জেনে এসেছি। তাছাড়া এই সেদিন সতীশও ওকে মগ বলেই আমার কাছে বলেছে। বললাম—কিন্তু হরকি, মাথিনের ব্যাপারে সেদিন সতীশ পরিষ্কার বললে—

মুখের কথা একরকম কেড়ে নিয়ে হরকি বললে—জানি বাবু, ব্যাটা আমাকে রাগাবার জন্য মগ বলে সবার কাছে পরিচয় দেয়। প্রথমত আমি মগী ভাষা ভালোরকম জানি, তারপর এখানকার মগ ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমি অবাধে মেলামেশা করি। সবাই পছন্দও করে। সতীশ ব্যাটা হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরে।

যাক, এতোদিন পরে একটা বিশ্রী ভুলের সংশোধন হলো।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। খাওয়া দাওয়া করতে হরকি উঠে গেল। আমি ঠায় অন্ধকারে চেয়ারটার উপর বসে রইলাম। কিছুক্ষণ বাদে রমেশ খাবার জন্য ডাকতে এল। উঠতে যাবো—দেখি কোলের উপর পড়ে আছে মাথিনের সেই ছোট্ট সিল্কের রুমালখানা, টাকা পাঁচটা হরকি নিয়ে গিয়েছে। একবার ভাবলাম হরকি সত্যি এটা নিতে ভুলে গিয়েছে না ইচ্ছে করেই—! যাই হোক রুমালটা যত্ন করে পকেটে রাখলাম।

রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে সেই ছোট্ট রুমালটা বুকে নিয়ে শুয়ে কল্পনায় শাড়ি পরা মাথিনের দিকে অপলক চোখে যতোক্ষণ

পারি চেয়ে থাকি। গাঢ় ঘুমে ক্লান্ত চোখের পাতা ছুটো আস্তে আস্তে বুজে আসে।

সকালে বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম। চৈত্র-সংক্রান্তির আর মাত্র ছু'দিন বাকি। রমেশ জানিয়ে গেল থানা-ঘরে মহেন্দ্রবাবু ডাকছেন। ভাবলাম এতো সকালে মহেন্দ্রবাবু থানা ঘরে? আওলিং-এর মতো আর একটা কেস এসে গেল নাকি? আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে থানায় ঢুকে দেখি খাকি হাফ প্যান্ট, সাদা টুইলের হাফ সার্ট, পায়ে খাকি মোজা ও সাদা ক্যাম্বিসের জুতো পরে খাকি সোলার হ্যাটটা টেবিলের উপর রেখে আমারই বয়সী একটি লোক মহেন্দ্রবাবুর সঙ্গে গল্প করছে।

মহেন্দ্রবাবু বললেন,—এসো, পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন 'নীলা'র আবগারি সাব-ইন্সপেক্টর আবছুল মজিদ সাহেব, আর এই হচ্ছে ধীরাজ যার কথা আপনাকে এতোক্ষণ ধরে বলছিলাম।

কিছু বলবার আগেই দেখি হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়েছেন মজিদ সাহেব। তারপর আমার হাত ছুটো জড়িয়ে ধরে বললেন—আমিও এখানে একেবারে নতুন ধীরাজবাবু। আজ সপ্তাহখানেক হলো 'নীলা'য় এসেছি। না বুঝি এদের কথাবার্তা না বুঝি কাজকর্ম। কি বিপদেই যে পড়েছি ভাই।

চমৎকার লাগলো মজিদ সাহেবকে। বহুদিন এমন দিলখোলা শিক্ষিত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য হয়নি। বললাম—বস্থন! এদিকে বেড়াতে এসেছেন বুঝি?

উত্তরটা দিলেন মহেন্দ্রবাবু। বললেন—না। উনি একটা কেসের জন্য বাধ্য হয়ে এখানে এসেছেন। তুমি হয়তো জানো না আবগারি কোনো কেসে সার্চ করতে হলে সঙ্গে একজন থানা অফিসার দরকার। থানা অফিসার সঙ্গে না নিয়ে আবগারি পুলিসের সার্চ করবার ক্ষমতা নেই। 'নীলা' থেকে বারো চৌদ্দ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে মরিআলা গ্রামে শুধু মুসলমানের বাস। ঐ গ্রামেরই একজন মুসলমান বকশিসের

লোভে নীলায় আবগারি আপিসে খবর দিয়েছে যে, গ্রামের সবাই সমুদ্রের জল জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি করে হাটবারে নীলায় এসে বিক্রি করে যায়। বহুদিন ধরে এটা চলছে, প্রথমে আবগারি পুলিস বিশ্বাস করতে চায়নি। লোকটা কান্নাকাটি অনুনয় বিনয় শেষ পর্যন্ত আল্লার নামে শপথ করে বললে যে, সে যা বলছে সবই সত্যি। এমন কি সে নিজে সঙ্গে গিয়ে হাতেনাতে ধরিয়ে দিতেও প্রস্তুত। অগত্যা আবগারিকে কেসটা টেক-আপ করতেই হলো।

চারদিক চেয়ে মজিদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি একাই এসেছেন ?

হেসে জবাব দিলেন মজিদ সাহেব—না, গাঁয়ের সেই বিভীষণটিই আমাকে পথ চিনিয়ে এনেছে। গরজটা যেন তারই সব চাইতে বেশি। দেখবেন জীবটিকে ? ঐ যে, বারান্দায় বসে আছে। একথা বলেই তিনি হাঁক দিলেন—বাচ্চা !

দেখলাম তিরিশ বছর বয়েসের একটি রোগা মুসলমান ঘরে ঢুকে সেলাম করে হাত জোড় করে দাঁড়ালো। কি জানি কেন এক নজর দেখেই মনটা ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরে গেল।

মজিদ সাহেব মহেন্দ্রবাবুকে বললেন—আপনিই সব জিজ্ঞাসা করুন। আমি ওর কথা একদম বুঝতে পারি না।

মগী আর চট্টগ্রামী বাংলায় মেশানো এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি ভাষায় কি সব জিজ্ঞাসা করলেন মহেন্দ্রবাবু, লোকটাও চটপট জবাব দিয়ে গেল। কথা শেষে আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মজিদ সাহেব—বুঝলেন কিছু ? মাথা নেড়ে জানালাম—না।

শিশুর মতো খিল খিল করে হেসে উঠে মজিদ সাহেব বললেন—আমিও না।

মহেন্দ্রবাবু বললেন,—তাহলে মজিদ সাহেব ঐ কথাই রইলো আপনি দুপুরে আমার বা ধীরাজের ওখানে খাওয়া দাওয়া করে নিন তারপর বেলা দুটোর স্টীমারে রওনা হলে বেলা চারটের মধ্যে নীলায় অনায়াসে পৌঁছতে পারবেন। তুমিও তৈরি হয়ে নাও ধীরাজ। মজিদ সাহেবের সঙ্গে যাবে।

হঠাৎ আকাশ ভেঙে পড়লো মাথায়। বললাম—আমি ?

মহেন্দ্রবাবু বললেন—হ্যাঁ। এতোক্ষণ শুনলে কি তবে ? থানা থেকে একজনকে সঙ্গে না নিলে ওঁর যাওয়া না যাওয়া সমান হবে। নীলা থেকে মাত্র দশ বারো মাইলের পথ। দু'দিনের মধ্যে কাজ সেরে অনায়াসে ফিরে আসতে পারবে।

পাংশুমুখে টেবিলের একটা কোণ নখ দিয়ে খুঁড়তে লাগলাম।

আমার হঠাৎ এরকম ভাবান্তরে মজিদ সাহেব বেশ বিস্মিত হয়েছেন বুঝলাম। বললেন—এখান থেকে দু'দিনের জন্য বাইরে গেলে আপনার খুব ক্ষতি হবে কী ধীরাজবাবু ?

কী উত্তর দেবো। শুধু মজিদ সাহেবের দিকে একবার চেয়ে মুখ নিচু করে বসে রইলাম।

মহেন্দ্রবাবু বললেন—ছাই ক্ষতি হবে। শোনো ধীরাজ, ছেলেমানুষী করো না। লবণ চুরির ব্যাপারটা যা শুনলাম তাতে কেসটা ভালো বলেই মনে হলো। ধরতে পারলে কনভিকশান হবেই। ভালো রিওয়ার্ড পাবে তা ছাড়া সার্ভিস বুকে একটা লাল কালির আঁচড়ও পড়বে। এতোদিন ধরে আই. বি'তে চাকরি করেছো সার্ভিস বই তো শুনতে পাই ব্ল্যাঙ্ক, ব্ল্যাঙ্ক। মজিদ সাহেবের দিকে চেয়ে হেসে উঠলেন মহেন্দ্রবাবু। কিন্তু মজিদ সাহেব হাসলেন না। আমার দিকে চেয়ে বসে আছেন। এবার বেশ একটু উষ্মা প্রকাশ করেই বললেন মহেন্দ্রবাবু—যতো সব ছেলেমানুষী। ওরা মনে করে আমি কিছুই খবর রাখিনে। জানেন মজিদ সাহেব ? ধীরাজের প্রধান কাজ হচ্ছে রোজ সকাল-বিকেল বারান্দায় বসে মগ মেয়েদের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা। তা থাকো কিন্তু সরকারের কাজের ক্ষতি করে ওসব ছেলেখেলার আমি প্রশ্রয় দিতে পারি না। যাও, খেয়ে দেয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নাও।

গম্ভীরভাবে কথাগুলো বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মহেন্দ্রবাবু! টেবিলের দু'পাশে চুপ করে বসে রইলাম আমি আর মজিদ সাহেব। একটু পরে দেখি চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশে দাঁড়িয়েছেন তিনি। একখানা হাত আস্তে আস্তে আমার

কাঁধের উপর রেখে জিজ্ঞাসা করলেন—যদি আপত্তি না থাকে ব্যাপারটা আমায় বলবেন ?

মাত্র কয়েক মিনিটের পরিচয়, তবুও মনে হলো একে আমি বিশ্বাস করতে পারি। অন্ততঃ এই মানুষটি ব্যাপারটা ছেলেখেলা বলে উড়িয়ে দেবে না। একে একে সব বলে গেলাম—মাথিনের কথা, চৈত্র-সংক্রান্তির দিনটির কথা, সবই আমি তাঁর কাছে স্বীকার করলাম। শুনে খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন মজিদ সাহেব। তারপর বললেন—আপনার অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি ধীরাজবাবু। কিন্তু আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন ? মাত্র দশ-বারো মাইল পথ। আমি কথা দিচ্ছি, আজ রাত্রেই আমরা নীলা থেকে রওনা হয়ে পড়বো এবং কালকের মধ্যেই কাজ শেষ করে রাত্রে নয় তো বড় জোর পরশু সকালের মধ্যে আপনি নিশ্চয় এখানে ফিরে আসতে পারবেন।

খানিকটা ভরসা পেলাম, মজিদ সাহেবকে নিয়ে কোয়ার্টার্সে চলে এলাম। এ ছাড়া আর উপায়ই বা কী ছিল।

খাওয়া দাওয়া সেরে বেরোতে আমাদের একটা বেজে গেল। ঠিক ছুটোয় স্টীমার। থানা ছেড়ে একটু এগোতেই দেখি ম্লান মুখে একটা গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হরকি। একটু থেমে বললাম—মানুষের পক্ষে যদি সম্ভব হয় তাহলে পরশুর মধ্যে আমি ফিরবোই। যদি না পারি মাথিনকে সব বুঝিয়ে বলিস, যেন আমায় ভুল না বোঝে। কোনো জবাব না দিয়ে চুপ্ করে রইলো হরকি।

ছোট্ট স্টীমার। নাফ নদীর মাঝখান দিয়ে আস্তে আস্তে চলেছে। রেলিঙ ধরে টেকনাফের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনের অবস্থা বুঝে মজিদ সাহেবও কথাবার্তা বলবার চেষ্টা করলেন না। মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম।

নীলায় পৌঁছবার আগে তিনটে জায়গায় স্টীমার থামে। প্রথমটার নাম মনে নেই। পরেরটা উখিয়া তারপরে মংডু সব শেষে নীলা। ওখান থেকে খানিকটা দূরে পড়ে কুতুবদিয়া থানা। টেকনাফে শুনেছিলাম যে, উখিয়া আর কুতুবদিয়া এই ছুটো

ছোটো জায়গায় বড় বড় নাম করা রাজবন্দীদের অন্তরীণ করে রাখা হতো। পরবর্তী জীবনে শুনেছিলাম যে, স্বর্গত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে এই কুতুবদিয়া থানার এলাকাতেই বহু দিন রাজবন্দীরূপে আটক থাকতে হয়েছিল।

বেলা চারটের কিছু আগেই নীলায় পৌঁছে গেলাম। স্থানীয় লোকে নীলাকে ছোটোখাটো একটা গঞ্জ বা শহর বলতো। থানা, আবগারি পুলিসের আপিস বাজার সব মিলিয়ে ছোট্ট হলেও জায়গাটা বেশ কর্মব্যস্ত চঞ্চল। আবগারি আপিসেই উঠলাম। সেখানে এসে দেখি দশ-বারোজন মগ ও মুসলমান কনস্টেবল যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। মজিদ সাহেবের মতো আমারও পরনে খাঁকি হাফ প্যান্ট, হাফ সার্ট, পায়ে মোজা ও সাদা কেড্স সু, মাথায় খাকি সোলার হ্যাট। শুধু থানা থেকে একটা পাতলা স্টিক যোগাড় করে নিলাম। শুনলাম আমাদের বেরোতে হবে রাত্রে খাওয়া দাওয়া সেরে ন'টা সাড়ে ন'টায়। আবগারি একজন বাঙালী কর্মচারীর কাছে শুনলাম দিনে বা বিকেলে মরিআলা বা আশেপাশের গ্রামের বহু লোক নীলায় কেনা বেচা করতে আসে। তাদের কেউ যদি আমাদের দেখতে পায় বা আমাদের উদ্দেশ্য জানতে পারে তা হলে সব পণ্ড হবে, রাতারাতি লবণ সরিয়ে ফেলবে। সেই জন্যে রাত্রের আঁধারে চিটাগং হিলস্-এর মধ্যে দিয়ে আমাদের গোপনে যেতে হবে।

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে পাংশু মুখে মজিদ সাহেব ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন, চমকে মুখের দিকে চাইলাম। দেখি চোখ দুটো ছল ছল করছে। সবিস্ময়ে বললাম—ব্যাপার কি মজিদ সাহেব? প্রথমটা কোনো জবাব না দিয়ে আস্তে আস্তে আমার হাত দুটো ধরে ধরা গলায় বললেন—আমায় আপনি ক্ষমা করুন ধীরাজবাবু।

হাসবো না কাঁদবো? হেসেই বললাম—টেকনাফে আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে এখনো পর্যন্ত এমন কোনো অপরাধ আপনি করেছেন বলে তো মনে পড়ে না যার জন্যে হাত ধরে ক্ষমা চাইতে হচ্ছে।

হঠাৎ রেগে উঠলেন মজিদ সাহেব। যতো সব জোচ্চোর মিথ্যেবাদীর দল, এরা জীবনে ভুলেও সত্যিকথা বলে না।

জোচ্চোর ও মিথ্যেবাদীর দলের সঙ্গে আমার বা মজিদ সাহেবের কী ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকতে পারে ভেবে যখন কোনো কূল কিনারা পাচ্ছি না তখন রূঢ় সত্য দিনের আলোর মতোই চোখের সামনে পরিষ্কার ফুটে উঠলো। স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। মজিদ সাহেব উত্তেজিত হয়ে বলতে লাগলেন—কেমন জলের মতো আমায় বুঝিয়ে দিলে দশ বারো মাইল পথ, একদিনের মধ্যেই কাজ শেষ করে চলে আসতে পারবেন। এখন শুনছি এই নীলার আবগারি আপিস থেকে মরিআলা ষাট মাইলেরও বেশি পথ। তার মানে চাররাত্রি অবিশ্রাম হাঁটলে তবে আমরা পঞ্চম দিনে মরিআলায় পৌঁছবো, কী ভয়ানক! এমন জানলে আমি চাকরি ছেড়ে দিতাম সেও ভি আচ্ছা, তবু কখনই এই অসভ্য জংলি মুলুকে প্রাণ দিতে আসতাম না।

কোনো জবাব দিলাম না, দেবার ক্ষমতাও ছিল না। আমি যেন সমস্ত অনুভূতির বাইরে এক নতুন জগতে চলে গিয়েছি। কতোক্ষণ এইভাবে ছিলাম মনে নেই, বাহ্য জগতে ফিরে এলাম মজিদ সাহেবের পরের কথায়। বললেন—যা থাকে কপালে আপনি ফিরে যান ধীরাজবাবু। আপনি বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, কিন্তু আল্লার নামে শপথ করে বলছি আমি কিছুই জানতাম না। ওরা বেশ জানতো সত্যি কথা বললে আপনি বা আমি কেউই এ এক্সপিডিশনে আসতাম না।

আমি শুধু ভাবছিলাম মহেন্দ্রবাবুর কথা। বহুদিন এ অঞ্চলে আছেন, তিনি তো সবই জানতেন। তবে?

রুদ্ধ আক্রোশে মজিদ সাহেব বলেই চললেন—রাত্তিরটা খাওয়া দাওয়া করে এখানে থেকে কাল সকালেই আপনি টেকনাফ ফিরে যান। কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলবেন পেটের অসুখ করেছিল। আমিও তাই বলবো, তারপর যা হয় হবে। চিটাগং হেড আপিস থেকে আমাকে কি বলে এখানে পাঠিয়েছে জানেন? আমাকে বললে—মজিদ সাহেব, আপনি নতুন কলকাতা থেকে আসছেন। কাজকর্ম কিছুই জানেন না। এখানে থাকলে চান্স পেতে অনেক দেরি হবে। তার চেয়ে আপনি নীলায় চলে যান, মরিআলার কেসটা শেষ করতে পারলেই মোটা রিওয়ার্ড পাবেন আর সার্ভিস

বুকেও ভালো রিমার্ক হবে। এখন বুঝতে পারছি এতো সব পাকা ঝানু লোক থাকতে আমায় রিওয়ার্ড পাওয়াবার জন্যে ওদের এতো মাথা ব্যথা কেন হয়েছিল। মিথ্যেবাদী শয়তানের দল।

এতো দুঃখের মধ্যেও মনে মনে হাসলাম। ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি—মজিদ সাহেব চট্টগ্রামে আপনার মিসেস মুলাণ্ড বলে কোনো ইংরেজ মহিলার সঙ্গে হঠাৎ আলাপের সৌভাগ্য হয়েছিল কি? অতি কষ্টে লোভ সংবরণ করলাম। জোর করে সব চিন্তা ভাবনা মন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে ডান হাতখানা মজিদ সাহেবের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—তা হয় না মজিদ সাহেব। এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া কখনও উচিত নয়। তাছাড়া এতো বড় একটা মিথ্যার মধ্যে দিয়েই তো আপনার মতো একজন সত্যিকার বন্ধু পেলাম—সেটা কি কম লাভ? চলুন যা থাকে কপালে। মরি বাঁচি একসঙ্গেই দু'জনে মরিআলায় যাবো।

পরম আগ্রহে দু'হাত দিয়ে আমার হাতখানা চেপে ধরে আনন্দোজ্জ্বল চোখে শুধু মুখের পানে চেয়ে রইলেন মজিদ সাহেব।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে দশজন কনস্টেবল ও পথ-প্রদর্শক বাচ্চাকে নিয়ে যখন আমরা আবগারি আপিস থেকে বেরোলাম, মজিদ সাহেবের হাতঘড়িতে তখন রাত দশটা বেজে গিয়েছে। নীলা থেকে বেরিয়ে বরাবর পশ্চিম মুখো হাঁটতে শুরু করলাম। সবার আগে চলেছে বাচ্চা, তার পিছনে গল্পগুজব করতে করতে চলেছে দশটি কনস্টেবল। প্রত্যেকের হাতে প্রকাণ্ড একখানা ধারালো দা' আর মশাল, মশালগুলো জ্বালা হবে চিটাগং হিলস্-এ ঢোকবার আগে। সবার পিছনে পাশাপাশি নিঃশব্দে চললাম আমি আর মজিদ সাহেব। প্রায় ঘণ্টাখানেক এইভাবে হেঁটে পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছলাম। সমতল জমি শেষ হয়ে গেল। এখান থেকে শুধু এই বিরাট চিটাগং হিলস্-এর বুকের মাঝখান দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। আগে পাহাড়

শুনলেই ভাবতাম সে শুধু পাথরেরই স্তূপ, এই প্রথম বিশাল চিটাগং হিলস্ দেখে সে ধারণা বদলে গেল। সমস্ত পাহাড়টাই মাটির, এক টুকরো পাথরও তার মধ্যে নেই। প্রকাণ্ড বড় বড় শাল, সেগুন, দেবদারু আর অসংখ্য নাম-না-জানা গাছ মাটির পাহাড়কে ঢেকে ফেলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে আকাশে মাথা তুলেছে। দিনেই ঢুকতে ভয় করে, রাত্রে তো কথাই নেই। সমতল থেকে মাটি কেটে কেটে সিঁড়ির ধাপের মতো পথ উপরে উঠে গিয়েছে, অপরিসর সরু সেই পথ ধরে দু'জন পাশাপাশি যেতে পারে না। ঐ সিঁড়ি বা পথ বেয়েই আমাদের উপরে উঠতে হবে। চট্টগ্রামের একটি বাঙালী কনস্টেবল পঞ্চু দাস মজিদ সাহেবকে আস্তে আস্তে কি জিজ্ঞাসা করলে। আমার দিকে ফিরে মজিদ সাহেব বললেন—ওরা জানতে চাইছে আর একটু বিশ্রাম নেবেন, না এখনই রওনা হবেন।

নীলা থেকে বেরিয়ে এই প্রথম আমাদের মধ্যে কথা হলো। বললাম—না না, বিশ্রামের দরকার নেই। চলুন রওনা হয়ে পড়ি।

মশালগুলো সব জ্বেলে নেওয়া হলো। মশালের লাল আলোর আভায় ওদের হাতে প্রকাণ্ড দা'গুলো চক চক করে উঠলো। সবার আগে মশাল হাতে চলেছে পথ-প্রদর্শক বিভীষণ বাচ্চা, তারপর একে একে দশজন কনস্টেবল, এদের পর আমি ও সবশেষে রাইফেল কাঁধে মজিদ সাহেব। রাইফেলটা প্রথমে নজরে পড়েনি একজন কনস্টেবলের কাছে ছিল। পাহাড়ে উঠবার আগে মজিদ সাহেব তা নিজের কাঁধেই নিয়ে নিলেন। অতোগুলো মশাল আর দা'-এর চেয়ে ঐ একটা রাইফেলই দুর্গম পথের ভীষণতা যেন আরো শতগুণ বাড়িয়ে দিলো। নিঃশব্দে খাড়া মাটির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলাম। একটার পর একটা সিঁড়ি অতিক্রম করছি আর মনে হচ্ছে এ পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়!

আধ ঘণ্টা এইভাবে অবিশ্রাম উঠবার পর যখন পা দুটো একেবারে ধরে এসেছে তখন সিঁড়িও শেষ হলো। সবাই হাঁপাচ্ছে। কনস্টেবলের দল সরু পথের উপর বসে পড়লো। আমি আর মজিদ সাহেব লজ্জায় আর ওদের সঙ্গে বসলাম না।

মজিদ সাহেব রাইফেলটার উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন আর আমি হাতের ছড়িটার উপর যতোটুকু ভার দেওয়া সম্ভব দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলাম। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে মজিদ সাহেবকে একটা দিয়ে নিজে একটা ধরালাম। এই বিশ্রামের অবসরে মজিদ সাহেবের পরিচয় যা পেলাম তা এই—বাবা রিটায়ার্ড সাবজজ। বছর খানেক হলো বড় ভাই ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছেন। মজিদ সাহেবও স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে ভালোভাবে বি-এ. পাশ করে এম-এ. পড়বার জন্য অ্যাডমিশনও নিয়েছিলেন। এমন সময় হঠাৎ বাবা হার্টফেল করে মারা গেলেন। ছোট বোন রাবেয়া বোর্ডিং-এ থেকে আই-এ. পড়তো সেও এসে পড়লো। মা অনেক ছোটবেলা মারা গিয়েছিলেন, তাঁকে ভালো করে মনে পড়ে না মজিদ সাহেবের। বাবাই সে অভাব পূর্ণ করেছিলেন এতোদিন। ভাই-বোনে পরামর্শ করে ঠিক হলো বাড়িটা সম্পূর্ণ ভাড়া দেওয়া হবে। সেই ভাড়া থেকে দাদার বিলেত পড়ার খরচ পাঠিয়ে আর রাবেয়ার বোর্ডিং-এর খরচ দিয়ে যদি কিছু বাঁচে ভালোই, নইলে মজিদ সাহেব চাকরির টাকা থেকে বাকিটা দিয়ে দেবেন। বাবারই এক বন্ধুর চেষ্টায় ও তদ্বিরে মজিদ সাহেব আবগারি সাব-ইন্সপেক্টারের পোস্ট পেয়ে গেলেন। পরের ঘটনাগুলো সবই জানা।

হাঁটা শুরু হলো। গাছ আর মাটি কেটে কেটে তৈরি করা পথ। খুব বেশি হয় তো হাতখানেক চওড়া, দু'জনে পাশাপাশি যাওয়া চলে না। পথের দু'পাশে গভীর খাত, উপর থেকে চাইলে তলা দেখা যায় না, মাথা ঝিম ঝিম করে। একটি লম্বা লাইন করে সবাই চলেছি। কনস্টেবলরা বাঁ হাতে দা'খানাকে শক্ত করে ধরে ডান হাত উঁচু করে মশালগুলো নিয়ে গুন-গুন করে কি যেন বলছে আর পথ চলছে। প্রথমে একজন সুর করে কি বলে পরে সবাই এক সঙ্গে তার প্রতিধ্বনি করে। শুনতে মন্দ লাগে না। কেউ না বলে দিলেও একটু পরে বুঝতে পারলাম ওরা গান ধরেছে। আমাদের দেশে যেমন পাল্কি-বেয়ারারা গান করে, দিনমজুর কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতে করতে গায়, এও সে ধরনের গান। তফাত শুধু স্থান আর কালের। আমাদের দেশের মজুররা গান

গায় পরিশ্রম খানিকটা লাঘব করার জন্য। কিন্তু এরা? শুধুই কি পরিশ্রম দূর করার জন্য না এর সঙ্গে খানিকটা প্রচ্ছন্ন ভয়ও মেশানো রয়েছে? মনে মনে আলোচনা করতে করতে বেশ কিছুদূর এগিয়েছি হঠাৎ খেয়াল হতেই দেখি গান থেমে গিয়েছে আর আমরাও থেমে গিয়েছি। দলের সবচেয়ে বিজ্ঞ মগ ইশারা করে সবাইকে চুপ করতে বলে দিলে। কাঠের পুতুলের মতো সেই সরু রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে আছি—এক মিনিট, দু' মিনিট, তিন মিনিট। হঠাৎ মজিদ সাহেবকে জড়িয়ে ধরলাম। বুকের ভিতরটা ঢিব ঢিব করতে লাগলো। স্পষ্ট শুনতে পেলাম কাছে খুব কাছে রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে উঠে ডাকছে একটা বাঘ। প্রথমটা আস্তে তারপর ক্রমশঃ বাড়তে লাগলো গর্জন। হঠাৎ একেবারে কাছে শুনলাম আর একটা বিকট আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে দা'গুলো মাটিতে রেখে মগ কনস্টেবলের দল এক হাতে মশালটা উঁচু করে নাড়ছে অপর হাতের আঙুলগুলো মুড়ে মুখের কাছে এনে সবাই এক সঙ্গে এক বিকট বীভৎস আওয়াজ করতে শুরু করেছে। থেকে থেকে দমকা আওয়াজ করে, আবার থামে, আবার শুরু হয়। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চললো আওয়াজের মহড়া। তারপর হঠাৎ থেমে সবাই উৎকর্ণ হয়ে রইলো। এবার বেশ বুঝতে পারলাম বাঘের ডাক ক্রমেই দূর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। বুঝলাম ব্যাঘ্র মহাশয় গতিক সুবিধা নয় বুঝতে পেরে 'যঃ পলায়তি—' নীতি অবলম্বন করেছেন। ততোক্ষণে খাকি হাফ প্যাণ্ট, শার্ট সবই ঘামে ভিজে সপ সপ করছে, মজিদ সাহেবের অবস্থাও তাই। নীরবে পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম—কথা বলার দরকার হলো না। আবার চলতে শুরু করলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি মাটিকাটা পথ আবার নিচুতে নামতে শুরু করেছে। নামবার সময় বেশ আরাম লাগে। একটু গিয়ে আবার উপরে ওঠার পালা শুরু। মুশকিল হয় সেই সময়, পা দুটো আর উঠতে চায় না।

শুধু দেখলাম আমাদের সঙ্গী মগেরা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই চলেছে। এ-কষ্টকে ওরা কষ্ট বলেই গ্রাহ্য করছে না। এইভাবে দু'তিনবার ওঠা-নামা করে মজিদ সাহেবকে বললাম—এবার উঠে

বেশ একটু বিশ্রাম না করে আমি আর হাঁটতে পারবো না মজিদ সাহেব।

মজিদ সাহেব বললেন—আপনি বাঁচালেন, আমি লজ্জায় বলতে পারছিলাম না। আমার অবস্থা আপনার চেয়েও শোচনীয়।

একটু পরেই উপরে উঠে খানিকটা সমতল পথ পাওয়া গেল। চওড়ায় কয়েক ইঞ্চি বেশি। যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। দ্বিতীয়বার আর বলতে হলো না, উপরে উঠেই মজিদ সাহেব বাঙালী কনস্টেবল পঞ্চু দাসকে ডেকে আমাদের অভিপ্রায় জানিয়ে দিলেন। পঞ্চু তখনই মগী ভাষাতে তা সবাইকে বলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে মশালগুলো পথের দু'ধারে পুঁতে রেখে দা' হাতে সবাই ঝুপ ঝাপ করে পথের উপর লাইন করে বসে পড়লো। তারপর ফতুয়ার পকেট থেকে চুরুট বার করে মশালের আলোতে ধরিয়ে দিব্যি আরামে টানতে শুরু করে দিলে। শুধু বিভীষণ বাচ্চা একটা প্রেতের মতো কেরোসিনের টিন নিয়ে ঘুরে ঘুরে নিবু-নিবু মশালগুলোতে তেল দিতে লাগলো।

একটু দূরেই আমি আর মজিদ সাহেব বসলাম। পকেট থেকে সিগারেট বার করতে গিয়ে সভয়ে চিৎকার করে ওঠে দাঁড়ালাম। মজিদ সাহেব ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতেই হাত দিয়ে আমার ও মজিদ সাহেবের মধ্যেকার পথটা দেখিয়ে দিলাম। পঞ্চু মশাল নিয়ে ছুটে এল। দেখলাম এক ঝুড়ি গোবরের মতো পদার্থ, একেবারে টাটকা। আর তা থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে। মুখ দেখে বুঝলাম মজিদ সাহেবও বেশ ভড়কে গিয়েছেন। বয়স্ক সর্দার মগ পঞ্চুকে ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ালো, তারপর নিচু হয়ে ঝুঁকে ব্যাপারটা দেখে নিয়ে মগী ভাষাতে সঙ্গীদের উদ্দেশ করে কি একটা বলে হাসিতে আটখানা হয়ে ভেঙে পড়লো। মনে মনে অপ্রস্তুত হলেও মুখে তা প্রকাশ না করেই বেশ একটু ঝাঁজের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি পঞ্চু।

বেশ সহজভাবেই পঞ্চু জবাব দিলে, আমরা এখানে আসবার মিনিট খানেক আগে দল-ছাড়া একটা বুনো হাতি এ-পথ দিয়ে গিয়েছে আর অকাট্য প্রমাণ রেখে গিয়েছে ঐ টাটকা মল যা থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে।

লজ্জা পেলাম। ভাবলাম অতোটা ভড়কে না গেলেও পারতাম। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে সিগারেট বার করে মজিদ সাহেবকে দিয়ে নিজে ধরালাম। এরই মধ্যে পঞ্চু কোন ফাঁকে একটা মশাল আমাদের পাশে পুঁতে রেখে গিয়েছে আর সঙ্গী মগের দল এমন কি বাচ্চা পর্যন্ত পরম কৌতুকে আমাদের দিকে চেয়ে চুরুট টানতে টানতে কি বলাবলি করছে। মনে মনে ষোলো আনা বিশ্রামের ইচ্ছা থাকলেও উঠে দাঁড়ালাম। অদ্ভুত লোক এই মজিদ সাহেব। কিছু বলবার দরকার হলো না, আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পঞ্চুকে ডেকে অর্ডার দিলেন—রাত দুটো বেজে গিয়েছে, আর বসলে চলবে না। মশালটা নিয়ে যাও আর ওদের সবাইকে বলে দাও সকাল পাঁচটার আগেই আমাদের একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছতে হবে।

আবার শুরু হলো হাঁটা।

গম্ভীর নিস্তব্ধ রাত্রির বুকের উপর দিয়ে এক ভয়াবহ অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে অভিযান। কেউ জানে না এর শেষ কোথায়। হেঁটেই চলেছি, মাঝে মাঝে মশালের আলো কমে যায় আর ঘুটঘুটে অন্ধকারে রাতের ভয়াবহ রূপ শতগুণ বেড়ে ওঠে। একটু থেমে তেল দিয়ে আবার ওগুলোকে সতেজ করে নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। হঠাৎ একটা অস্ফুট আওয়াজ করে সামনের কনস্টেবলের দল দাঁড়িয়ে পড়ে। আমি আর মজিদ সাহেব বাঘ সিংহ বা হাতির ডাকের প্রত্যাশায় উৎকর্ণ হয়ে থাকি। কিছুই শুনতে না পেয়ে নিরাশ হই, কনস্টেবল পঞ্চু দাস উঁচু গলায় বলে—ও কিছু নয় বাবু। একটা গোখ্‌রো খাদের এপাশ থেকে ওপাশে যাচ্ছিলো। কনস্টেবল খাই চুং তাকে দা' দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে খাদে ফেলে দিয়েছে।

আবার চলা শুরু হয়। একটু পরে শুনি কনস্টেবলরা গুন গুন করে কোরাস শুরু করে দিয়েছে। ভাবলাম বাঘ আর হাতির রাজ্য ছেড়ে এবার বোধ হয় সাপের জমিদারীতে ঢুকলাম। মশালের অস্পষ্ট আলোয় চোখ বড়ো করে সামনে মাটির দিকে চেয়ে পথ চলি। বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে চলার পর সমতল ছেড়ে আবার নিচে নামতে শুরু করলাম, নামছি তো নামছিই। হঠাৎ মনে

হলো আর তেমন গরম লাগছে না। কোথা থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে যেন সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে দিতে লাগলো। মজিদ সাহেবও দেখলাম একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চার দিক চাইতে চাইতে নামছেন। খানিকক্ষণ বাদে নামা শেষ হলো, বুঝতে পারলাম ঠাণ্ডা হাওয়ার উৎস কোথায়। মনে হলো চিটাগং হিলস্‌-এর এইখানটাই সবচেয়ে নিচু। মাটি ভিজে স্যাঁতসেঁতে। কিছুদূরে একটা ছোট্ট খাল, চওড়া ছ' সাত হাতের বেশি হবে না, রাস্তার উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে বয়ে গিয়েছে। ঐ খালটি পার হয়ে আমাদের যেতে হবে। দেখি কেরোসিনের টিন থেকে খানিকটা করে তেল নিয়ে মগেরা পায়ে হাঁটু পর্যন্ত মাখছে। হাত-পায়ের ব্যথা মারতে কেরোসিন তেলের যে কোনো বিশেষ ক্ষমতা আছে আগে জানা ছিল না। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। সামনে জল দেখে তৃষ্ণা আরও বেড়ে গেল। মজিদ সাহেবকে চুপি চুপি বললাম—চলুন আঁজলা করে খানিকটা জল খেয়েনি। দ্বিরুক্তি না করে মজিদ সাহেব আমার সঙ্গ নিলেন। মশালের আলোয় ছোট্ট খালটার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। স্বচ্ছ পরিষ্কার জল, নিচের মাটি পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। অনুমানে মনে হলো বড় জোর হাঁটু পর্যন্ত গভীর। তু'জনে পাশাপাশি বসে আস্তে আস্তে জলে হাত বাড়াতে যাচ্ছি হঠাৎ তু'-তিনজন মগ কনস্টেবল পিছন দিক থেকে আমাদের তু'জনকে ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে পিছনে নিয়ে যেতে লাগলো আর ভয়ে কুৎকুতে চোখ কপালে তুলে চিৎকার করে বলতে লাগলো—রি মি হি—রি মি হি—। চোখের নিমেষে ব্যাপারটা ঘটে গেল। খালের ধার থেকে বেশ কিছুদূরে আমাদের তু'জনকে এনে যখন ছেড়ে দিলে, তখন প্রথমটা রাগে বিস্ময়ে কোনো কথাই মুখ দিয়ে বেরুলো না, একটু পরেই মজিদ সাহেব চিৎকার করে উঠলেন—পঞ্চু! এ সবের মানে কি? কি ভেবেছে ওরা? মুখখানা কাচুমাচু করে হাত তুটো কচলাতে কচলাতে পঞ্চু কাছে এসে বললে—হুজুর ওরা ঠিকই করেছে। এ খালের জল দেখতে পরিষ্কার হলেও পাহাড়ী জোঁকে ভর্তি। এমনিতে নজরে পড়ে না, কিন্তু হাত জলে ডুবিয়েছেন কি ছেঁকে ধরেছে। অনেক কষ্টে যদিও সেগুলো ছাড়িয়ে ফেলতে পারলেন, কিন্তু পরে

সে জায়গায় ঘা হয়ে যাবে এবং বিষাক্ত ঘা। এরা বলে সে ঘা সহজে সারে না। তাই ওরা চিৎকার করে বলছিল যে, জল খাবেন না, জল ভালো না। দেখছেন না ওরা পায়ে হাঁটু পর্যন্ত কেরোসিন তেল লাগিয়ে নিচ্ছে। তেলের গন্ধ পেলে জোঁক কাছেই ঘেঁষবে না।

কেরোসিন তেলের মাহাত্ম্য এতোক্ষণে বুঝতে পারলাম। অকারণ ক্রোধে উত্তেজিত হওয়ার জন্য মনে মনে লজ্জা পেলাম। জলের বর্ণনা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই পিপাসা দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। এখন শুধু একমাত্র চিন্তা হলো হেঁটে ঐ খাল আমরা কি করে পার হবো। শেষ পর্যন্ত জুতো মোজা খুলে আমাদেরও কি সর্বাঙ্গে কেরোসিন তেল মালিশ করতে হবে? মজিদ সাহেবের দিকে তাকালাম। বুঝলাম তাঁরও ঐ এক দুশ্চিন্তা। একটু ইতস্তত করে বললাম—তাহলে পঞ্চু, আমরা জুতো মোজা খুলতে লাগি, তুমি একটু কেরোসিন তেল এনে দাও।

হেসে জবাব দিলে পঞ্চু—না হুজুর। আপনাদের ওসব কিছুই করার দরকার হবে না। আমরাই কোলে করে আপনাদের পার করে দেবো।

তাই হলো। আমাদের দু'জনকে দুটি মগ গলার নিচে এক হাত আর হাঁটুর নিচে এক হাত দিয়ে অনায়াসে কোলে করে খালের অপর পারে পৌঁছে দিলে।

খাল পার হবার পর্ব শেষ হলে আবার সদলবলে হাঁটতে শুরু করলাম। এবার দেখলাম পথটা একটু চওড়া। আমি আর মজিদ সাহেব পাশাপাশি সিগারেট খেতে খেতে চললাম।

মজিদ সাহেবের ঘড়িতে দেখলাম রাত চারটে বাজে। আর একটা ঘণ্টা কোনো রকমে কাটিয়ে দিতে পারলেই বিশ্রাম। মজিদ সাহেবকে বললাম—অনেকক্ষণ ধরে ভূতের বোঝা বইছেন, আমায় খানিকটা অংশ দিন। রাইফেলটা মজিদ সাহেবের কাছ থেকে নিজের কাঁধে তুলে নিলুম। একটা অদ্ভুত মানসিক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। রাইফেল, বন্দুক, রিভলবার, ছোরা, ছুরি, দা'—যে কোনো অস্ত্র বা মারাত্মক হাতিয়ারের একটা সাইকোলজিক্যাল এফেক্ট আছে, ব্যবহার করি না করি হাতে

এলেই একটা সিকিউরিটির ভাব আসে। খানিকটা সাহস যেন ওগুলো সঙ্গে করে নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা মজিদ সাহেব, রাইফেল রিভলবার কখনও ছুঁড়েছেন?

মজিদ সাহেব হেসে জবাব দিলেন—ট্রেনিং-এ পরীক্ষা পাশ করার প্রয়োজন ছাড়া এক দিনও না। তবে এবার হয় তো প্রয়োজন হবে। প্রথমদিনেই যা সব নমুনা পেলাম।

হঠাৎ দেখি কিছু আগে আমাদের সঙ্গীর দল থেমে দাঁড়িয়ে মশালের আলোয় নিচু হয়ে কি দেখছে আর উত্তেজিতভাবে কি সব বলাবলি করছে। দু'-তিনজন দেখলাম মশালটা উঁচু করে ডান দিকের ঘন জঙ্গলটার ভিতরে কি দেখবার চেষ্টা করছে। ব্যাপার কি? অজ্ঞাতে বাঁ হাত দিয়ে রাইফেলটা শক্ত করে ধরে এক পা এক পা করে এগোতে লাগলাম। কাছে গিয়ে দেখি একটা রক্তাক্ত বাছুরের আধখানা দেহ। স্পষ্ট বোঝা গেল কোনো বাঘ বা নেকড়ে সবে ব্রেকফাস্ট-এ বসেছিল। আমাদের হঠাৎ আগমনে বিরক্ত হয়েই বোধ হয় ডান দিকের ঘন জঙ্গলটার মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে। দেখলাম বাছুরটার মুখ আর সামনের পা দুটো নেই। শুধু পিছনের দুটো পা আর ল্যাজটা অবশিষ্ট আছে। সরু একটা টাটকা রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়েছে পাশের খাদে। রাইফেলটা কাঁধ থেকে খুলে নিয়ে দু' হাতে বেশ শক্ত করে ধরে ঐ জঙ্গলটার দিকে তাক করে গুলী ছুঁড়তে যাবো এমন সময় সঙ্গী মগী কনস্টেবলের দল আর্তনাদ করে উঠলো।

পঞ্চু বললে—অমন কাজও করবেন না বাবু! এমনিতে ও কিছুই বলবে না। কিন্তু খুঁচিয়ে ঘা করলে এখান থেকে কেউ প্রাণ নিয়ে যেতে পারবে না।

রাইফেল ছোঁড়ার এমন একটা সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পেরে মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলাম। কাঁধে না ঝুলিয়ে রাইফেলটা হাতে নিয়েই হাঁটতে শুরু করলাম। মগের দল ততোক্ষণে মশাল নিভিয়ে ফেলেছে। চেয়ে দেখি ঘন পাতার আবরণ ভেদ করেও পুবের আকাশ দেখা যাচ্ছে আর একটা ঝিরঝির হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। কানে ভেসে এল অগণিত ঘুম-ভাঙা পাখির কলরব।

বুঝলাম ভোর হয়ে এল। চিটাগং হিল্‌স-এর গভীর অরণ্যে এই ভয়াবহ পরিবেশের মধ্যেও অদ্ভুত ভালো লেগেছিল সেদিনের প্রভাত। মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। মিনিট পাঁচেক হাঁটবার পর সামনে কিছু দূরে অস্পষ্ট আলোয় দেখি মাঝারি একখানা ক্যাংঘর। ঘর? এই গভীর অরণ্যে মানুষের বসতি? নিজের চোখকে বিশ্বাস হলো না। বললাম—দেখুন তো মজিদ সাহেব, দূরে ওটা ঘর বলে মনে হচ্ছে না? মজিদ সাহেবও আমার মতোই অবাক হয়ে গিয়েছেন। একটু ইতস্তত করে বললেন—হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু কি ব্যাপার বলুন তো ধীরাজবাবু, এ যে আরব্য উপন্যাসকেও ছাড়িয়ে গেল। দেখি সামনে কনস্টেবলদেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। ওরাও ঘরখানা দেখতে পেয়েছে। তবে আমাদের মতো মোটেই তারা অবাক হয়নি বরং খুশি মনে ঐ দিকেই এগিয়ে চলেছে। আরও কাছে এসে পড়লাম। সেই চিরাচরিত ফরমুলার ক্যাংঘর, লম্বা শাল গাছের খুঁটি, মাটি থেকে আট দশ হাত উঁচু পুরু তক্তার মেজে, তক্তার বেড়া, একটা জানলাও চোখে পড়লো। তার উপর, ওঃ বাবা, গোলপাতা বা নারকেল পাতা নয়, একেবারে করোগেটেড টিনের চাল! বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলাম এবার, মেজের তক্তা দু'তিন হাত বারান্দার মতো ঘরের চারপাশে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে আর তারই একপাশে বসে দাঁতন করছে কে? পরক্ষণেই দেহে যতটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল সবটুকু দিয়ে চিৎকার করে উঠলাম—সুধীর!

আমার হঠাৎ-চিৎকারে সঙ্গীরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে একবার আমার দিকে একবার ঐ রহস্যময় লোকটির দিকে তাকাতে লাগলো। দেখলাম লোকটি তক্তার উপর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। চোখে মুখে বিস্ময়। নিমেষে বিস্ময় কেটে গিয়ে আনন্দে উল্লাসে তার সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তারপর ঐ আট-দশ হাত উঁচু তক্তার উপর থেকে অভ্যস্ত বেড়ালের মতো এক লাফে আমাদের সামনে এসে পড়লো।

চোখের পলক ফেলবার আগেই দেখি সে রাইফেল সুদ্ধ আমাকে জড়িয়ে ধরে মাটি থেকে শূন্যে উঠিয়ে নিয়েছে আর বলছে

—ধীরাজ ? আমার যে এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। চিটাগাং-এর এই গভীর জঙ্গলে তুই ?

কথা কইবার ক্ষমতা ছিল না। এইবার মনে হলো যে সত্যিই আমি পরিশ্রান্ত আর এক পাও হাঁটবার ক্ষমতা নেই। বললাম—পরে সব বলবো, শুধু তুই কোলে করে আমাকে ঐ তক্তার এক পাশে একটু শুইয়ে দে ভাই। কোনো কথা না বলে সুধীর আমাকে কোলে করেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলো। হঠাৎ চোখ পড়লো মজিদ সাহেবের উপর। তিনি আমাদের দিকে চেয়ে অপরাধীর মতো একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নিজের স্বার্থপরতায় ভীষণ রাগ হলো নিজের উপর। বললাম—সুধীর, আমাকে নামিয়ে দাও। দু'তিনটে সিঁড়ি লাফিয়ে পার হয়ে মজিদ সাহেবের কাছে গিয়ে হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম—আমার মতো জানোয়ারকে ক্ষমা না করাই উচিত। কিন্তু অল্প কয়দিনের পরিচয়ে যেটুকু চিনেছি তাতেই সাহস পেয়ে বলছি। নিজের দুঃখ-কষ্টটাকেই আমি বড়ো করে দেখেছি। আর ভাষা যোগালো না। সত্যিই কেঁদে ফেললাম। সুধীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল দেখিনি। হঠাৎ আমাদের দু'জনকে জড়িয়ে ধরে বললে—এসব মান-অভিমানের পালা খাওয়া-দাওয়া করে জিরিয়ে নিয়ে তারপর হবে। এখন চলো। জুতো মোজা খুলে লুঙ্গি পড়ে শুয়ে পড়বে চলো।

সে আদেশ অবহেলা করবার সাহস বা ইচ্ছা ছিল না। কোনো রকমে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে ঘরে গিয়ে জুতো মোজাটা খুলে ঝুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। চোখ মেলতে পারছিলাম না, কথা জড়িয়ে আসছিল, তবু জোর করে বললাম—মজিদ সাহেব, আলাপ করিয়ে দিই, সুধীর দত্ত হচ্ছে আমার টেকনাফের এক রাতের অতিথি। তিনজন ফরেস্টার বন্ধুর একজন। তারপর জ্ঞান হারালাম না ঘুমিয়ে পড়লাম বলতে পারবো না।

ঘুম ভাঙলো বেলা দুটো আড়াইটের সময়। ঘুম ভাঙলো

বললে মিথ্যে বলা হবে, ঘুম ভাঙালো। সুধীর আর তার আর্দালি বিছানা থেকে একরকম টেনে হিঁচড়ে উঠিয়ে বসিয়ে দিলো, তাতেও যখন ঘুম ভাঙলো না—তখন দু'জনে মিলে আমাকে ঝাঁকাতে শুরু করে দিলে। কিছুক্ষণ বাদে চোখ মেলে চাইলাম।

সুধীর বললে—শুধু ঘুমুলেই চলবে? খাওয়া-দাওয়া করতে হবে না?

ম্লান হেসে জবাব দিলাম—না, শুধু ঘুমুলেই চলবে।

মজিদ সাহেবের ঘুম ভেঙে গিয়েছে আমার আগেই। দু'জনে উঠে এসে কাঠের বারান্দায় দাঁড়ালাম। সেখানে দু' বালতি জল, সাবান তোয়ালে সব হাজির। কোনো রকমে হাত মুখ মাথা ধুয়ে গাটা মুছে কাক-স্নান সেরে নিলাম। পাশেই দেখি ঐ দু'হাত আড়াই হাত চওড়া বারান্দায় আমাদের সঙ্গীরা দিব্যি আরামে গাদাগাদি করে ঘুমুচ্ছে।

সুধীর বললে—ওরা বুদ্ধিমান, আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিয়েছে।

এইবার মনে হলো সত্যিই খিদে পেয়েছে। ঘরে এসে দেখি এরই মধ্যে কখন সুধীরের আর্দালি দু' থালা ভাত, ডাল, আলুভাতে, খানিকটা করে গাওয়া ঘি আর বড়ো দুটো বাটিতে মুরগীর ঝোল সাজিয়ে বসে আছে।

সুধীরকে বললাম—মুরগীটা ছেড়েই দিলাম কিন্তু এই সীতার বনবাসে মুগের ডাল, আলু, গাওয়া ঘি এসব যোগাড় করলে কি করে?

হেসে সুধীর বললে—খুব সোজা! নীলার হাট থেকে আমার লোক এগুলো নিয়ে আসে তাতে সাত আট দিন চলে যায়। আবার পরের সপ্তাহে দরকারী সব কিছু নিয়ে আসে। আর মুরগীর জন্য তো ভাবনাই নেই। একটা বন্দুক নিয়ে বেরোলে মিনিট পনেরোর মধ্যে দু' তিনটে বুনো মুরগী অনায়াসে যোগাড় হয়ে যায়।

পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম এবং খেতে খেতে সুধীরকে আমাদের লাঞ্ছনার কথা সব বললাম। শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলো সুধীর, তারপর বললে—তোদের একেবারে বোকা বানিয়েছে।

মরিআলায় নুন তৈরি হয় সত্যি, কিন্তু ওরা বড্ডো গরীব। ওই নুন বেচে দু'চার পয়সা যা পায় তাই দিয়ে কোনো মতে সংসার চালায়। আমার যতোদূর মনে হয় অন্ততঃ কুড়ি বছরের মধ্যে মরিআলায় কোনো অফিসার ইন্সপেকশনে আসেনি। মজিদ সাহেবের দিকে তাকালাম। উত্তরে শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মুখার্জি আর দাসের খবর জিজ্ঞাসা করলাম।

সুধীর বললে—এখন কাঠ কাটার সিজন, এ সময় এলাকা ছেড়ে কোথাও যাবার উপায় নেই। আমি মুখার্জিকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, কাল ভোরে তোমরা ওর বাংলোয় গিয়ে তৈরি ভাত পাবে।

কথায় কথায় খেয়ে উঠতে বেলা চারটে বেজে গেল। সুধীর বললে—একটু ঘুমিয়ে নাও। আবার সারা রাত ঐ জঙ্গলের বুকের উপর দিয়ে ওঠা-নামা করতে হবে।

খুব যুক্তিপূর্ণ কথা, মজিদ সাহেবের দিকে চেয়ে দেখি তাঁর অবস্থা 'ক্যাবলা ভাত খাবি ? না হাত ধুয়ে বসে আছি'র মতন। নিদ্রা দেবী হাত বাড়িয়েই ছিলেন, দু'জনে শোবার সঙ্গে সঙ্গেই কোলে টেনে নিলেন।

ঘুম ভাঙলো যখন তখন রাত আটটা বেজে গিয়েছে। ঘরে একটা হ্যারিকেনের আলো মিট মিট করে জ্বলছে আর বাইরের বারান্দায় আমাদের সঙ্গীরা কিচির মিচির শুরু করে দিয়েছে। বুঝলাম যাত্রার সময় হয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াতে গিয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করে বসে পড়লাম। ব্যথায় পা দুটো টন টন করছে, শিরাগুলো দড়ার মতো ফুলে উঠেছে। সুধীর বারান্দায় ছিল, ছুটে কাছে এল। পায়ের অবস্থা দেখে বললো যে, অনেকক্ষণ একভাবে শুয়ে থাকার জন্য হয়েছে, একটু মাসাজ করে দিলে এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে। পাশে চেয়ে দেখি মজিদ সাহেব এরই মধ্যে কখন উঠে নিঃশব্দে জুতো মোজা পরতে শুরু করে দিয়েছেন। পাঁচ মিনিট বাদে ব্যথা অনেকটা কমে গেল। জুতো মোজা পরতে যাচ্ছি এমন সময় সুধীরের আর্দালি দুটো থালায় গরম

লুচি আলুভাজা আর খানিকটা করে মুরগীর মাংস নিয়ে হাজির। খিদে ছিল না বললে মিথ্যা বলা হবে তবুও মৌখিক ভদ্রতা করলাম—এ সব আবার কেন, এই তো চারটের সময় খেয়ে উঠেছি।

হেসে ফেললে সুধীর। বললে—আর পেটে খিদে মুখে লাজ করে কাজ নেই। খেয়ে নাও, মাইল পাঁচেক হাঁটলেই দেখবে আবার খিদে পেয়েছে।

আড়ম্বরহীন বিদায়ের পালা শেষ হতে দেরি হলো না। সুধীর একটা টর্চ ও বন্দুক নিয়ে আমাদের খানিকটা পথ এগিয়ে দিয়ে গেল। যাবার সময় বারবার আমাকে ও মজিদ সাহেবকে অনুরোধ করলে যেন ফেরার সময় তার বাংলো হয়ে যাই।

মজিদ সাহেব হেসে জবাব দিলেন—এটা কিন্তু একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে সুধীরবাবু। মনে মনে বেশ জানেন যে, আপনার অতিথি না হয়ে আমাদের যাওয়ার কোনো উপায় নেই।

বেশ একটা হাল্কা হাসিখুশির মধ্যে দিয়েই যাত্রা শুরু করলাম। রাত তখন ন'টা। মাইল খানেক পথ বেশ আরামেই হেঁটে এলাম, পথও অপেক্ষাকৃত চওড়া, আশেপাশে জঙ্গলও ততো গভীর নয়। হঠাৎ পট পরিবর্তন হলো। দু'পাশে ঘন গভীর জঙ্গল তার মধ্যে দিয়ে মাটি কেটে ছোট সরু পথ একটু একটু করে উপরে উঠে গিয়েছে। একটা সরু লাইন করে পর পর সবাই চলেছি। আগের মতো বাচ্চা সবার সামনে তার পর সব কনস্টেবলেরা। সবার শেষে আছি মজিদ সাহেব ও আমি। আমাদের সঙ্গী মগদের মধ্যে সব চেয়ে কম বয়সের একটি ছেলে ছিল। তার আসল নাম জানিনে, সবাই জংলি বলেই তাকে ডাকতো। বয়েস আঠারো উনিশের বেশি হবে না, চমৎকার স্বাস্থ্যবান নিটোল চেহারা। মাথায় একরাশ কোঁকড়া বাবরি চুল লাল একটা রুমাল দিয়ে বাঁধা। নীলা থেকে লক্ষ্য করছি সব সময় ছেলেটা কেমন মনমরা হয়ে আছে। ভেবেছিলাম শরীর ভালো নেই নয় তো পারিবারিক কোনো অশান্তির জন্য মন খারাপ। হঠাৎ শুনি জংলি চিৎকার করে মগী ভাষায় গান গাইতে শুরু করেছে। ব্যাপার কী? মজিদ সাহেবও বেশ অবাক

হয়েছেন। সঙ্গী মগেরা গা টেপাটিপি করে হাসহাসি শুরু করেছে, জংলির সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই—'ভীষ্মলোচন গাইছে তেড়ে নাইকো তাহে দৃক্‌পাত'। জংলিকে উপলক্ষ্য করে অনেকখানি পথ বিনা ক্লেশে হেঁটে মেরে দিলাম। মজিদ সাহেবকে বললাম—এই মগ জাতটাকে কিছুতেই চিনে উঠতে পারলাম না।

মজিদ সাহেব বললেন—আমি মাত্র কয়েকদিন হলো এসেছি। আপনি তবু খানিক চেনার সুযোগ পেয়েছেন।

মশালে তেল দিতে হবে, সবাই একটু দাঁড়ালাম। এই অবসরে পঞ্চুকে ডেকে বললাম—জংলির কি হয়েছে বলো তো? প্রথমটা পঞ্চু প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিল। মজিদ সাহেব ও আমি পীড়াপীড়ি করাতে যা বললো তা হচ্ছে এই—সংসারে জংলির এক বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ নেই। তিন তিনটে জোয়ান ভাই চিটাগং-এর জঙ্গলে কাজ করতে গিয়ে সাপ আর বাঘের হাতে প্রাণ দিয়েছে। বুড়ো মা তাই অনেক কান্নাকাটি করে অফিসারদের হাতে পায়ে ধরে জংলিকে কনস্টেবলের কাজে ঢুকিয়েছে—জঙ্গলের কাজে সে জংলিকে কিছুতেই যেতে দেবে না। আর এই চৈত্র-সংক্রান্তির দিন ওদেরই প্রতিবেশী একটি মেয়ের সঙ্গে জংলির বিয়ের কথাটা পাকাপাকি হবার কথা ছিল। ওদের ধারণা ঐ শুভ দিনটিতে যদি না হয় বা কোনো বাধা পড়ে তাহলে বুঝতে হবে ভগবান তথাগতের ইচ্ছা নয় যে, বিয়ে হয়। হঠাৎ এরকম দু' দুটো বাধা পেয়ে বেচারি একেবারে মুষড়ে পড়েছে। আর বুড়ী মা? আসবার সময় তার কী কান্না!

যে ব্যথা জোর করে এ দু'দিন ভুলে ছিলাম পঞ্চু সেইটেই সবার সামনে নির্মমভাবে প্রকাশ করে দিলো। মাথিনের চিন্তা আবার দ্বিগুণভাবে সমস্ত মনটাকে অধিকার করে বসলো। স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে উঠলো দুটো জলভরা চোখ, রাজ্যের মিনতি জড়ো করে কি যেন আমায় বলতে চায়।

পঞ্চু দাস বললে—এমনিতে জংলি খুব ফুর্তিবাজ ছেলে। সব সময় হাসি খুশি, গল্পে গানে আবগারি আপিস সরগরম করে রাখতো। কাল বিকেল থেকে ওর মুখে আর কথা নেই, কারও সঙ্গে একটা কথাও বলেনি। খায়ওনি ভালো করে, আমরা জোর

করে একটু যা খাইয়েছি। তাই এতোক্ষণ বাদে ও যখন হঠাৎ গলা ছেড়ে গান গাইতে শুরু করলো আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

ভাবলাম ওর মনটা অনেকখানি হাল্কা হয়ে যাবে। নতুন চোখে চাইলাম জংলির দিকে। সে তখন উদাস দৃষ্টি মেলে দূরের রহস্যময় অন্ধকারের দিকে চেয়ে হয় তো তার প্রিয়তমার মুখখানাই দেখছে।

হঠাৎ মজিদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি কুসংস্কার মানেন?

একটু অবাক হয়ে সাহেব বললেন—মানে?

বললাম—এই ধরুন যেমন মগদের কুসংস্কার হচ্ছে চৈত্র-সংক্রান্তির দিন বাগদান না হলে বা তাতে বাধা পড়লে আর বিয়ে হয় না?

হো হো করে হেসে উঠলেন মজিদ সাহেব। নাঃ, আপনি যে এতো ছেলেমানুষ তা জানা ছিল না। শিক্ষা বা সভ্যতার আলো যারা এতোটুকুও পেয়েছে তারা কখনো এসব অন্ধ সংস্কার মানে না —মানতে পারে না।

এমন একটা কিছু সান্ত্বনা পেলাম না মজিদ সাহেবের কথায় আর এ নিয়ে তর্ক করতেও প্রবৃত্তি হলো না। তাই চুপ করেই রইলাম।

পঞ্চু বললে—হুজুর এমনিতেই দেরি হয়ে গিয়েছে, হুকুম করেন তো চলতে শুরু করি।

আবার সেই অফুরন্ত পথে একঘেয়ে চলা শুরু হলো। কতোক্ষণ এইভাবে নিঃশব্দে চলেছি খেয়াল নেই। বৈচিত্র্যহীন একইভাবে ওঠা-নামা আর চলা। হঠাৎ দেখি আমাদের অগ্রগামী মগ সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। শুনলাম এইবার উঠতে হবে পাহাড়ের সব চেয়ে উঁচুতে। সেখানে পথ অসম্ভব সরু, দু'পাশে গভীর খাদ। অন্যমনস্ক হয়ে পা একটু ফস্কালে আর রক্ষে নেই। আর এই পথ বেয়ে চলতে হবে তিন মাইলের উপর। আমাদের অরণ্যযাত্রার এইটেই হলো সবচেয়ে ভয়াবহ ও কষ্টকর পথ। মজিদ সাহেব পকেট থেকে সিগারেট বার করে একটা আমাকে দিলেন। ইচ্ছে ছিল না তবুও নিলাম। একটু পরে উপরে ওঠা শুরু হলো। সেই মাটি কেটে তৈরি সিঁড়ি। ব্যতিক্রম হলো অন্যান্য পাহাড়ে

উঠবার সময় খানিকটা ঢালু সিঁড়ি থাকে—এটা একদম খাড়া। খানিক উঠে দাঁড়িয়ে হাঁপাই, মগদের থামতে বলি, আবার উঠতে থাকি। এইভাবে মাঝে মাঝে থেমে যখন শেষ ধাপে পৌঁছলাম তখন আমি আর মজিদ সাহেব আধমরা। ঝুপ করে বসে পড়লাম উপরের অপেক্ষাকৃত একটু চওড়া পথের ধারে। আমাদের দেখাদেখি সঙ্গীরাও বসে পড়েছে পথের উপরেই। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট বেশ বুঝতে পেরেছিল যে, সিঁড়ির সব ক'টা ধাপ পেরিয়ে উপরে উঠে বসতেই হবে তাই এখানটা অপেক্ষাকৃত চওড়া। জিরিয়ে একটু দম নিয়ে মজিদ সাহেব বললেন—পথের নমুনা দেখে কি মনে হয় জানেন ধীরাজবাবু? যে পথ দিয়ে পাঠান এসেছিল, সে পথ দিয়ে ফিরলো নাকো তারা।

ম্লান হেসে জবাব দিলাম—ফিরবার আশা আপনি রাখেন তাহলে? আমার তো মনে হয় এ অগস্ত্যের যাত্রা। এ যাত্রায় কেউ ফেরে না।

দূরে গভীর জঙ্গল থেকে ভেসে এল একটা গরুর অন্তিম আর্তনাদ, সেই সঙ্গে বাঘের হিংস্র হুঙ্কার। বোধ হয় মিনিট খানেক চলেছিল এই খাদ্য খাদকের লড়াই তারপর সব নিস্তব্ধ। বুঝলাম বেচারা গরুর গো-জন্মের যবনিকা এইখানে পড়লো। চিন্তার মোড় ঘুরে গেল। ভাবছিলাম মানুষের জীবনে কতো রঙ কতো বৈচিত্র্য। এই অনিশ্চিত জীবনকে কেন্দ্র করে কতো আশা ভালোবাসা স্বপ্নের সৌধ রচনা। চোখের সামনে ভেসে উঠলো জাদিমুরা মন্দিরের পাদদেশে সমতল ভূমিটা। কোথায় সেই শান্ত মৌন স্তব্ধতা! যৌবনের কলহাস্য গানে আজ এর আকাশ বাতাস মুখরিত। মনে পড়লো আজ চৈত্র-সংক্রান্তির উৎসব। সকাল থেকে রঙ বেরঙের নতুন পোষাক পরে নতুন জীবন-পথে প্রথম পা বাড়াবার উৎসাহে পাহাড়ের আঁকা বাঁকা মাটির সিঁড়ি বেয়ে ভগবান বুদ্ধের আশীর্বাদ নিতে চলেছে দলে দলে সুন্দর অসুন্দর মগ ছেলে মেয়ের দল। আজ শুধু যৌবনের সমারোহ। জরা বার্ধক্যের স্থান এখানে নেই। হরকির কিনে আনা নতুন রেশমী লুঙ্গি ফতুয়া পরে মাথায় বাবরি চুলের মাঝখানে রঙিন রুমাল বেঁধে এক অস্বস্তিকর অবস্থার মাঝে দাঁড়িয়ে

আছি মন্দিরে ওঠবার সিঁড়ির এক পাশে মাথিনের প্রতীক্ষায়। ক্রমে বেলা বাড়ে—নতুন জীবনের স্পন্দনও দ্রুততর হয়। মাথিনের তবু দেখা নেই। যৌবনে উচ্ছল অগণিত পূজারিণীর দল মনোমতো সঙ্গী নিয়ে ওপরে উঠছে। খানিক বাদে হাসিমুখে আবার নেমে আসছে। আমি শুধু সঙ্গীহীন একা। মাঝপথে হতাশার চড়ায় আটকে মাথিনের অপেক্ষায় পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দুশ্চিন্তায় মন অস্থির হয়ে ওঠে। তবে কি মাথিনের বাবা শেষ পর্যন্ত মত পরিবর্তন করলো। না সবটাই আগাগোড়া হরকির ধাপ্পাবাজি? আবার চিন্তায় বাধা পড়লো। সঙ্গী মগের দল একসঙ্গে চিৎকার করে উঠে হাতের মশালগুলো উঁচু করে ধরে ডানদিকের খাদের পাশে ঝুঁকে পড়ে ডাকলো—জংলি। অন্যমনস্ক হয়ে সরু পথ বেয়ে চলতে চলতে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গিয়েছে জংলি ডানদিকের অতলস্পর্শী খাদের মধ্যে! কান খাড়া করে সবাই শুনলাম তখনও গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে জংলি। ছোটোখাটো গাছপালা যা পাচ্ছে একান্ত নির্ভরে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই আবার সেগুলো উপড়ে নিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। বুকফাটা একটা আর্তনাদ নিকট থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে লাগলো—মা—আম্মা···মা—আম্মা···

নিরুপায় অনাথের অন্তিমের ডাকের মতো। সঙ্গী মগেরা চিৎকার করে ডাকে—জংলি! সে ডাক তার কানে পৌঁছয় কিনা জানি না কিন্তু সে সাড়া দেয় না। শুধু বুকফাটা আর্তনাদের সুরে বলে চলে—মা—আম্মা···। শেষ মুহূর্তে মৃত্যু স্থির নিশ্চয় জেনেও জংলি ভগবান বুদ্ধের নাম করলো না। তার আশৈশবের প্রণয়ী প্রিয়তমার নাম ধরেও একবার ডাকলো না। শুধু বৃদ্ধা স্থবির মায়ের চিন্তাই তাকে ব্যাকুল করে তুললো। মনে হলো আমি যেন সুখ দুঃখ আনন্দ বেদনার ঊর্ধ্বে চলে গিয়েছি, একেবারে সব অনুভূতির বাইরে। উৎকর্ণ হয়ে বসে আছি, আর কিছুই শোনা গেল না। শুধু মৃত্যুগহ্বর জংলির ডাকটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে লাগলো—মা আম্মা—মা—আম্মা—। মজিদ সাহেবের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছেন।

রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন—জলজ্যান্ত ছেলেটা এক মিনিটেই শেষ?

বললাম—আর সেই বুড়ী মা'র কথাটা ভাবুন তো? তিন তিনটে জোয়ান ছেলেকে এই রাক্ষুসী জঙ্গল হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়েছে। বুড়ী জংলিকে কিছুতেই আসতে দিতে চায়নি।

চেয়ে দেখি সঙ্গী মগেরা যাবার জন্য তৈরি হয়ে আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। আর সত্যিই তো জংলির মতো একটা নগণ্য ছেলের জন্য আর কতো সময় নষ্ট করা যায় আর লাভই বা কি! আবার হাঁটতে শুরু করি। সারা পথ শুধু সঙ্গে সঙ্গে চললো জংলির ঐ মা, আম্মা ডাক। যতো দূরে চলে যাই একটু দাঁড়িয়ে ডানদিকের খাদের কাছে কান পাতলেই যেন স্পষ্ট শুনতে পাই দূর দূরান্তর থেকে জংলি আকুলভাবে তার বৃদ্ধা মাকে ডাকছে—মা —আম্মা—

হেঁটেই চলেছি। বিরাম বিশ্রামহীন একঘেঁয়ে হাঁটা। মাঝে মাঝে দূর থেকে বাঘের ডাক ভেসে আসে। মাথার উপর আকাশচুম্বী শাল বা দেবদারু গাছের ঘন পাতার আড়ালে বসে প্যাঁচা বা ঐ জাতীয় পাখি বিশ্রী কর্কশ কণ্ঠে দু'-একবার ডেকে বুঝি বা অমঙ্গলের আভাস দেয়, গ্রাহ্য করি না। জংলি যাবার সময় একটা মস্ত উপকার করে গিয়েছে। আমাদের সমস্ত ভয় ভাবনা দুশ্চিন্তাগুলো ও সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে। মনে পড়লো দম দেওয়া একরকম পুতুলের কথা। রং বেরঙের পোশাক পরা, হাতে বন্দুক, মাথায় লোহার টুপি, একটা সৈন্যের পিছন দিকে একটা ছোট্ট দম দেওয়ার চাবি ফিট করা। বেশ কিছুক্ষণ দম দিয়ে ঘরের সিমেন্টের মেজেয় ছেড়ে দিলে যেমন সমান তালে পা ফেলে টলতে টলতে বন্দুক উঁচিয়ে হেঁটে যায়, আমাদের অবস্থাও হুবহু তাই। কতোক্ষণ এইভাবে হাঁটছি খেয়াল নেই। মজিদ সাহেবের হাতঘড়িতে ক'টা বাজলো জানতেও ইচ্ছা করছে না আজ। শুধু হাঁটছি। হঠাৎ দেখি আমাদের সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে পড়েছে। মজিদ সাহেবের কাছে শুনলাম এইবার আমাদের সাঁকো পার হতে হবে। সাঁকো? জলের চিহ্নমাত্র নেই; মাটির

পাহাড়ে সাঁকো ? শুনলাম যে কারণেই হোক খানিকটা মাটি ধসে গিয়েছে সেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে আমাদের সরে, ধন নীলমণি সরু পথটিকে। দেখলাম পাশাপাশি দু'খানা বাঁশ দিয়ে পারাপারের সেতু বা সাঁকো তৈরি হয়েছে। পাশ দিয়ে একখানা বাঁশ বাঁধা, বুঝলাম ঐখানি ধরে বৈতরণী পার হতে হবে। সঙ্গী মগেরা অনায়াসে পার হয়ে গেল। গোল বাঁধলো মজিদ সাহেবকে নিয়ে। রাইফেলটাকে লাঠির মতো ধরে পা ঘষে ঘষে দু' তিন পা এগিয়ে মজিদ সাহেব টলোমলো করতে লাগলেন। তাড়াতাড়ি ধরে ফেলে নামিয়ে নিলাম। তারপর অনেক গবেষণার পর ঠিক হলো আমরা দু'জনে একসঙ্গে পার হবো, যা থাকে কপালে। ডান হাতে ঐ সরু বাঁশটি আর বাঁ হাতে রাইফেলের ডগাটি ধরে আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন মজিদ সাহেব আর আমি মজিদ সাহেবের দিকে ফিরে বাঁ হাতে বাঁশটি আর ডান হাতে রাইফেলের তলাটি ধরে এগোতে লাগলাম আস্তে আস্তে পা ঘষে ঘষে। আমি সামনে একটু একটু করে এগোচ্ছি আর পা ঘষে ঘষে একটু একটু করে পিছু হটছেন মজিদ সাহেব। পরস্পরের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে পার হওয়ার উদ্দেশ্য হলো—দু'পাশের গভীর খাদের দিকে নজর দেবার অবসর পাবো না। দু'জনেই মনে মনে স্থির জানতাম যে, যদি ভুলেও পাশের খাদে চোখ পড়ে তাহলে পতন অনিবার্য। এইভাবে ঐ আট হাত চওড়া বৈতরণী প্রায় চল্লিশ মিনিটে পার হয়ে যখন ওপারে পৌঁছলাম তখন ঘামে আমাদের সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছে। ওদিকে মুখে একটা চুরুট গুঁজে সঙ্গী মগেরা পরম কৌতুকে আমাদের এই পার হওয়ার প্রহসনটা উপভোগ করছে।

মজিদ সাহেব বললেন—বসুন, একটু জিরিয়ে নেওয়া যাক।

বললাম—ক'টা বেজেছে দেখুন তো।

হাতঘড়ি দেখে মজিদ সাহেব বললে—তিনটে বেজে গিয়েছে।

বসে বিশ্রাম নেবার ষোলো আনা ইচ্ছা থাকলেও বললাম—এমনিতেই সাঁকো পার হতে আমাদের অনেকখানি সময় নষ্ট হয়েছে। তার উপর এখন আবার বিশ্রাম করতে গেলে সকালে মুখার্জির বাংলোয় পৌঁছনো সম্ভব হবে না।

খুব ছোট বেলায় ঠাকুরমা'র কাছে শোনা বিস্মৃতপ্রায় একটি প্রবাদ বাক্য হঠাৎ মনে পড়লো। মজিদ সাহেবকে বললাম—

'দাঁড়ালে পোয়া, বসলে ক্রোশ,
পথ বলেন—বাপুহে আমার কি দোষ?

শুনে মজিদ সাহেব হেসে জবাব দিলেন—খুব সত্যি কথা। এখন এই আধমরা অবস্থায় বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলে পথ দ্বিগুণ বলে মনে হবে।

চলতে শুরু করলাম। পথ অপেক্ষাকৃত চওড়া ও ঢালু। পাশাপাশি দু'জনে দুটো সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে পথ চলেছি। হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। ভাবলাম বাবা মা ছোট ভাইবোনেরা সবাই এখন নিশ্চিন্ত আরামে বিছানায় শুয়ে ঘুমুচ্ছে, আর আমি? রুদ্ধ অভিমানে চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুছতে যাচ্ছি—বিভীষণ বাচ্চা হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো। আবার কী হলো? অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ভাবলাম আবার কি কেউ খাদে পড়ে গেল? না। সবাই তো দাঁড়িয়ে আছে। মজিদ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, কেননা 'দাদা কানা ছোটভাই চোখে দেখে না'র মতো তিনি আমার চেয়ে আনাড়ি। পঞ্চুকে জিজ্ঞাসা করলাম। পঞ্চুর কথা শুনে ভয়ে আমার আর মজিদ সাহেবের হাত-পা পেটের ভিতর ঢুকে যায় আর কি। শুনলাম একপাল বুনো হাতি এই পথ বেয়ে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। এখন উপায়? একমাত্র উপায় রাইফেলের ফাঁকা আওয়াজ করা আর মশাল নেড়ে মুখে অদ্ভুত শব্দ করা। তাতে যদি ভয় পেয়ে হাতির দল মত ও পথ পরিবর্তন করে তাহলে রক্ষে নইলে ঝুপ ঝাপ করে খাদের দু'পাশে গড়িয়ে পড়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। অগত্যা তাই করতে হলো। রাইফেলটা মজিদ সাহেবের কাছ থেকে নিয়ে আকাশের দিকে লক্ষ্য করে ফায়ার করলাম গুড়ুম—গুড়ুম। নিস্তব্ধ জঙ্গলে প্রতিধ্বনি খানিকক্ষণ চললো গুড়ুম গুড়ুম। আবার লোড করে ফায়ার করি। ততোক্ষণে আমাদের সঙ্গীদের একজন সব ক'টা মশাল একসঙ্গে জড়ো করে মাথার ওপর তুলে নাড়ছে আর সবাই দু'হাত মুখে দিয়ে এক অদ্ভুত আওয়াজ করতে শুরু করে দিয়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ এইভাবে মানুষে আর হাতিতে বুদ্ধির যুদ্ধ চললো। সবশেষে জয় হলো মানুষের। দেখলাম ঐ বিরাট দেহের তুলনায় বুদ্ধিটা ভগবান হাতিকে একটু কমই দিয়েছে। মুষ্টিমেয় ক'টা মানুষের ধোঁকাবাজিতে ভুলে ভয় পেয়ে হাতির দল সুড় সুড় করে দু' পাশের খাদে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কারো সম্মতির অপেক্ষা না করেই ঝুপ করে পথের উপর বসে পড়ে বললাম—পথ দ্বিগুণ হোক বা তিন গুণ হোক, বেশ খানিকক্ষণ না জিরিয়ে এক পাও নড়বো না। মৌন সম্মতি দিয়ে পাশে বসে মজিদ সাহেব সিগারেট ধরালেন—আমাকেও একটা দিলেন।

জঙ্গলের অসংখ্য জানা অজানা পাখি বিচিত্র কলরবে আমাদের অভ্যর্থনা জানালে। ঘন গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে পুবের আকাশ দেখতে না পেলেও বুঝলাম ভোর হয়েছে। ক্লান্ত অবশ পা দুটো টেনে টেনে হেঁটেই চলেছি, মুখার্জির বাংলোর তবু দেখা নেই। মজিদ সাহেবকে বললাম—এবার শুধু বসে বিশ্রাম নেওয়া নয়, একেবারে শুয়ে পড়তে হবে, আর পারছি না। উত্তরে মজিদ সাহেব কি বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় কানে ভেসে এল বন্দুকের আওয়াজ। ঘুমভাঙা পাখির দল আর্তনাদ করে বাসা ছেড়ে দূর দূরান্তরে উড়ে চলে গেল। আমরা তবুও হাঁটছি, মনে হলো পা দুটো আর আমাদের বশে নেই। ইচ্ছে করলেও থামতে পারবো না। আবার শোনা গেল বন্দুকের আওয়াজ, একটু কাছে। চলা থামিয়ে মজিদ সাহেব কান খাড়া করে দূরাগত বন্দুকের ধ্বনি শুনলেন, তারপর অতিকষ্টে ঐ সাড়ে সাত সের ওজনের রাইফেলটা আকাশের দিকে তুলে ফায়ার করলেন, সারা জঙ্গল কেঁপে উঠলো। একটুখানি চুপচাপ তারপর মনে হলো কারা যেন কথা কইতে কইতে আমাদের দিকেই ছুটে আসছে। কিছু দূরে দেখা গেল একটা টর্চ ও হ্যারিকেন। ভয়ে নয়, বিস্ময়ে স্থাণুর মতো শুধু চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে এসে দাঁড়ালো বন্দুক হাতে

মুখার্জি আর টর্চ ও হ্যারিকেন হাতে তার দুই আর্দালি। আর কিছু মনে নেই।

চোখ মেলে দেখি মুখার্জির কাঠের ঘরে ক্যাম্প খাটের উপর নরম বিছনায় একটা লুঙ্গি পরে শুয়ে আছি। ভোরের ঘটনা সব মনে পড়ে গেল। ক্লান্তি ও অবসাদে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলে ওরা ধরাধরি করে নিয়ে এসে জামা জুতো খুলে শুইয়ে দিয়েছে। ঘাড় ফেরাতে কষ্ট হচ্ছিলো তবুও জোর করে ঘরের চারপাশে তাকালাম। দেখলাম পশ্চিমদিকে আর একটা ক্যাম্প খাটে লুঙ্গি পরে মজিদ সাহেব দিব্বি আরামে নাক ডাকাচ্ছেন। সর্বাঙ্গ ব্যথায় টন টন করছিল তবুও জোর করে উঠে বসলাম। সামনে কাঠের টেবিলটার উপর মজিদ সাহেবের হাতঘড়িটা রয়েছে, একটু ঝুঁকে দেখলাম বেলা ঠিক বারোটা। আস্তে আস্তে টেবিলটা ধরে উঠে দাঁড়িয়ে এক পা দু' পা করে বাইরে বারান্দায় এসে কাঠের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। নিচের উঠোনে তখন মাটি খুঁড়ে গর্ত করে এক অদ্ভুত উনুন তৈরি করে আমাদের সঙ্গীরা প্রকাণ্ড এক ডেকচি মুরগীর মাংস চাপাবার উৎসাহে মেতে উঠেছে। ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্ন ওদের চোখে মুখে কোথাও নেই। উঠোনের উত্তর দিকে রান্নাঘর। আমায় বারান্দায় দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে পাশে দাঁড়ালো মুখার্জি। কিছু বলবার আগেই ম্লান হেসে বললাম—ভাবছো, এই অযোগ্য অপদার্থকে পুলিস ডিপার্টমেণ্ট কি দেখে নিয়েছিল, না?

মুখার্জি বললে—না। ভাবছি সামান্য একটু পরিচয়ের সূত্র ধরে মানুষ মানুষের কতো কাজেই না লাগে। মাত্র এক রাত্রের পরিচয় টেকনাফ থানায়। আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি তোমাকে এই গভীর জঙ্গলে অতিথি পাবো।

চুপ করে রইলাম। মুখার্জি বললে—দত্ত যখন খবর পাঠালে আমি তো বিশ্বাসই করতে পারিনি, ভাবলাম ঠাট্টা করেছে। গভীর রাতে হঠাৎ শুনলাম রাইফেলের আওয়াজ, একটা দুটো নয় অনেকগুলো। ভাবলাম নিশ্চয়ই তোমরা কোনো বিপদে পড়েছো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দু'জন আর্দালি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

রান্নাঘরের ভিতর থেকে ভক্তিমধুর কণ্ঠে কে যেন গেয়ে উঠলো—

শিবে, আর কতদিন এ দীনে ঘুরাবে ॥
বিষয় বাসনা, মানা লেনা-দেনা এইভাবে
আর কতদিন এ দীনে ঘুরাবে ॥

চমৎকার গলা। মুখার্জির দিকে জিজ্ঞাসু চোখে চাইতেই বললে —ও আমাদের অনন্ত। আমার আর্দালি। বাড়ি ন'দে জেলার কোনো গ্রামে। তিন কুলে কেউ নেই, দিব্বি আছে। ওর গানে স্থান কাল পাত্রের দরকার নেই। ভাব এলেই গান। একদিন দেখি মুরগী রান্না করতে করতে ও কেত্তন গেয়ে কেঁদে ভাসাচ্ছে।

অনন্ত আবার গেয়ে উঠলো—

দারা স্থত অবিরত, দাও আনো করে রব
রবি স্থত নিয়ত ভাবে কবে হবে শব,
আমার কি হবে মা ব্রহ্মময়ী,
গতি নেই মা তোমা বই
দীন অনন্ত দাসে ঐ চরণে রাখিতে হবে
ভবে, আর কতদিন এ দীনে ঘুরাবে ॥

মিশমিশে কালো আধাবয়সী একটি মোটা সোটা লোক বাইরে এসে দাঁড়ালো। মুখে সদা-প্রসন্ন হাসি সবসময় লেগেই আছে। পরিচয়ের দরকার হলো না, বুঝলাম এই-ই অনন্ত।

মুখার্জি বললে—অনন্ত, তোমার গান ধীরাজবাবুর খুব ভালো লেগেছে।

আভূমি নত হয়ে করজোড়ে নমস্কার করে কাছে এসে দাঁড়ালো অনন্ত। বললাম—চমৎকার গলা তোমার। কতোদিন গানের চর্চা করছো ?

অনন্ত বললে—ছেলেবেলা থেকে যাত্রার দলে গান গাইতাম। বেশ নামও মায়ের আশীর্বাদে হয়েছিল। কিন্তু বরাতে সইলো না বাবু।

জিজ্ঞাসা করলাম—কেন ?

এ প্রশ্নের জবাব সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত দিলো না। ওর মুখে চোখে তখন একটা বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। উদাস দৃষ্টিটা দূরে বনের উপর নিবদ্ধ রেখে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর ম্লান

হেসে বললে—আমার একঘেঁয়ে দুঃখের কাহিনী কি আপনাদের ভালো লাগবে? বাবু সব জানেন।

পাশে চেয়ে দেখি মুখার্জি নেই। কোন ফাঁকে ঘরে গিয়ে মজিদ সাহেবের সঙ্গে দিব্বি গল্প জুড়ে দিয়েছে।

অনন্ত বললে—আমি যাই বাবু। ভাত চড়িয়ে এসেছি, হয় তো বা ধরে গেল।

অনন্তর মতো সদানন্দময় লোকের জীবনে কী এমন ব্যথা লুকিয়ে থাকতে পারে যার জন্যে লোকালয় ছেড়ে এই গভীর জঙ্গলে ও বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে বসেছে? তারই সম্ভব অসম্ভব নানা কল্পনা করতে করতে ঘরে ঢুকলাম।

মজিদ সাহেবের দেওয়া সিগারেটটায় কষে একটা টান দিয়ে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মুখার্জি বললে—চমৎকার লোক তোমার এই বন্ধু মজিদ সাহেব। এরকম সঙ্গী পেলে আমি নরকে যেতেও প্রস্তুত।

হেসে বললাম—নরকের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু তোমাদের মরিআলার মহিমা মর্মে মর্মে গাঁথা আছে। নরক তার কাছে স্বর্গ।

মজিদ সাহেব ও মুখার্জি একসঙ্গে হেসে উঠলেন। মুখার্জি বললে—মাভৈঃ ধীরাজ। তোমরা নরকের দ্বারদেশে উপস্থিত।

হকচকিয়ে গেলাম। বললাম—মানে?

নাটকীয় ভঙ্গিতে মুখার্জি বললে—মানে তোমাদের দুঃখনিশার অবসান কাল সকালেই হবে। দু' রাত্রি হেঁটে তোমরা বারো আনা পথ মেরে দিয়েছো, মাত্র চার আনা বাকি। অর্থাৎ এখান থেকে মরিআলা দশ বারো মাইলের মধ্যে অর্থাৎ কিনা টেনেটুনে তিন ঘণ্টার জার্নি।

ইচ্ছে হচ্ছিলো মুখার্জিকে জড়িয়ে ধরে নাচি। বললাম—আজ যে খবর শোনালি আমি রাজা হলে অর্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যা দিতাম তোকে।

এই অরণ্যযাত্রায় আর একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা লাভ করলাম। শহরে-সমাজে ফর্ম্যালিটি বা ভদ্রতার যে মুখোশ পরে আমরা বসে থাকি, শহর থেকে দূরে, সে গভীর অরণ্যই হোক বা অকূল

সমুদ্রের বুকেই হোক, বিপদে পড়লে আপনা হতেই সে আবরণ খসে পড়ে যায়, জানতেও পারা যায় না। টেকনাফে একদিনের পরিচয়ে যাদের 'আপনি' 'আজ্ঞে' ছাড়া চেষ্টা করেও অন্য কিছু বলতে পারিনি—সুদূরে এই বিপদ-সঙ্কুল অরণ্যে কেমন অনায়াসে প্রথম দর্শনেই তাদের 'তুই' 'তুমি' বলে ফেললাম; যেন বহুদিনের পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধু।

খাটের উপর বসে টেবিল থেকে মুখার্জির একটা সিগারেট ধরালাম। মুখার্জি উঠে এসে পাশে বসে বললে—তখন তুমি অজ্ঞান হয়ে যাবার পর এখানে আসতে আসতে পথে মজিদ সাহেবের কাছে তোমার সব কথাই শুনলাম। ক্ষতি হয় তো কিছুটা হয়েছে কিন্তু লাভটাও কম হয়নি তোমার।

একটু অবাক হয়ে বল্‌লাম—লাভ?

—হ্যাঁ লাভ। মাথিনকে দু'দিন বাদেও তুমি পাবে। কিন্তু ইতিমধ্যে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছো তার দামও কম নয় ভাই।

প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্য বললাম—আচ্ছা মুখার্জি, দাসের সঙ্গে তো দেখা হলো না? শুনেছিলাম পথে তার বাংলোও পড়বে।

মুখার্জি বললে—তার বাংলো তোমরা অনেক আগেই ছেড়ে এসেছো। সবচেয়ে খাড়াই ও উঁচু পাহাড় থেকে নেমে দু'দিকে দুটো পথ গিয়েছে। বাঁদিকটা দিয়ে একটু গেলেই দাসের বাংলো পড়ে। তোমরা অন্ধকারে বুঝতে পারোনি, ডানদিকের পথ দিয়ে সোজা চলে এসেছো এই গরীবের কুঁড়ে ঘরে! যা হোক দাসকে খবর পাঠিয়েছি হয় তো দুপুরের মধ্যেই এসে পড়বে।

জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা, তোমার অনন্তর ব্যাপারটা কি বলো তো? বললে—বাবু সব জানেন।

কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলো মুখার্জি। তারপর বললে—সত্যিই ওর জন্যে দুঃখ হয়। লেখাপড়া কিছু শেখেনি। ছেলেবেলায় গলা খুব ভালো ছিল বলে যাত্রার দলে গান গেয়েই কাটিয়ে দিয়েছে। দেশে জমি জমা যা ছিল তাতে চাকুরি না করলেও ওর বেশ চলে যেতো। বাপ মা ছিল না, সংসারে দূর সম্পর্কের এক বিধবা দিদিই ছিল ওর একমাত্র অবলম্বন। সেই

দিদিই একরকম জোর করে অনন্তর বিয়ে দিলো। সুন্দরী বউ, মহানন্দে সংসার পাতলো অনন্ত। বছর তিনেকের মধ্যে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে হলো। বিধবা দিদিও চোখ বুজলেন। এইবার মুশকিল হলো অনন্তর। যাত্রার নেশা আফিং-এর নেশার মতো ওকে পেয়ে বসেছিল। দিদি থাকতে দলের সঙ্গে ভিন্ গাঁ-এ পালা গাইতে গিয়ে তিন চারদিন কাটিয়ে আসতো। কিন্তু এখন? মহা সমস্যায় পড়লো অনন্ত। মীমাংসা হতেও দেরি হলো না। একে সংসারের অভিজ্ঞতা কম তার উপর ভালো মানুষ। সবার উপরে সুন্দরী অল্প শিক্ষিতা বউ। পরোপকারী হৃদয়বান ঠাকুরপো'র দল হুমড়ি খেয়ে পড়লো অনন্তর উপকার করতে। ঠিক হলো বেশি দিনের জন্য বাইরে গেলে ওরাই স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে দেখাশুনা করবে। ছ'মাস বেশ নির্বিঘ্নে কাটলো। একটা বড় বায়না হওয়ায় দলের সঙ্গে সাত-আট দিনের জন্যে মফঃস্বলের কোন শহরে আসতে হলো অনন্তকে। ফিরে গিয়ে দেখে শরচ্চন্দ্রের চরিত্রহীন না পড়েও কিরণময়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে ওর বউ ওরই মধ্যে সব চাইতে কম বয়সী একটি বেকার ঠাকুরপো'কে নিয়ে। ছেলেমেয়ে দুটি সঙ্গে নেয়নি। পরদিন সকালে তাদের কান্না শুনে প্রতিবেশী কেষ্ট বৈরাগীর বউ এসে বাড়ি নিয়ে গিয়েছে। সব শুনে গুম হয়ে বসে রইলো অনন্ত। পাড়া প্রতিবেশী অনেকেই সান্ত্বনা দিতে এল এবং এ অবস্থায় অচিরেই অনন্তর আর একটি বিয়ে করা বিশেষ দরকার এ কথাটাও বার বার বোঝাতে কসুর করলো না। কিন্তু অনন্ত শুধু মাথা নাড়ে। যখন কোনো যুক্তিতেই কেউ অনন্তকে টলাতে পারলো না তখন কেষ্ট বৈরাগীর বউ ছোট ছেলে মেয়েটিকে এনে অনন্তর কোলে বসিয়ে দিয়ে বললে—এদের মুখ চেয়েও অন্তত তোমার বিয়ে করা দরকার। এই দুধের বাছাদের মানুষ করবার জন্য এ ছাড়া অন্য পথই বা কি আছে! অগত্যা দশচক্রে ভগবান ভূত-এর মতো অনন্তকে নীরব সম্মতি দিতেই হলো। উৎসাহী প্রতিবেশীর দল কোমর বেঁধে লেগে গেল অনন্তর ভাঙা ঘর জোড়া লাগাবার মহান ব্রতে। আগেই বলেছি অনন্তর অবস্থা মোটামুটি ভালোই। বছরের খাবার ধান ক্ষেত থেকেই পাওয়া যায় তাছাড়া জমি জমাও আছে। সুন্দরী বয়স্কা পাত্রীর অভাব হলো

না। বিয়ের ছ'দিন বাকি, গ্রামে কলেরা দেখা দিলো। ছ'দিনের মধ্যে কয়েক ঘন্টার আগু পিছুতে অনন্তর ছেলে মেয়ে অনন্তপথে যাত্রা করলো। শেষ বন্ধনটুকুও ছিন্ন হয়ে গেল। এক মাসের মধ্যে বাড়ি, ঘর, জমি জমা বেচে সমস্ত টাকা গাঁয়ের ভাঙা কালী মন্দির সংস্কারের জন্য দান করে একদিন ভোরে কাউকে কিছু না বলে অনন্ত গাঁ ছেড়ে চলে গেল।

মুখার্জি চুপ করলো। মজিদ সাহেব ও আমি রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসে আছি। একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করলো মুখার্জি তারপরে কোনো দিকে না চেয়ে বলতে লাগলো—পরের ইতিহাস খুব জটিল নয়। হঠাৎ একদিন চিটাগং শহরে অনন্তর সঙ্গে আমার দেখা। কেঁদে পা ছুটো জড়িয়ে ধরে বললো—আমায় যে কোনো একটা চাকরি দিয়ে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন বাবু। বললাম—আমি বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই, হাতি, বাঘ, সাপ এরাই আমার প্রতিবেশী। সেখানে তুমি—? বাধা দিয়ে বলে উঠলো—তারা মানুষের চেয়ে অনেক ভালো বাবু। হিংসে করলে তবে অনিষ্ট করে। আর মানুষ ওদের চেয়েও হিংস্র। কিছু না করলেও সর্বনাশ করে বসে। বললাম—কিন্তু তুমি বিয়ে করেছো, তোমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে, তাঁদের কে দেখবে? উত্তর না দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে অনন্ত। সেইদিনই ওর গাঁয়ের একজন লোকের মুখে সব শুনলাম। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চাকরি বিশেষ করে আর্দালির কাজ যোগাড় করতে কষ্ট হয় না। সহজেই ওর কাজ হয়ে গেল। সেই থেকে ও আমার কাছেই আছে।

আবার চুপ করলো মুখার্জি। ভাবলাম কাহিনী শেষ হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে চেয়ে মুখার্জি বললে—ভাবছো, সামান্য একটা আর্দালি—তার জীবনের খুঁটিনাটি এতো কথা আমি জানলাম কি করে? অনন্ত আমারই গাঁয়ের লোক —আর···। গলাটা ধরে এল মুখার্জির। কেসে গলা পরিষ্কার করে আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়ালো মুখার্জি। তারপর বললে—আর যে ছেলেটি ওর সুন্দরী স্ত্রীকে কুলের বার করে নিয়ে গিয়েছিল সে আমারই গুণধর ছোট ভাই। হতভাগা

বছরখানেক হলো টি. বি-তে মারা গিয়েছে। অনন্তর স্ত্রী এখন চিটাগং-এ রেয়াজুদ্দিন গলিতে মালতী নাম নিয়ে পতিতাবৃত্তি করছে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুম থেকে উঠলাম বিকেল পাঁচটায়। শুনলাম, দাস আসতে পারেনি। লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছে, গাছ কাটতে গিয়ে তার একজন মজুর প্রকাণ্ড শাল গাছ চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। সেই হাঙ্গামায় খুব ব্যস্ত। মুখার্জিকে বার বার করে বলে পাঠিয়েছে, ফেরবার পথে আমরা যেন অতি অবশ্য ওর বাংলো হয়ে যাই। সন্ধ্যার আগে দেখি, আমাদের সঙ্গীরা রান্না চাপিয়ে দিয়েছে। মুখার্জি বললে—তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। রাত্রে খেয়ে দেয়ে তোফা দু' তিন ঘণ্টা ঘুমিয়ে নাও। তারপর রাত্রি বারোটা একটায় যাত্রা করো। হেসেখেলে ভোরের আগে মরিআলায় পৌঁছে যাবে।

তাই ঠিক হলো। রাত আটটায় খেয়ে নিয়ে আবার ঘুম দিলাম। ঠিক বারোটায় মুখার্জি ডেকে দিলে। উঠে প্রস্তুত হয়ে মশাল জ্বেলে রওনা হলাম যখন তখন একটা বাজে। মুখার্জি বলে দিলে যে, পথে আর বিশেষ কষ্ট হবে না, পথও চওড়া। আর এবার থেকে শুধু নিচের দিকেই নামতে হবে বেশি। কাজেই খাড়া উপর দিকে ওঠার হাত থেকে এবার খানিকটা রেহাই পাবো। অনেক বারণ করা সত্ত্বেও মুখার্জি খানিকটা পথ বন্দুক ও টর্চ নিয়ে এগিয়ে দিয়ে গেল। অনন্তকে আসবার সময় দেখতে পেলাম না—ভাবলাম বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মিনিট তিনেক হাঁটার পর পথ যেখানটায় ডানদিকে মোড় নিয়েছে, সেইখানে মুখার্জিকে বিদায় দিলাম।

প্রায় মিনিট পাঁচেক কেটে গিয়েছে। নিঃশব্দে শুধু হেঁটেই চলেছি, হঠাৎ নিস্তব্ধ রাতের মৌনতা ভেঙে কানে ভেসে এল অনন্ত দাসের অপূর্ব দরদী গলার গান।

'আমি কি তোর কেহ নই তারা ?
(তবে) মা মা বলিয়া কেন হই মা সারা।'

আমার মনের কথার প্রতিধ্বনি করে মজিদ সাহেব বললেন—দাঁড়ান ধীরাজবাবু! গানটা শুনি। সঙ্গীদেরও থামতে বলে

দিলাম। শুনলাম, তারামায়ের উদ্দেশ্যে অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে অনন্ত দাস আকুল হয়ে কাঁদছে :—

'দিবস রজনী ডাকি মা মা বলে,
মা তুমি একবার চাও না আমায় ভুলে।
আর কি হবে তারা ডাকলে মা মা বলে
দিন তো আমার মাগো হলো সারা।
আমি কি তোর কেহ নই তারা।'

গান শেষ হয়ে গেল। খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর ভারী মন নিয়ে আস্তে আস্তে মরিআলার পথে পা বাড়ালাম।

তখনও ঠিক ভোর হয়নি হঠাৎ কানে ভেসে এল গুম গুম আওয়াজ। এক সঙ্গে প্রায় শ'খানেক সুরকির কল চালিয়ে দিলে এক মাইল দূর থেকে যেমন শোনায়, ঠিক তেমনি। প্রথমটা বুঝতে পারিনি। একটু পরেই বুঝলাম সমুদ্রের ডাক। রাত্রে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। পশ্চিম দিক থেকে একটা ঠাণ্ডা হাওয়া সারারাত শরীরে শীতল প্রলেপ লাগিয়ে বইছিল। পথের কষ্ট জানতেই পারিনি। অপেক্ষাকৃত একটু ফাঁকা জায়গায় এসে সবাই দাঁড়ালাম। রাত তখন চারটে বাজে। দেখলাম বাচ্চা বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে। সঙ্গী কনস্টেবলদের কাছে গিয়ে হাত-মুখ নেড়ে কি সব বলছে। আমাদের দোভাষী পঞ্চু দাস বললে—হুজুর, বাচ্চা বলছে, এইবার নামতে শুরু করলেই মরিআলা গ্রামে গিয়ে পড়বো। ও বলছে, ওখানকার জমিদার বাড়িতে আপনাদের বসতে দিয়ে আমাদের সবাইকে নিয়ে গ্রামের আর সব বাড়িগুলো ঘিরে ফেলবে, যাতে সকালে ঘুম থেকে উঠে ওরা লবণ সরিয়ে ফেলতে না পারে।

যুক্তিপূর্ণ কথা, আমি ও মজিদ সাহেব ঘাড় নেড়ে সম্মতি দিলাম। বাচ্চা ছুটে এসে পঞ্চুর কানে কানে কি যেন বললে। একটু ইতস্তত করে পঞ্চু বললে—বাচ্চা বলছে, এখন থেকে কেউ যেন কথাবার্তা না বলেন। খুব আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে চলতে

হবে যাতে ওরা কিছু বুঝতে পেরে আগেই সাবধান হতে না পারে।

তাই হলো। মশাল নিভিয়ে চোরের মতো সন্তর্পণে পা ফেলে নিচে নামতে শুরু করলাম। প্রায় পনেরো মিনিট বাদে সমতলে পৌঁছলাম, বুঝলাম মরিআলায় এসে গিয়েছি। দক্ষিণ দিকে কিছুটা পথ গিয়ে বাচ্চার নির্দেশে মাথা নিচু করে এক বাড়ির উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছোট্ট উঠোন, তিন দিকে তিনখানা ঘর গোলপাতায় ছাওয়া। চালাগুলো উঠোনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইছে। এ ঘরের বৈশিষ্ট্য দেখলাম টেকনাফের মতো ক্যাংঘর নয়, অনেকটা আমাদের বাঙলা দেশের চাষীদের ঘরের মতো। বাঁশ চিরে চাঁচের বেড়া, মাটি আর গোবর দিয়ে লেপা। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় অবাক হয়ে চার দিক চাইছি। চোখে পড়লো উঠোনের পুব দিকের দাওয়ার উপর থেকে ডজনখানেক ছোটবড় মুরগী—কোঁকর-কোঁ, কোঁকর-কোঁ করে ছুটে ঘরের পিছনে বা কোনো আস্তাকুঁড়ে আশ্রয় নিলে। কাছেই কোথা থেকে একটা ছাগল ডেকে উঠলো। উঠোনে আমরা কয়েকটি প্রাণী প্রেতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। পা টিপে টিপে বাচ্চা পশ্চিমদিকের ঘরের দাওয়ায় উঠে ঘরের দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিলো। প্রায় মিনিটখানেক টোকা দেওয়ার পর আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল, তারপর বাইরে বেরিয়ে এল লুঙ্গি পরা মিশমিশে কালো বিশালকায় এক মুসলমান। উঠোনে নেমে আমাদের দেখে প্রথমটা বেশ ভড়কে গিয়েছে বুঝলাম। বাচ্চা কানে কানে কি বলতেই নিমেষে সব জড়তা দূর হয়ে গেল। সসম্মানে সেলাম করে ঘরের ভিতর থেকে একটা নতুন মাদুর তাড়াতাড়ি এনে উঠোনে পেতে দিয়ে আমাদের বসতে বললে। কি করবো না করবো ভাবছি, মজিদ সাহেব বললেন—বসুন ধীরাজবাবু। কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললাম—কিন্তু আমাদের যে কোন এক জমিদারবাড়ি বসতে দেবে ঠিক হয়েছিল। আমাদের মনোভাব বুঝতে পেরে পঞ্চু দাস তাড়াতাড়ি কাছে এসে চুপি চুপি বললে—হুজুর ইনিই হলেন মরিআলার জমিদার রমজান মিঞা। রমজান মিঞা সাদা দুধের মতো দু'পাটি ধবধবে দাঁতে এক গাল

হেসে বললেন—বস্ তক্। সুতো টিলে দেওয়া পুতুলনাচের পুতুলের মতো ঝুপঝাপ করে বসে পড়লাম আমি আর মজিদ সাহেব। বেশ বুঝতে পারলাম, মাত্বর পাতা না থাকলেও পথে-বিপথে বনেবাদাড়ে যেখানেই থাকতাম না কেন, এ খবর শুনবার পর ঐভাবে বসে পড়া ছাড়া আর আমাদের গত্যন্তর ছিল না।

বাচ্চা আমাদের কনস্টেবলদের নিয়ে লবণ-চোর আসামীদের বাড়ি ঘেরাও করতে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

দেখি জমিদার রমজান মিঞা তেমনি দু'পাটি দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছেন। কি বলি? বললাম—বসুন। প্রবলভাবে মাথা নাড়লেন রমজান মিঞা। তারপর বললেন—ছা, ছা খাইবেন তো?

মজিদ সাহেবের দিকে তাকালাম, প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেননি। একটু পরেই সোল্লাসে বলে উঠলেন—চা? একটু পেলে মন্দ হয় না। আর কোনো কথা না বলে ঐভাবে দন্ত বিকশিত করেই পুবদিকের ঘরে ঢুকে গেলেন জমিদার সাহেব।

জুতো-মোজা খুলে ফোস্কা-ওঠা পায়ের তলায় হাত বুলাতে বুলাতে বললাম—সারা পথ আসতে আসতে অনেক গবেষণার পর কি সিদ্ধান্ত করেছি জানেন? এ গাঁয়ের নাম মরিআলা নয়।

জুতো খুলছিলেন মজিদ সাহেব। এক পাটি খুলে হাতে নিয়ে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

বললাম—মরি আল্লা! কোন সে সুদূর অতীতে দু'জন ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই চিটাগং হিলস্-এর গভীর জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেন। অনাহারে, অনিদ্রায় পরমায়ুর জোরে বাঘ, হাতি, সাপ এদের অব্যর্থ হাত থেকে রক্ষা পেয়ে শুধু প্রাণটুকু নিয়ে এই জনমানবহীন সমুদ্রতীরে সমতল বালুরাশির উপর এসে পড়েন এবং কিছুক্ষণ বাদেই একজন মারা যান। মরবার আগে ক্ষোভে, অভিমানে আকাশে হাত তুলে শুধু দুটি কথা বলেন—মরি আল্লা! অর্থাৎ এতোগুলো বিপদ-আপদ থেকে বাঁচিয়ে নিরাপদস্থানে পৌঁছে দিয়ে তুমি আমার প্রাণটুকু নিলে নিষ্ঠুর খোদা! অপর সঙ্গীটির অবস্থাও শোচনীয়। সে শুধু বুঝলে মরবার আগে তার দোস্ত আল্লার নাম নিয়ে বেহেস্তে চলে গেল। তারপর একটি দুটি করে পরমায়ুগুলা

মুসলমান পথ ভুলে এখানে এসে বাস করতে শুরু করে দিলো। মৃত দোস্তের স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আগের লোকটি সকলকে বলে দিলে—এ গাঁয়ের নাম মরি আল্লা রাখতে। অনেকের পছন্দ হলো না, শেষ পর্যন্ত দু'দিক বজায় রেখে নাম রাখা হলো —মরিআলা। এই হলো মরিআলার সংক্ষিপ্ত ও সঠিক ইতিহাস। দেখি, জুতো হাতে মজিদ সাহেব তখনও হাঁ করে বসে আছেন। হেসে ফেললাম, বললাম—পথে যদি সুধীর আর মুখার্জির বাঙলোয় আশ্রয় না পেতাম, আমরাও হয় তো এতোক্ষণ এই বালুচরে শুয়ে হাত-পা ছুঁড়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতাম। তবে আকাশের দিকে চেয়ে ইষ্টদেবের নাম নিতাম কিনা বলতে পারি না।

হো হো করে হেসে উঠলেন মজিদ সাহেব। বললেন—আপনি তো অদ্ভুত লোক মশাই, এতো কষ্টের মধ্যেও…। থেমে গেলেন মজিদ সাহেব। দেখলাম কলাইওঠা দুটো স্টীলের বাটিতে কালো ঝোলের মতো কি এক তরল পদার্থ নিয়ে রমজান মিঞা হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাটি দুটো হাত থেকে নিয়ে ভদ্রতার খাতিরে বললাম,—আপনার কই? যেন গালে চড় মারলেন মিঞা সাহেব—আঁই তো ন খাই!

আমরা চা খেলাম। পুবদিকের ঘরের ভিতর থেকে একটা বাচ্চা ছেলে না মেয়ে কেঁদে উঠলো—হয় তো জমিদারবাবুকে ডাকবার ঘণ্টা। মিঞা সাহেব তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেলেন।

সূর্য তখন ভালো করে না উঠলেও বেশ ফর্সা হয়ে গিয়েছে। চারদিক দেখে নিয়ে গলা খাটো করে বললেন মজিদ সাহেব—ও ধীরাজবাবু! জমিদার সাহেবের যা নমুনা দেখলাম, তাতে মনে হয় প্রজাদের ঘর-বাড়িই নেই। তারা বোধ হয় দিনে গাছতলায়, আর রাতে গাছের ডালে বাস করে।

উত্তরে কি একটা বলতে যাচ্ছিলাম, দেখি আমার অনুমানই ঠিক। দুটো চায়ের ডিশে গরম অমলেট নিয়ে হাসিমুখে আসছেন জমিদার সাহেব, হাত থেকে নিয়ে খেতে শুরু করে দিলাম, এবার আর ভদ্রতা করে ওঁকেও খেতে বললাম না। খাওয়া শেষ করে ভালো করে চারদিক তাকালাম। দেখলাম উঠোনটা ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, গোবর দিয়ে নিকোনো। তিনদিকে

মাঝারি তিনখানা ঘর, উঁচু মাটির দাওয়া। দাওয়ায় বসলে বাইরের কিছু আর নজরে পড়ে না—উপর থেকে চালাটা প্রায় উঠোন পর্যন্ত নামানো। মজিদ সাহেবকে বললাম—চালাগুলো অতো নিচু করে নামিয়ে দেওয়ার মানে কি বলতে পারেন?

মজিদ সাহেব বললেন—হয় তো ওর দ্বারা জমিদারবাড়ির আব্রু খানিকটা রক্ষা হয়। কথাটায় যুক্তি আছে বলে মনে হলো।

বেলা বেড়ে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের তাপও বাড়ে। আমাদের সঙ্গীদের বা বিভীষণ-বাচ্চার তবুও দেখা নেই। ওরা যেন এই বালুচরের চোরাবালির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, আর ফিরবে না।

আরও আধ ঘণ্টা বাদে পঞ্চু দাস ও আর সব কনস্টেবলরা ফিরে এল। পঞ্চু জানালে লবণ কোথাও পাওয়া গেল না। ঘুম থেকে উঠবার আগেই বাচ্চার নির্দেশ মতো বাড়িগুলো ঘেরাও করা হয়েছিল; কিন্তু ওরা বোধ হয় আগেই খবর পেয়ে মাল সরিয়ে ফেলেছে।

সব শুনে গুম হয়ে রইলেন মজিদ সাহেব। তারপর বললেন—বাচ্চা কোথায়, সেই ঘর-শত্রু বিভীষণ-বাচ্চা?

পঞ্চু বললে—বাচ্চা খুব ঘাবড়ে গিয়েছে। আরও দু'তিনটে বাড়িতে খবর নিয়ে একটু বাদেই আসছে। দক্ষিণ দিক থেকে ছোট ছেলেমেয়ের হাসি-হল্লার আওয়াজ ভেসে এল। পঞ্চু এগিয়ে গিয়ে দেখে এসে বললে—বাচ্চা আসছে হুজুর। মজিদ সাহেব ও আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম, বাচ্চা আসছে তা ওরকম প্রোসেশন করে আসছে কেন? একটু পরেই বুঝলাম। দেখি একটি বুড়ীকে প্রায় চ্যাংদোলা করে সোল্লাসে আমাদের কাছে এনে নামিয়ে দিলে বাচ্চা। বুকের উপর দু'হাত দিয়ে একটা মাঝারি মাটির হাঁড়ি জড়িয়ে ধরে আছে বুড়ী, তাতে রয়েছে খুব বেশি হলেও সের চারেক লবণ। বাচ্চা ও বুড়ীর পিছনে এসে দাঁড়ালো প্রায় বারো-চোদ্দটি ছোট ছেলেমেয়ে। মনে হলো মজা দেখতে এসেছে। চেহারা দেখে বুড়ীর বয়স ধরবার উপায় নেই। সারা মুখখানা কুঁচকে গিয়েছে, সেই কুঞ্চিত অসংখ্য রেখায় ধরা পড়ে তার বেদনা-বিধ্বস্ত জীবনের ইতিহাস। ঐ রেখা আর কোঁচকানো চামড়ার মধ্যে ছোট্ট চোখ দুটি হারিয়ে গিয়েছে।

মাথার চুল শাদা দুধের মতো, ছোট করে ছাঁটা। পরনে শতছিন্ন ময়লা আধখানা কাপড় বুড়ীর লজ্জা নিবারণের বৃথা চেষ্টা করে করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। ফোকলা দাঁতে হাউ হাউ করে বুড়ী কি যে বলে গেল, এক বর্ণও বুঝলাম না। পিছনে হুজুগপ্রিয় ছেলের দল হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো। ক্রুদ্ধ চোখে মজিদ সাহেব তাকাতেই পঞ্চু ও তিন চারটে কনস্টেবল তাদের ছত্রভঙ্গ করে দূরে সরিয়ে দিলে। দেখলাম, রাগে মজিদ সাহেবের চোখ-মুখ লাল হয়ে গিয়েছে। পঞ্চুকে বললেন—বুড়ী কি বলতে চাইছে পঞ্চু, আর বাচ্চা ব্যাটাচ্ছেলে একেই বা ধরে আনলে কেন ?

পঞ্চু বললে—বুড়ী বলছে হুজুর, আজ ক'দিন হলো ওকে ওর নাতি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর বলে দিয়েছে সে আর বুড়ীকে খেতে দিতে পারবে না। দু'দিন অনাহারে পথে পথে কাটায় বুড়ী, তারপর এক প্রতিবেশীর কথায় সমুদ্দুর থেকে জল নিয়ে মাটির হাঁড়িতে করে জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি করে। পাড়ায় পাড়ায় এক পয়সা আধ পয়সা বিক্রি করে করে তা দিয়ে কোনো মতে একবেলা খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। আজও নিয়মমতো লবণের হাঁড়ি নিয়ে বুড়ী পাড়ায় বিক্রি করতে যাবে, এমন সময় হঠাৎ বাচ্চা গিয়ে ওকে ধরে নিয়ে এসেছে।

রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে লাগলেন মজিদ সাহেব।

বললাম—বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করো তো পঞ্চু, ওর বয়েস কতো ? পঞ্চুর প্রশ্নের উত্তরে হাউ হাউ করে কী যে বললে বুড়ী বুঝতে পারলাম না।

পঞ্চু বললে—হুজুর, বুড়ী বলছে বয়েসের হিসেব ওর নেই, তবে আন্দাজ ছ'কুড়ির কাছাকাছি হবে।

—ওর নাতির বয়স কতো ?

পঞ্চু বুড়ীকে জিজ্ঞাসা করে বললে—খুব ছোটবেলা থেকে মা-হারা এই নাতিটিকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে বুড়ী। এর বয়েস বুড়ীর ঠিক মনে আছে, তিন কুড়ি দুই।

বুড়ীর মুখের দিকে চাইলাম, মনে হলো যেন নাতির প্রসঙ্গে বুড়ীর কোঁচকানো মুখখানা ক্ষণিকের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হয় তো বা আমার মনেরই ভুল।

হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন মজিদ সাহেব—বাচ্চা!

নিমেষে চার পাশের সব গুঞ্জন থেমে গেল। ততোক্ষণে সকলের পিছনে আত্মগোপন করে দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চা।

—সামনে আয় শয়তানের বাচ্চা। আজ তোকে কুকুরের মতো গুলী করে মারবো। তাতে যদি আমার ফাঁসিও হয়, সেও ভি আচ্ছা। রাগে কাঁপতে কাঁপতে রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়ালেন মজিদ সাহেব।

তাড়াতাড়ি উঠে রাইফেলসুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরে বললাম—কী ছেলেমানুষী করছেন মজিদ সাহেব, বসুন।

—আপনি একে ছেলেমানুষী বলছেন ধীরাজবাবু? এই চার সের লবণ ধরবার জন্য ব্যাটা আজ চারদিন ধরে কী কষ্টটাই দিয়েছে বলুন তো? আর আসামী হলো দেড় শ' বছরের এক অথর্ব বুড়ী। আমায় ছেড়ে দিন ধীরাজবাবু। বনের বাঘ-ভালুক-সাপ মারলে গভর্নমেণ্ট পুরস্কার দেয়, আর এ ব্যাটাকে মারলে হবে আমার শাস্তি? অদ্ভুত আইন। তাই হোক—তবু গাঁয়ের গরীব লোকগুলো এই শয়তান বিভীষণের হাত থেকে বাঁচবে।

এরকম রাগতে কোনোদিন দেখিনি মজিদ সাহেবকে। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করে বসালাম মাদুরের উপর।

রোদ্দুরে ছোট্ট উঠোনটা ভরে গিয়েছিল। রমজান মিঞা আর পঞ্চু এসে মাদুরটা তুলে উত্তরের ঘরের দাওয়ায় পেতে দিলে। দাওয়ায় উঠবার আগে মজিদ সাহেব বুড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর মনিব্যাগ থেকে একটা রূপোর টাকা বার করে বুড়ীর হাতে দিয়ে বললেন—বুড়ী-মা, আমিই দারোগা সাহেব। আমি তোমায় বলে যাচ্ছি, যতোদিন তুমি বাঁচবে, সমুদ্দুরের জল ফুটিয়ে লবণ তৈরি করে বিক্রি করবে। টাকাটা হাতে নিয়ে দেখি বুড়ী হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মজিদ সাহেব বললেন—পঞ্চু, আমার কথাগুলো বুড়ীকে বুঝিয়ে দাও, আর লবণের হাঁড়ি নিয়ে ওকে বাড়ি যেতে বলো। পঞ্চুর কথা শুনে বুড়ীর রেখাবহুল কুঞ্চিত মুখে মুহূর্তের জন্য ছুটো চোখের আভাস পেলাম। এক ফোঁটা জলও যেন কুৎসিত মুখের উপর দিয়ে গড়িয়ে উঠোনের ধুলোর সঙ্গে মিশে গেল। বোধ হয় মনে

মনে মজিদ সাহেবের দীর্ঘজীবন কামনা করলো বুড়ী, তারপর মাটি থেকে লবণের হাঁড়িটা তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। মজিদ সাহেবের ভিতরকার মানুষটার পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধায় রুদ্ধবাক হয়ে শুধু চেয়েই রইলাম। বেলা বাড়তে লাগলো।

দুপুরে জমিদার রমজান মিঞা আমাদের খাওয়ালেন মোটা চালের ভাত আর খাশির মাংস। চমৎকার লাগলো। খাওয়া দাওয়া সেরে দাওয়ায় মাদুরের উপর হাত-বালিস করে দু'জনে একটু বিশ্রামের আয়োজন করলাম। একটু পরেই শুনি মজিদ সাহেবের নাক ডাকছে। কি জানি কেন আমার ঘুম এল না, রাজ্যের চিন্তা দল বেঁধে আমার চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো। সব ছাপিয়ে মজিদ সাহেবের কথাটাই বার বার মনের দুয়ারে ঘা দিতে লাগলো। ছাত্র হিসেবে ব্রিলিয়েণ্ট মেধাবী ছেলে, পড়াশুনা করলে অনায়াসে একদিন বিলেত থেকে আই.সি.এস. বা ঐ ধরনের হোমরা-চোমরা হয়ে এদেশে মোটা চাকরি নিয়ে পায়ের উপর পা দিয়ে বাকি জীবনটা তোফা কাটিয়ে দিতে পারতেন, তা না করে দাদার বিলেতের খরচ যোগাবার জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে এই সুদূর জঙ্গলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাকরি নিয়ে এসেছেন। কে জানে হয় তো ঐ দাদাই বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে সবার আগে মজিদ সাহেবের সঙ্গেই সম্পর্ক ছিন্ন করে দেবেন। অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। হাত ভেরে গিয়েছিল। হাত বদলে পাশ ফিরে শোবার উদ্যোগ করছি। সমুদ্রের ডাক ছাপিয়ে কানে ভেসে এল একটা হৈ-হল্লার সঙ্গে ছেলেপিলের কান্নার আওয়াজ। দাওয়া থেকে উঠে উঠোনে নেমে দাঁড়ালাম। দেখলাম শতছিন্ন ময়লা তেল কুটকুটে একখানা লুঙ্গি পরে বছর .পঁয়ত্রিশের একটি রোগা ফর্সা মুসলমান বাঁক কাঁধে এইদিকে আসছে—আর তাকে ঘিরে বিজয় গর্বে হল্লা করতে করতে আসছে আমাদের কনস্টেবলের দল ও বাচ্চা। সবার পিছনে বুকফাটা কান্না কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে আসছে দু'বছর থেকে তেরো-চৌদ্দ বছরের উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ

এক পাল ছেলে মেয়ে। মজিদ সাহেবও ইতিমধ্যে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। বাঁক উঠোনে নামাতেই দেখলাম দু' ঝুড়ি লবণ শালপাতা দিয়ে ঢাকা। রমজান মিঞা ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন দেখে মজিদ সাহেব তাঁকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। ছেলেমেয়েগুলো ততোক্ষণে লোকটাকে ঘিরে এক সঙ্গে কাঁদতে শুরু করে দিয়েছে। বাচ্চা কষে এক ধমক দিতেই দেখি চুপ হয়ে গিয়ে নিঃশব্দে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

রমজান মিঞাকে মজিদ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি বলুন তো? এ লোকটা কে আর এ ছেলেমেয়েগুলোই বা ওকে ঘিরে কাঁদছে কেন?

রমজান মিঞার ভাষা সব বুঝতে না পারলেও আসল ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হলো না। লোকটার নাম সিমুরালী, আলী বলে সবাই ডাকে। একপাল ছেলেমেয়ে, বড্ডো গরীব, তার উপর গেল বছর স্ত্রী মারা গিয়েছে। সমুদ্রের জল দিয়ে লবণ তৈরি করে সপ্তাহে একদিন বাঁকে করে নীলার হাটে বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে সবার এক বেলাও ভালো করে খাওয়া জোটে না। ভয়ে বিবর্ণ মুখে আমাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে আলী। রোগা ডিগডিগে হাড়-বের-করা বুকের উপর পাতলা ফিনফিনে চামড়ার আবরণ, তার নিচে প্রাণটা কোনো মতে ধুক ধুক করে শুধু জানিয়ে দিচ্ছে যে, ও বেঁচে আছে। মেয়েটি বড়, কিন্তু অনাহারে ও অযত্নে আর বাড়তে পায়নি। বয়েস পনেরো হলেও ও যেন দশের গণ্ডিতে আটকে আছে। মাথার ঈষৎ সোনালি চুল তেলের অভাবে রুক্ষ-বিবর্ণ; হাত দিয়ে চাপড়ালে ধুলো ওড়ে। পরনে অসংখ্য তালি দেওয়া ময়লা আবরণ। বোধ হয় ওর মায়ের পুরানো শাড়ি। ওর মধ্যে দুটি ছেলেকে দেখলাম ছেঁড়া ময়লা হাতখানেক লম্বা পরিত্যক্ত লুঙ্গির একটা অংশ লেংটির মতো করে পরা। দেখলেই মনে হয় কিছু না পরলেই যেন ছিল ভালো। পরের গুলোর আর কোনোই বালাই নেই, সব উলঙ্গ! কোনো কথা না বলে মজিদ সাহেব এক পা দু' পা করে পশ্চিমে সমুদ্রের ধারে চললেন। একটু অবাক হয়েই জোরে পা চালিয়ে সঙ্গ নিলাম।

আমার দিকে না চেয়েই মজিদ সাহেব বললেন—এখন কি করি বলুন তো ধীরাজবাবু! বুড়ীকে ছেড়ে দিয়েছিলাম কেন না চার সের লবণ আবগারি আইনে পড়ে না। কিন্তু এই লোকটার দু' ঝুড়ি লবণ আধ মণের বেশি হবে। যদি ছেড়ে দিই ওরা সবাই ফিরে গিয়ে ওপরওলাকে পাঁচখানা করে লাগাবে আমার নামে। যদি কেস টেক-আপ করি লবণ সমেত আলীকে নিয়ে যেতে হবে নীলায়। তার পর কোর্টে কেস উঠলে অন্ততঃ দশ টাকা ফাইন ওর হবেই, না দিতে পারলে মাসখানেক জেল।

সত্যিই জটিল সমস্যা। কি জবাব দেবো, চুপ করে রইলাম।

মজিদ সাহেব বললেন—দশটা আধলা দেবার ক্ষমতা যার নেই সে দেবে দশ টাকা ফাইন আর জেল হলে তো কাচ্চা বাচ্চাগুলো না খেয়েই মরবে'! নাঃ, কেন যে মরতে এ চাকরি নিয়েছিলাম!

সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালাম। শাদা ফেনায় ভর্তি উন্মত্ত ঢেউগুলোর মাতামাতি দেখছি, কানে ভেসে আসছে শুধু সাগরের একঘেয়ে নিষ্ফল গর্জন। আর কিছুই শোনা যায় না। কতোক্ষণ একভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। হঠাৎ মজিদ সাহেবের দিকে নজর পড়লো—তাঁর চোখে জল। নোনা ঢেউ-এর দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে এমনিতেই চোখে জল আসে, তাই? না—মজিদ সাহেবের কাছে গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম। একইভাবে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন—খোদার দেওয়া সমুদ্দুর, তার জল জ্বাল দিয়ে নুন তৈরি করা মানুষের আইনে অপরাধ। আর সেই অপরাধের শাস্তি দেবার জন্য চাকরি নিয়েছি আমরা! ধুত্তোরি; এ চাকরি আমি ছেড়ে দেবো ধীরাজবাবু।

বললাম—দাদার বিলেতের খরচ?

—তাও ভেবে দেখেছি আমি, কলকাতায় গিয়ে দু'-একটা টিউশনি আর অন্য যে কোনো চাকরির চেষ্টা করবো। পাই ভালোই, না পাই রাবেয়ার পড়া বন্ধ করে দেবো। কী হবে মেয়েছেলের অতো লেখাপড়া শিখে!

এর আর কোনো উত্তর নেই। চুপ করে রইলাম।

মজিদ সাহেব বললেন—তা ছাড়া অনেক ভেবে এই বুঝলাম যে, আমি এ চাকরির মোটেই যোগ্য নই, একেবারে মিস ফিট।

ভাই—ধিকি নাকে নাকা ধিন। তোমার ঠেকার উপরেই নির্ভর করছে আমার গানের সব মজাটা। গাইলাম—

ঘরকাম সুন্দরী লো—
চরখার বাজনা শুইন্যা যাইলো যাই।
[অ্যাঁ হুঁ অ্যাঁ, অ্যাঁ হুঁ অ্যাঁ, অ্যাঁ হুঁ অ্যাঁ (তেহাই)।]

গান থামিয়ে বললাম—মাপ করো ভাই একটু রসভঙ্গ করছি। গানটার মজা হলো এই, যদি ঠিক তালে লয়ে গাওয়া যায় তাহলে চোখ বুঝে শুনলে মনে হবে একটা লোক ঘ্যাং ঘ্যাং ঘ্যাং একটানা চরকা ঘুরিয়ে সুতো কাটছে। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়েছিল। লেকচার থামিয়ে আবার গান শুরু করলাম—

ও ভাই আলোচাল আর কাচকলা
চরখার গোড়ে থুইয়া
মাগী একলা একলা বানায় কাপড়
আমার দিকে চাইয়া।

নাগরালি কুম কুম
বক কুম কুম কুম
সুনা দই পুড়া দই
ভিজা দই তামুক খাই।
ঘরকাম সুন্দরী লো—
চরখার বাজনা শুইন্যা যাইলো যাই।
[অ্যাঁ হুঁ অ্যাঁ ইত্যাদি]

ও ভাই নারাণগঞ্জের সুতা আমার
মাণিকগঞ্জের পাটি
চরখার দৌলতে আমার
দুয়ারে বান্ধা হাতি।

নাগরালি কুম কুম
বক কুম কুম কুম

শুনা দই পুড়া দই
ভিজা দই তামুক খাই !
ঘর কাম সুন্দরী লো—ও—ও

গান শেষ করে আমি থামতে চাই ওরা থামতে দেয় না, বলে আবার গাও। দু'তিনবার গেয়ে থেমে হাঁপাতে লাগলাম। আমি যেন আজ 'বন গাঁয়ে শেয়াল রাজা'। সবার প্রশংসার জয়মাল্য আমি ছাড়া নেবার আর কেউ নেই। এরপর আর দু' তিনখানা পুরোনো দেহতত্ত্ব গাইবার পর সবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সভা ভঙ্গ করতে হলো। তা না হলে ভোর চারটেয় উঠে নীলায় রওনা হওয়া সম্ভব হবে না।

স্মরণীয় কয়েকটি জিনিসের মধ্যে মুখার্জির বাংলোর এ সন্ধ্যাটির কথা কোনো দিনই ভুলতে পারবো না।

ভোর পাঁচটা থেকে অবিশ্রাম হেঁটে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্য সুধীরের বাংলোয় থেমে একটু চা খেয়ে নিয়ে নীলার আবগারি আপিসে যখন পৌঁছলাম তখন সন্ধ্যা সাতটা বেজে গিয়েছে। শুনলাম, টেকনাফ যাবার শেষ স্টীমার নীলা থেকে ছাড়ে ঠিক আটটায়। মজিদ সাহেব রাত্তিরটা থেকে বিশ্রাম করে ভোরের স্টীমারে যাবার জন্যে অনেক পীড়াপীড়ি করলেন, রাজী হলাম না। সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে যাত্রার জন্য তৈরি হতে লাগলাম। পাশের বারান্দায় মজিদ সাহেবের গলা পেলাম।

—এই দশটা টাকা রেখে দাও, কোর্টে ফাইন হলে এটা দিয়ে দিও।

কৌতূহলী হয়ে উঠে পাশের জানলায় গিয়ে দেখি বারান্দার একটা অন্ধকার কোণে দাঁড়িয়ে আছেন মজিদ সাহেব ও লবণচোর আলী। আলী আস্তে আস্তে কি বললে শুনতে পেলাম না। দেখলাম, পকেট থেকে খুচরো পাঁচটা টাকা বের করে আলীর হাতে দিয়ে মজিদ সাহেব বললেন—বাড়ি যাবার সময় এ থেকে তোমার বড়মেয়ের একখানা শাড়ি কিনবে আর ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু খেলনা। বাকি যা থাকবে তা দিয়ে কিছু খাবার কিনে নিয়ে যেও।

অন্ধকারে কোনো কথা না বলে আলী হঠাৎ মজিদ সাহেবের পা দুটো জড়িয়ে ধরে মাটিতে মুখ গুজড়ে পড়ে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো; আস্তে আস্তে তাকে তুলে দাঁড় করালেন মজিদ সাহেব তারপর কাছে টেনে এনে বললেন—আমি হুকুম দিয়ে যাচ্ছি আলী, বাড়ি গিয়ে যতো খুশি লবণ তৈরি করবি আর নীলার হাটে এনে বেচবি।

এবার সত্যিই বুঝতে পারলাম মজিদ সাহেব ফিরে গিয়েই চাকরি ছেড়ে দেবেন। আলীকে মরিআলায় ছেড়ে দিয়ে এলে সরকারের কাছে নেমকহারামি হতো, তাই আইনের মর্যাদা রাখতে বামাল সমেত আসামী সঙ্গে নিয়ে এসে তার জরিমানার টাকা মায় উপরি কিছু ছেলেমেয়ের জন্য দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করলেন। অভিভূত হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এরকম লোক এখনো দু'-একটি সংসারে আছে বলেই বোধ হয় চন্দ্র সূর্য ওঠে।

স্টীমারের বাঁশি বেজে উঠলো। আবগারি আপিসের পাশেই স্টীমারঘাট। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখি অন্ধকার বারান্দায় একা চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছেন মজিদ সাহেব। পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে শুধু বললাম—চলি।

একটু যেন চমকে উঠলেন মজিদ সাহেব। তারপর বললেন—উঁহুঁ, এখান থেকে বিদায় নেওয়া চলবে না। চলুন স্টীমারে তুলে দিয়ে আসি।

অনেক আপত্তি করলাম, বললাম—এই তো পাশেই, কেন আর কষ্ট করবেন। পোশাক ছেড়ে একটু বিশ্রাম করুন। কোনো ফল হলো না। স্টীমারঘাটে এসে দেখি সময় হয়ে গিয়েছে। আড়ম্বরহীন বিদায়ের পালা শেষ হতে দেরি হলো না। শুধু হাত দুটো ধরে একটুখানি সময় মজিদ সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি কাঠের চওড়া তক্তার উপর দিয়ে স্টীমারে উঠলাম। আমিই শেষ প্যাসেঞ্জার, স্টীমার ছেড়ে দিলে। লোহার রেলিংটা ধরে তীরের দিকে চেয়ে দেখি, তখনও মজিদ সাহেব দাঁড়িয়ে আছেন। আস্তে আস্তে ডান হাতখানা উপরে তুলে নাড়াতে লাগলাম, মনে মনে বললাম—বিদায় বন্ধু! জীবনের অনেক কিছুই হয় তো একদিন ভুলে যাবো, তোমায় কিন্তু কোনো দিনই ভুলবো না।

দেখি পকেট থেকে সাদা ধবধবে একখানা রুমাল বার করলেন মজিদ সাহেব, ভাবলাম ঐটে দিয়েই বোধ হয় শেষ অভিনন্দন জানাবেন—দেখলাম, হাত উপরে উঠলো না, মাঝপথে থেমে গিয়েছে। রুমাল দিয়ে মজিদ সাহেব চোখ মুছলেন।

নাফ নদীর মাঝখান দিয়ে স্টীমার তখন বেশ স্পীডে চলেছে।

আবার টেকনাফ। স্টীমার থেকে নেমে থানার পথে আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে চলেছি, একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। আলো, আলোর সমারোহ। কে যেন ছোট্ট টেকনাফকে আলোর জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। কানে ভেসে এল পঁচিশ-ত্রিশটি বিভিন্ন যন্ত্রের সম্মিলিত মধুর ঐকতানের আওয়াজ। সবগুলোই আসছে বাজারের দিক থেকে। বুকের স্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠলো। তবে কি আমার আসতে দেরি হয়েছে বলে অন্য কারও সঙ্গে মাথিনের—আর ভাবতে পারলাম না। একটু একটু করে এগোতে লাগলাম। আমার অনুমানই ঠিক। মাথিনদের বাড়ির পিছনে নিবারণবাবুর দোকানের সামনের খালি জায়গাটায় যেখানে হাট বসে সেখানে বিচিত্র পোশাক পরে টেকনাফের সমস্ত বাসিন্দারা জড়ো হয়েছে। সবার পিছনে দাঁড়িয়ে মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে চারদিক চাইতে লাগলাম। শুধু মাথা আর মাথা, এতোগুলি মানুষ এক সঙ্গে, এ দৃশ্য টেকনাফে এর আগে কোনোদিন দেখিনি। মনে হলো শুধু টেকনাফ নয়, কাছে দূরের অনেক গ্রাম থেকেও লোক এসেছে। হাটের চারদিকে বাঁশ পুঁতে পাঞ্চ লাইটের আলো ঝুলিয়ে দিয়েছে। নিচে মাটিতে অসংখ্য গ্যাসের আলো। অতি কষ্টে একটু একটু করে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে অপরিচিত মুখের উপর চোখ বোলাতে বোলাতে মাঝখানে এসে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। দেখলাম ঠিক মাঝখানে হাতলওলা দু'খানা চেয়ারে পা তুলে বসে দিব্যি আরামে পান চিবুচ্ছেন থানার মহেন্দ্রবাবু আর যতীনবাবু, পিছনে হাতখানেক দূরে মাটিতে একখানা পানের রেকাবি হাতে বকের

মতো গলা বাড়িয়ে উবু হয়ে বসে আছেন দোকানি নিবারণবাবু। হিজ মাস্টারস ভয়েস-এর বহু প্রসিদ্ধ ট্রেডমার্ক ছবিটার কথা মনে পড়ে গেল। কিছু দূরে পশ্চিমদিকে একখানা সরু কাঠের বেঞ্চির উপর বসে রয়েছে থানার কনস্টেবলের দল। শুধু অনেক খুঁজেও হরকি আর রমেশকে দেখতে পেলাম না কোথাও। কিন্তু কিসের এ সমারোহ? কার জন্য এ উৎসব আয়োজন? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি! হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে বাজারের একটি মুখচেনা বাঙালী দোকানদারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার কাছে ব্যাপারটা শুনে খানিকটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। প্রতি বছর চৈত্র-সংক্রান্তির পর হাটে এই উৎসবটি হয়। এর সমস্ত ব্যয়ভার দোকানদাররাই বহন করে। এ উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হলো বর্মীদের বিখ্যাত পোয়ে নাচ। এ নৃত্যের নাম খ্যাতি শোনা ছিল, দেখার সৌভাগ্য এতোদিন হয়ে ওঠেনি। অকারণ মনটা খানিক খুশি হয়ে উঠলো। মাথিনদের দোতলার দেড় হাত জানলাটার দিকে উৎসুক হয়ে তাকালাম, বন্ধ জানলায় সে দৃষ্টি ঘা খেয়ে ফিরে এল। হতাশ দৃষ্টিতে চারদিকে চাইতে চাইতে দেখি, উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা বাঁশ হেলান দিয়ে উৎসব মঞ্চের দিকে পিছন ফিরে নির্লিপ্ত সমাহিতের মতো হাত দুটো বুকের উপর রেখে এক বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে কনস্টেবল সতীশ। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখি, কাছেই অপেক্ষাকৃত অন্ধকারে বিচিত্র সাজে বসে রয়েছে অগুনতি মগী মেয়ের দল। সতীশের ওখানে দাঁড়ানোর অর্থ খানিকটা বুঝতে পারলাম। পাগলের মতো বিস্ফারিত ব্যাকুল চোখে ঐ অন্ধকার ভেদ করে মাথিনকে খুঁজতে লাগলাম। ওরই মধ্যে কোথাও বসে আছে হয় তো, এখনই দেখতে পাবো। সতীশকে ওভাবে এখানে দাঁড়াতে দেখে মাথিনের উপস্থিতি সম্বন্ধে সন্দেহের আর অবকাশ রইলো না। ঐ না কিছুদূরে অন্ধকারে কয়েকটি মেয়ে বসে রয়েছে? ওর মধ্যে ঠিক মাথিনের মতো—অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছি না, দু'হাত দিয়ে ভিড় ঠেলে এগোতে যাবো, হঠাৎ ড্রামের বিকট আওয়াজের সঙ্গে অনেকগুলো যন্ত্র একসঙ্গে বেজে উঠলো। আর এক পা-ও এগোতে পারলাম না। চেয়ে দেখি, বাঁশ চিরে বেড়া দিয়ে খানিকটা

জায়গা গোল করে ঘেরা, বেড়ার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে খত্তাল থেকে শুরু করে অসংখ্য অজানা বাদ্যযন্ত্র। বেড়ার মাঝখানে ছোট নিচু একটা বেতের মোড়ায় বসে রয়েছে ঝকঝকে পোশাক পরা একটি মগ বা বার্মিজ যুবক। মাটিতে ওর চারপাশে রাখা আছে একটা বড় ড্রামের সঙ্গে ঐ জাতীয় আরও পাঁচ ছ'টি তবলা বা খোলের মতো চামড়ার বাদ্যযন্ত্র। দু'খানা কাঠি হাতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ও একাই বাজাচ্ছে ঐ বিভিন্ন যন্ত্রগুলো। প্রথমে আস্তে আস্তে, পরে যখন তাল লয় বেড়ে যায় তখন হাত দুটো আর দেখা যায় না। শুধু মনে হয়, ঐ বেড়ার মধ্যে একটা লোক চরকির মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। চোখ বুজে কাছে দাঁড়িয়ে বা দূর থেকে শুনলে মনে হবে—অনেকগুলো লোক মিলে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে একটি মনোরম ঐকতান বাজাচ্ছে। চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না কিন্তু বিস্ময়কর সত্যি।

কিছুক্ষণ বাদে ঐকতান বাজনা থামলো। ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি মগ উঠে দাঁড়িয়ে ওদেরই ভাষায় খানিকক্ষণ কি বলে গেল, এক বর্ণও বুঝলাম না। বক্তৃতা শেষে সবাই সোরগোল করে হাততালি দিয়ে উঠলো। পাশের দোকানদার ছেলেটির শরণাপন্ন হলাম। শুনলাম, এবার ওদের বিখ্যাত পোয়ে নাচ হবে, খুব শক্ত নাচ। একটি লোক কন্সার্টের বেড়ার পাশে একটি শতরঞ্চি পেতে তার উপর ধপধপে শাদা একটা চাদর বিছিয়ে দিলো। আর একটি লোক হাত দুই উঁচু একটা গোল কাঠের টুল এনে ঐ চাদরের উপর ঠিক মাঝখানে রেখে দিলো। আবার ঐকতান শুরু হলো। সবিস্ময়ে দেখলাম, বেড়ার পাশ থেকে অপরূপ সাজে সজ্জিত একটি যুবতী ধীরে ধীরে এসে চাদরের উপর দাঁড়ালো। মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী, বোধ হয় বার্মিজই হবে। মাথায় ধামার মতো প্রকাণ্ড খোঁপা, তাতে রঙ-বেরঙের ফুল গোঁজা। গলায়, বাহুতে হাতে ফুলের অলঙ্কার। মেয়েটির পরনে সাদা দামী সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে ঐ রঙেরই ফতুয়া ও ওড়না, তাতে বিচিত্র সোনালি কাজ। ওড়নার দুই প্রান্ত হাতের চুড়ির সঙ্গে বাঁধা। হাসিমুখে হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করে নাচতে শুরু করলো মেয়েটি। আস্তে আস্তে হেলে দুলে এক বিচিত্র ঢং-এর নাচ। চারিদিক ঘুরে ঘুরে ঐ

প্রকাণ্ড খোঁপাশুদ্ধ মাথাটা ডানে বাঁয়ে হেলিয়ে এক অপরূপ ছন্দে নাচছে মেয়েটি। পিছনে ওড়নায় রয়েছে কারুকার্যমণ্ডিত নানা বিচিত্র অলঙ্করণ, হঠাৎ দূর থেকে দেখলে মনে হবে, একটি প্রজাপতি ফুলের বাগানে এ-গাছ থেকে ও-গাছে উড়ে বেড়াচ্ছে, কোনো ফুলই যেন ওর পছন্দ হচ্ছে না। এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ বিকট আর্তনাদ করে বাজনা থেমে গেল। মেয়েটি ভয়ে কুঁকড়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আবার শুরু হলো বাজনা। এবার খুব দ্রুত লয়ে। নাচও চললো তার সঙ্গে তাল রেখে। মনে হলো একটি দুষ্টু ছেলে ফুল তুলতে বাগানে ঢুকে প্রজাপতিকে তাড়া করছে; ওর সুন্দর বিচিত্র পাখনা দুটির উপরই তার লোভ। কাছে পেলে নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে নেবে। প্রাণ ভয়ে তাই ছুটে বেড়াচ্ছে প্রজাপতি। চক্ষের নিমিষে পায়ের দুটো বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে অনায়াসে লাফিয়ে উঠলো মেয়েটি কাঠের ঐ টুলের উপর। তারপর এক বিচিত্র ভঙ্গিতে হাত দুটো প্রসারিত করে চুপ করে দাঁড়ালো। যেন নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পাখনা মেলে দাঁড়ালো প্রজাপতি। বাজনা থেমে গেল। মুগ্ধ দর্শকের আনন্দোচ্ছ্বাস আর করতালিতে কানে তালা লাগবার উপক্রম।

মনে হলো বুঝি নাচ এইখানেই শেষ। একটু বিরতির পর দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড বেতের ঝুড়িতে অনেকগুলো ছুরি ছোরা এনে একটা লোক টুলের নিচে রাখলে। তা থেকে কতকগুলো হাতে করে তুলে নিয়ে মহেন্দ্রবাবু ও যতীনবাবুকে দেখাতে লাগলো। হাত দিয়ে ছোরাগুলোর ধার পরীক্ষা করে মহেন্দ্রবাবু ঘাড় নাড়ছেন, বুঝলুম সত্যিই ধার আছে। কৌতূহলী জনতা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলো। চকচকে ঐ ধারালো ছুরি ছোরাগুলো নিয়ে লোকটা টুলের চার পাশে সাজাতে লাগলো। টুলের নিচে থেকে শুরু করে সমস্ত চাদরটা ভরে গেল ছুরি ছোরায়। সাজানোর একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম। ধারালো দিকটা উপরে দিয়ে দাবার ছকের মতো ছোট চৌকো ঘরে চাদরটা ভরতি হয়ে গেল। এবার টুলের উপরে নজর পড়তেই দেখি, মুখে মন-ভোলানো হাসি মাখিয়ে মাত্র দুটি বুড়ো আঙুলের উপর ভর দিয়ে পাখনা মেলে বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে প্রজাপতি। আবার ধীরে ধীরে

বাজনা শুরু হলো, প্রজাপতি মড়ে উঠে তালে তালে হেলে দুলে ঐ ছোট্ট টুলটার উপর নাচতে লাগলো শুধু দুটি আঙুলের উপর ভর করে। সে এক অদ্ভুত বিচিত্র নাচ। লিখে বোঝানো যায় না, দেখে উপভোগ করতে হয়।

হঠাৎ বাজনার সুর তাল লয় গেল বদলে। আবার শুরু হলো প্রজাপতির প্রাণ নিয়ে ছুটোছুটি খেলা। চক্ষের নিমিষে ঝুপ করে লাফিয়ে পড়লো মেয়েটি ছুরি ভরতি চাদরটার উপর। সমবেত জনতা এক সঙ্গে হায় হায় করে উঠলো। ও হরি! চেয়ে দেখি বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে চৌকো ঘরে অক্ষত পায়ে দাঁড়িয়ে হাসছে মেয়েটি। শুধু এক মুহূর্ত। তার পরই দ্রুত লয়ে নাচ শুরু হলো—নিচে না তাকিয়ে অবলীলাক্রমে চৌকো ঘর থেকে চৌকো ঘর শুধু আঙুলের টো-এর উপর ভর দিয়ে নাচ। একটু অসাবধান হলে অথবা আঙুল ঐ ছোট্ট চৌকো ঘরে না পড়লে—শিউরে উঠে চোখ বুজলাম। পরবর্তী জীবনে নাচ অনেক রকম দেখেছি কিন্তু মৃত্যুর হাতছানিকে চ্যালেঞ্জ করে এরকম নাচ দেখিনি।

কিছুক্ষণ বাদে নাচ থেমে গেল। প্রশংসা উল্লাস করতালিতে ফেটে পড়লো জনতা, থামতেই চায় না। সবার অলক্ষ্যে আস্তে আস্তে থানার পথ ধরলাম।

আমার কোয়ার্টার্সের সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকলাম—হরকি! রমেশ! কোনো সাড়া নেই। একটু এগিয়ে দেখি বারান্দায় মশারি খাটিয়ে নাক ডাকিয়ে অকাতরে ঘুমোচ্ছে রমেশ। গা ধরে ঝাঁকানি দিতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বললাম—ব্যাপার কি? হরকি কোথায়?

রমেশ বললে—হরকির আজ তিনদিন খুব জ্বর, ঘরে শুয়ে আছে। আর সবাই গান শুনতে গিয়েছে, আমার ডিউটি পড়েছে থানা পাহারা দেবার।

হেসে ফেললাম, বললাম—চমৎকার ডিউটি দিচ্ছিলে। চোর এসে যদি ঘরশুদ্ধ তোমায় তুলে নিয়ে বে অব বেঙ্গলে ফেলে দিয়ে আসতো—নাক ডাকা বন্ধ হতো না। দরজা খোলো।

রমেশ তাড়াতাড়ি চাবি নিয়ে দরজা খুলে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিলো। জুতো মোজা খুলে জামাটা খুলতে যাবো বালিশের তলা

থেকে একখানা খামের চিঠি বার করে আমার হাতে দিয়ে রমেশ বললে—আপনি যাবার পরদিনই ওখানা এসেছে। চিঠি কলকাতা থেকে এসেছে, হাতের লেখা দেখে বুঝলাম বাবা লিখেছেন। জামা কাপড় ছাড়া হলো না—আলোটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে খাটের পাশে বসে পড়তে শুরু করলাম—

কল্যাণবরেষু

ধীউবাবা, অনেক দিন তোমার কোনও কুশল সংবাদ না পাইয়া বিশেষ চিন্তিত আছি। পত্র পাঠ উত্তর দিয়া চিন্তা দূর করিবে। পিতা-মাতার উপর অভিমানে অপরিণত-বুদ্ধি সন্তান অনেক সময় অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া এমন কিছু করিয়া বসে যাহার ফলে, শুধু তাহার একার নহে, পিতা-মাতার ভবিষ্যৎ জীবনও বিষময় দুর্বিষহ হইয়া উঠে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে এমন হীন কাজ তুমি কখনই করিবে না যাহাতে আমাদের উঁচু মাথা সকলের সামনে নিচু হইতে পারে। সম্প্রতি টেকনাফ হইতে বেনামী তোমার এক শুভাকাঙ্ক্ষীর পত্রে জানিলাম—তুমি নাকি ওখানে একটি মগের মেয়েকে বিবাহ করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছ। সরকারী কার্যে অবহেলা করিয়া দিবারাত্র মেয়েটির পিছনে পাগলের মতো ঘুড়িয়া বেড়াইতেছ—এমন কথাও পত্রে আছে। আমি বিশ্বাস করি নাই কিন্তু তোমার গর্ভধারিণীর একান্ত আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া লিখিলাম।

আমি জানি তুমি বুদ্ধিমান কর্তব্যনিষ্ঠ পিতৃ-মাতৃ ভক্ত। তথাপি পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি, তোমার পূর্বপুরুষ সকলেই নিষ্ঠাবান সদাচারী ব্রাহ্মণ বলিয়া বিখ্যাত। জীবনে তাঁহারা অপরের দাসত্ব করেন নাই, শুধু কুলাঙ্গার আমিই স্কুল মাস্টারি চাকুরি গ্রহণ করিয়াছি। শিষ্য যজমানকে শুধু দীক্ষা ও ধর্মোপদেশ দিয়াই সসম্মানে রাজার হালে তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। এখনও বহু শিষ্যসেবক আছেন, যাঁহারা

আমাকে দেবতার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন। আজ ক্ষণিক উত্তেজনার বশে তুমি যদি ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য এক মগের মেয়েকে বিবাহ কর, তাহা হইলে সমাজে ও অগণিত শিষ্যের নিকটে আমার মুখ দেখানই দুষ্কর হইয়া উঠিবে। উহাপেক্ষা মৃত্যু শতগুণে শ্রেয় ও কাম্য। কিছুদিন পূর্বে তোমার বড়দার বিয়োগ ব্যথাও বুক বাঁধিয়া সহ্য করিয়াছি, শুধু তোমার মুখের দিকে চাহিয়া। জানি না পূর্ব জন্মে এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছি, যাহার জন্য ভগবান এতবড় শাস্তি দিতে উদ্যত হইয়াছেন।

আর একটি কথা এই সঙ্গে তোমাকে জানাইয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। আমার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী—চট্টোপাধ্যায়কে তুমি ভালো রকমই জান। বহুদিন পূর্বে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই—পুত্র-কন্যার বিবাহ দিয়া পরস্পরে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইব। সম্প্রতি তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হওয়ায় তিনি আমাকে পূর্বের প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কন্যাটিকে আমরা দেখিয়া আসিয়াছি—অতি সুলক্ষণা সুন্দরী ও গৃহ-কর্ম-নিপুণা। তোমার অপছন্দ হইবে না। আমি পাকা কথা পর্যন্ত দিয়া আসিয়াছি ও জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি দিন স্থির করিয়াছি। তুমি পত্র পাঠমাত্র এক মাসের ছুটি লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিবে—ছুটি না পাওয়া গেলে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিতেও দ্বিধা করিবে না।

ধীউবাবা! আমার মান সম্মান মর্যাদা সব রক্ষার ভার তোমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। বাসাস্থ সর্বাঙ্গীণ কুশল জানিবে। ইতি—

নিত্য আশীর্বাদক
'বাবা'

পুনঃ—

এই পত্র পাওয়ার পূর্বেই যদি তুমি বিবাহ করিয়া থাক, তাহা হইলে আর আসিবার প্রয়োজন নাই।

আমি মনে করিব আর একটি পুত্র হারাইলাম। খুব কষ্ট হইলেও সহ্য করিবার ক্ষমতা আমার আছে। ইতি—
'বাবা'

একবার দু'বার তিনবার পড়লাম চিঠিটা। শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুটি যে সতীশ ছাড়া আর কেউ নয়, বুঝতে এতটুকু দেরি হলো না। কিন্তু এখন আমি কী করি! মাথার মধ্যে সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে; শুধু রক্তের অক্ষরে বাবার চিঠির শেষ কথাগুলো চোখের সামনে জ্বল জ্বল করতে লাগলো—ধীউবাবা! আমার মান সম্মান মর্যাদা সব রক্ষার ভার তোমার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। ইচ্ছে হচ্ছিলো চিৎকার করে বলি—কেন আপনি আমার মতো দুর্বল মেরুদণ্ডহীন সন্তানের উপর এতো বড় ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন বাবা? দম বন্ধ হয়ে আসছে, ঘরে একটু হাওয়া নেই। ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে সপ সপ করছে—তাড়াতাড়ি উঠে দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। কানে এল আনন্দ উৎসবে মত্ত অগণিত জনতার উল্লাস ধ্বনি—আজ টেকনাফের আকাশে বাতাসে খুশির প্লাবন—শুধু আমার অন্তরে মরুভূমির শুকনো ঝড়। আচ্ছা, সত্যি প্রচণ্ড ঝড় সেই সঙ্গে বৃষ্টি এসে ওদের ঐ উৎসব ভাসিয়ে দিতে পারে না? ওদের ঐ আনন্দ উল্লাস আমি যে আর সহ্য করতে পারছি নে। তাড়াতাড়ি উঠোনে নেমে উপরের দিকে চাইলাম। দেখি, বৈশাখের খামখেয়ালী আকাশ জলো মেঘে টলমল করছে, তবু এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়লো না। সে অভাব পূর্ণ করলেন ভগবান আমার চোখ দিয়ে। শ্রাবণের ধারা নামলো।

অপলক চোখে চেয়ে একভাবে বসে রাত কাটিয়েছেন কেউ কোনো দিন? আমি কাটিয়েছিলাম সে রাত খাটের উপর ঠায় বসে। কত রাত, ক'টা বাজে, কোনো খেয়াল ছিল না। দরজা খোলাই ছিল, ইচ্ছে করেই খিল দিইনি।

এক মুখ হাসি নিয়ে ঘরে ঢুকলো সতীশ। আমাকে ঐভাবে

বসে থাকতে দেখে বললে—এই যে, মরিআলা থেকে ফিরেছেন দেখছি। নাঃ সত্যি পুণ্যাত্মা লোক বলতেই হবে। তা না হলে অতোগুলো বিপদের ভিতর থেকে সুস্থ শরীরে ফিরে আসা—

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম—আমার সঙ্গে তোমার কোনো বিশেষ দরকার আছে কি ?

একটু আমতা আমতা করে সতীশ বললে—আজ্ঞে, আমার মানে—মহেন্দ্রবাবু ডাকছেন আপনাকে। একটু পরেই সামলে নিয়ে গলায় মধু ঢেলে বললে—আর একটা কথা হুজুর, মাথিনের সঙ্গে বিয়ের দিন কবে ঠিক করলেন ?

চলে যাচ্ছিলাম, ফিরে দাঁড়ালাম। সতীশের বীভৎস মুখের দিকে মিনিটখানেক চেয়ে থেকে ঈষৎ হেসে বললাম—যে দিন মেয়েঘটিত ব্যাপারে মগদের ঐ ধারালো সাড়ে তিন হাত দা' তোমাকে কেটে টুকরো টুকরো করবে, সেই দিন।

অপ্রত্যাশিত উত্তরে ভ্যাবাচাকা খেয়ে একেবারে থ' হয়ে গেল সতীশ। আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

উঠোনে পাতকুয়োর ধারে জ্বরে ধুঁকতে ধুঁকতে বালতি করে জল তুলছে হরকি। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। হরকি বললে—কাল রাতে যখন ডাকাডাকি করছিলেন, আমি তখন জেগে। বড্ডো জ্বর বলে উঠে আসতে পারিনি।

বললাম—থাক, সেজন্যে তোমার লজ্জা পেতে হবে না। এখন কেমন আছো ?

হরকি বললে—এখন জ্বর একটু কম, আবার বিকেলের দিকে না এলেই বাঁচি।

দেরি হয়ে যাচ্ছিলো। বললাম—হরকি অনেক কথা আছে। বিকেলের দিকে আমার সঙ্গে দেখা করো।

থানা-ঘরে ঢুকে দেখলাম, মহেন্দ্রবাবুর পাশে একটি সৌম্যদর্শন প্রৌঢ় মগ বসে সিগার খাচ্ছেন। পরনে দামী সিল্কের লুঙ্গি, গায়ে ফতুয়া, মাথায় সিল্কের রুমাল। বয়স পঞ্চাশের উপর, মাথার চুল শাদা, ভুরু শাদা। প্রকাণ্ড চওড়া মুখখানাতে দুটি বিরাট গোঁপ, তাও শাদা। লোকটার চোখে-মুখে সব সময় প্রচ্ছন্ন হাসি লেগে আছে—দেখলে শ্রদ্ধা হয়।

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। মহেন্দ্রবাবু বললেন—বসো। ইনিই এখানকার জমিদার ওয়াং থিন সাহেব, আর এই ধীরাজ।

হাত তুলে নমস্কার করলাম।

খুশি হয়ে প্রতি-নমস্কার করে ওয়াং থিন মগি-বাংলায় বললেন—বালো, বালো। নাম শুনেছিলাম, দেখলাম। বেটীর আমার পছন্দ খুব বালো—কি বলেন থানাগিরি?

অনিচ্ছায় শুকনো হাসি হেসে জমিদারকে খুশি করেন মহেন্দ্রবাবু—আজ্ঞে, তাতো বটেই, তাতো বটেই।

চুপ করে বসে আছি।

মহেন্দ্রবাবু বললেন—ধীরাজ, তুমি হরকিকে দিয়ে এঁর মেয়ে মাথিনকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলে?

বললাম—হ্যাঁ।

মহেন্দ্রবাবু—কথাটা ভালো করে ভেবে দেখেছিলে কি? তুমি বামুনের ছেলে হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মের একটি মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার সমাজ, তোমার বাবা-মা মত দেবেন কি?

আমি কিছু বলবার আগেই ওয়াং থিন বললেন—থাক, থাক, এতো বেস্তো হোবার কিছু নাই, তিন-চার দিন ভাবিয়ে পরে উত্তর দেবেন। আমার ঐ একটি মেয়ে। যদি বুঝেন সমাজ আপনাকে লিবে না, এইখানে থাকিয়ে যান। আমার জমি-জমা যা আছে আপনারই হোবে। আর যদি বুঝেন, ওকে লিয়ে গেলে গোলমাল হোবে না,—লিয়ে যাবেন। আমার কোষ্টো হবে—হোক—ও তো সুক পাবে।

ওয়াং থিন সাহেব যাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন, আমরাও উঠে নমস্কার জানালুম। হেসে প্রতি-নমস্কার করে নিবে-যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেলেন তিনি।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো।

মহেন্দ্রবাবুই প্রথম কথা বললেন—চট করে একটা কিছু করে বসো না। বেশ করে ভেবে-চিন্তে ঠিক করো, কি করবে। বিয়ের পর মাথিনকে নিয়ে কলকাতায় যাবে না এইখানেই থাকবে।

বললাম—ভাববার দরকার হবে না। আমি কি করবো ঠিক করে ফেলেছি।

মহেন্দ্রবাবু বললেন—কি ঠিক করেছো ?

গলা একটুও কাঁপলো না। বললাম—বিয়ে করবো না।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে রইলেন মহেন্দ্রবাবু, তারপর বললেন—কি বললে ? বিয়ে করবে না ?

বললাম—হ্যাঁ। বিয়ে আমি করবো না।

রাগে ফেটে পড়লেন মহেন্দ্রবাবু। টেবিলটায় প্রকাণ্ড একটা কিল মেরে বললেন—কী ভেবেছো তুমি, ছেলেখেলা ? এই মগ জাতটাকে এখনও তুমি চেনোনি। হয় মাথিনকে বিয়ে করে এইখানে থাকতে হবে তোমায়, নয় তো সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। এ দুটো ছাড়া অন্য পথ তোমার নেই তা জানো কি ?

অম্লানবদনে বললাম—জানি।

—তুমি মাথিনকে বিয়ে করবে না, এ কথাটা ওয়াং থিনের কানে গেলে তোমায় কেটে টুকরো টুকরো করবে। টেকনাফের সমস্ত পুলিস ফোর্সও তোমায় বাঁচতে পারবে না, সেটা জানো কি ?

বললাম—জানি।

হাল ছেড়ে দিয়ে চেয়ারটায় এলিয়ে পড়ে অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলেন মহেন্দ্রবাবু। উদ্দেশ্যহীনভাবে তালাবন্ধ ঠাণ্ডা ঘরের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। বিশ্বেশ্বর এসে কতকগুলো ডাকের চিঠি ও একখানা খবরের কাগজ এনে টেবিলের উপর রেখে দিয়ে গেল। সেগুলোর উপর চোখ বুলোতে বুলোতে মহেন্দ্রবাবু বললেন—প্রথমে ভেবেছিলাম, সরল সাদাসিধে ভালোমানুষ। ও-বাবা, এখন দেখছি তুমি একটি বিচ্ছু, শয়তান। এখন জলের মতো বুঝতে পারছি, এতো জায়গা থাকতে বড় সাহেব কেন তোমায় টেকনাফে বদলি করেছিল। সতীশের কথাই ঠিক, তোমার মতলব ছিল বিয়ের নাম করে মাথিনের সর্বনাশ করে চুপি চুপি এখান থেকে পালিয়ে যাওয়া। আর পালাবার পথও দেখছি ভেবে-চিন্তে আগে থেকে ঠিক করে রেখেছো ?

বিস্মিত চোখে চেয়ে দেখি, বহুদিন আগেকার অন্যমনস্ক হয়ে লেখা আমার সেই চৌদ্দ দিনের ক্যাজুয়াল লিভের দরখাস্তখানা হাতে করে ঘৃণার দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছেন মহেন্দ্রবাবু। দরখাস্তখানা আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—তলে তলে

সাহেবের কাছে ছুটির দরখাস্ত করেছো, একথাটা তো আমায় জানাওনি ?

কী উত্তর দেবো, চুপ করে রইলাম। দেখলাম মুলাও সাহেব আমার দরখাস্তের পাশে ছুটি মঞ্জুর করে সই করে দিয়েছেন। মনে মনে এ বদান্যতার কারণও বুঝলাম। মুলাও বেশ ভালো রকমই জানে যে, ছুটি মঞ্জুর হলেও পাঁচ ছ' মাসের মধ্যে এখান থেকে আমি যেতে পারবো না। সমুদ্র অসম্ভব রাফ—স্টীমার চলাচল বন্ধ। অদৃষ্টের এ নির্মম পরিহাসে মুলাওের মতো আমিও মনে মনে হাসলাম। বেশ কিছুক্ষণ চুপ চাপ কাটলো। মহেন্দ্রবাবু সরকারি চিঠিপত্রগুলো পড়তে লাগলেন, আমি দরখাস্তখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম।

শান্ত সংযতকণ্ঠে মহেন্দ্রবাবু বললেন—যাক, যা হবার হয়ে গিয়েছে। শোনো ধীরাজ, যদি বাঁচতে চাও তাহলে আজ রাত্রেই তোমাকে পালাতে হবে, দেরি করলে একথা পাঁচকান হয়ে জমিদার ওয়াং থিনের কানে পৌঁছবেই। তখন শত চেষ্টা করেও তোমায় বাঁচানো যাবে না।

জিজ্ঞাসু চোখে মহেন্দ্রবাবুর দিকে চাইলাম।

বললেন—একটা বিষয়ে তোমাকে ভাগ্যবান বলতেই হবে। ছুটির দরখাস্ত এসে গেল, এদিকে এই অসময়ে স্টীমারও রেডি।

আপনা হতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—স্টীমার ? এখন ?

মহেন্দ্রবাবু বললেন—হ্যাঁ, অনেক লেখালেখি করে বাজারের দোকানদারেরা চৈত্র-সংক্রান্তির উৎসবের জন্য মালপত্র বোঝাই একখানা স্টীমার আনিয়েছিল। শুঁটকি মাছের চালান নিয়ে আজ রাত্রে সেটা চিটাগং রওনা হবে। আজই সরে পড়ো তুমি। কাল সকালে আমি সবাইকে বলবো—হঠাৎ বাবার অসুখের সংবাদ পেয়ে তুমি দু' সপ্তাহের জন্য কলকাতায় চলে গিয়েছো।

কোয়ার্টার্সে চলে এলাম। আগের দিন রাত্রে কিছুই খাইনি, সকালেও কিছু না। তবু ক্ষিদে বলে কিছুই নেই আমার। দুপুরে অনেক বলে কয়ে রমেশ ভাত খাওয়ালে, একমুঠো খেলাম। কি দিয়ে খেলাম, মনে নেই।

রমেশ বললে—আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন বাবু জিনিসপত্তোর আমিই গুছিয়ে দেবো।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙলো মেঘের ডাকে। উঠে দেখি সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে, কালবৈশাখীর মাতনের সঙ্গে শুরু হয়েছে পিটপিটে বৃষ্টি যা সহজে থামতে চায় না, অনেকক্ষণ চলে। কিছুক্ষণ বাদে কালবৈশাখী থেমে গেলেও ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি আরো জোরে এল। চোরের মতো সবার অলক্ষ্যে পালিয়ে যাবার পক্ষে উৎকৃষ্ট রাত!

রমেশ ঘরে ঢুকে স্যুটকেস-বেডিং গোছাতে লাগলো। খাকি হাফ-প্যাণ্ট, শার্ট আর কেডস-এর জুতো পরে টুপিটা হাতে নিয়ে চেয়ারটায় বসলাম। একটু পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম—হরকি, হরকি কেমন আছে রমেশ?

—ওর জ্বর আজ বিকেল থেকে বড্ডো বেড়েছে হুজুর, তু'খানা কম্বল আগাগোড়া মুড়ি দিয়েও কাঁপুনি থামছে না। এই অবস্থায় আপনার কাছে আসতে চাইছিল। বলছিল আপনার সঙ্গে নাকি ওর অনেক দরকারি কথা আছে। অনেক বুঝিয়ে তবে ঠাণ্ডা করেছি। বলেছি কাল সকালে দেখা করো।

চট করে চার দিক চেয়ে নিয়ে গলাটা খাটো করে রমেশ বললে—আপনি যে আজ চলে যাচ্ছেন একথা হরকিকে জানাইনি। ও শুনলে নির্ঘাৎ একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসতো।

মজিদ সাহেবের মতো আর একটি খাঁটি মানুষ ও দরদী বন্ধু জন্মের মতো হারালাম। আর চিন্তার সময় নেই, উঠোনে দেখলাম খালি পা, পরনে খাকি হাফ-প্যাণ্ট ও শার্ট, মাথায় ছাতার মতো বেত বা ঐ জাতীয় পাতা দিয়ে বোনা টোকা বা প্রকাণ্ড টুপি, হাতে রাইফেল নিয়ে আট ন' জন কনস্টেবল আমায় নিরাপদে স্টীমার পর্যন্ত পৌঁছে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। কোনো কথা না বলে উঠে ওদের মাঝখানে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম। মাঝখানে আমি, তু' পাশে রাইফেল হাতে ওরা। নিঃশব্দে পথ চলতে শুরু করলাম। মনে হলো আমি যেন মৃত্যুদণ্ডের আসামী! নির্জন কারাকক্ষে বসে এতোদিন চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিলাম। আজ সময় হতেই মৃত্যুদূত এসে বধ্যভূমিতে নিয়ে

এতো করেছে আজ অসময়ে এক রাশ মিথ্যের বোঝা মাথায় করে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সাহস হলো না। তার চেয়ে ওদের কাছে আমার ভীরু কাপুরুষ পরিচয়টাই বড় হয়ে থাক। সোজা স্টেশনে চলে এলাম। কলকাতার গাড়ি তখনো তিন ঘণ্টা দেরি। কি করি? কখনও বসে কখনও পায়চারি করে কাটিয়ে দিলাম সময়টা।

অবশেষে সত্যিই ট্রেন ছাড়লো—হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

নিরাপদে সুস্থ শরীরে কলকাতায় ফিরে এসেছি। বাবা মা ছোট ভাই বোন সবাই খুব খুশি। ওরা যেন জানতো আমি আসবো, তাই বিস্মিত হলো না, কোনো প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করলো না। এক দিক দিয়ে বেঁচে গেলাম। দু' বেলা খাই আর নিজের ঘরটিতে চুপ করে বসে বই পড়ি বা ঘুমোই। সন্ধ্যের পর হরিশ পার্কের নির্জন বেঞ্চির উপর চিৎ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শুয়ে থাকি। ক্রমে রাত গভীর হতে গভীরতর হয়, আমিও উঠে বাড়ি গিয়ে খেয়ে আমার নিচের ছোট ঘরটিতে শুয়ে পড়ি। এইভাবে দু' তিন দিন কাটলো। সেদিনও সময়মতো পার্ক থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে দেখি বাবা বসে আছেন। পাশে এসে বসতে বললেন। বুঝলাম কিছু বলবেন আমায়। চুপ করে পাশে বসে আছি, কিছুক্ষণ বাবার মুখে কোনো কথা নেই। তারপর স্বভাবগম্ভীর স্বরে আস্তে আস্তে বললেন—আমি ভেবে দেখলাম এ চাকরি তোমার ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

আমি নিঃসঙ্কোচে বলে ফেললাম—ছাড়বো বললেই তো আর ছাড়া যায় না। তা ছাড়া বড় সাহেব গোড়া থেকেই আমার উপর চটা। শুধু জব্দ করবার জন্যেই ও আমার রেজিগনেশন চিঠিটা চাপা দিয়ে রাখবে।

একটু ভেবে বাবা বললেন—তাহলে এক কাজ করো তুমি। মাস দুই ছুটি নেবার ব্যবস্থা করো, আমি এর মধ্যে রতিলালকে ধরে দেখি কলকাতার কাছাকাছি কোথাও বদলি করা যায় কি না।

ভেবে দেখলাম দীর্ঘ ছুটি নিয়ে অন্য কোনো জেলায় বদলি হওয়া অথবা চাকরি ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর অন্য পথ নেই। চিটাগং জেলায় আবার ফিরে যাওয়া মানে জেনে শুনে সাপের গর্তে হাত দেওয়া। তা ছাড়া ওদের কাছে মুখ দেখানোর সাহস বা মনের বল আমার ছিল না। অগত্যা প্রতিবেশী ডাক্তার সুশীল রায়ের শরণাপন্ন হলাম।

সব শুনে ডাক্তার বললে—আরে, এতে ঘাবড়াবার কি আছে। টাইফয়েড হয়েছে বলে আমি একটা সার্টিফিকেট দিচ্ছি, দু' মাসের ছুটির দরখাস্তের সঙ্গে কালই পাঠিয়ে দাও মুলাণ্ডের কাছে। বাপ বাপ বলে ছুটি দিতে পথ পাবে না।

এতো সহজেই মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় মনটা একটু হাল্কা হলো।

সে দিন সকাল থেকেই লক্ষ্য করলাম, বাবা কেমন মনমরা গম্ভীর। বিকেলের দিকে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার শরীরটা কি ভালো নেই বাবা?

উত্তর না দিয়ে কিছু সময় আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপর আমায় ডেকে নিয়ে নিচে বাইরের ঘরে বসলেন। কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাবা বললেন—ধীউবাবা, একটা ব্যাপারে তোমার কাছে আমি অপরাধী।

চমকে বাবার মুখের দিকে তাকালাম।

বাবা বললেন—আমার সেই আশৈশবের বন্ধু সহপাঠী—চ্যাটার্জি, যার কথা চিঠিতে তোমায় লিখেছিলাম, আজ সকালে তার চিঠি পেলাম।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চুপ করে বসে রইলাম।

বাবা মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলে গেলেন—লিখেছে—ভাই ললিত, ধীরাজের সঙ্গে নমিতার বিয়ে দেবার জন্য আমি প্রস্তুতই ছিলাম। এমন কি অনেকদূর এগিয়েও ছিলাম। কিন্তু কি জানো ভাই, আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাই আপত্তি করছে। বলছে—আজ স্বদেশী আন্দোলনের যুগে সামান্য একটা কনস্টেবলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে সমাজে আমি নাকি মুখ দেখাতে পারবো না। তা ছাড়া লোকের কাছে

জামাই-এর পরিচয় দিতেও মাথা কাটা যাবে। এরূপ আরও অনেক কথা। অবশেষে বাবা বললেন—ভাবছি আজীবনের বন্ধুও কেমন সহজেই মাত্র কয়েকটা কালির আঁচড়ে প্রতিশ্রুতি ধুয়ে-মুছে শেষ করে দিতে পারলে!

শেষের কথাগুলো বলবার সময় বাবার গলা ধরে এসেছিল। খানিকক্ষণ দু'জনে চুপচাপ বসে রইলাম, তারপর আস্তে-আস্তে উঠে বাবাকে প্রণাম করে বললাম—ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস হারাতে বসেছিলাম বাবা। আপনার বন্ধুর চিঠিতে আমার মস্ত উপকার হয়েছে। আজ মনে হচ্ছে ভগবান বলে একজন হয় তো আছেন। আপনি নিশ্চিন্ত হোন বাবা। আপনার কথা রাখতে বিয়ে আমি করতামই কিন্তু সে যে আমার কতো বড় শাস্তি হতো তা হয়তো আপনি বুঝতে পারবেন না। শুধু একটা অনুমতি আজ আমায় দিন। নিজের ইচ্ছে না হলে বিয়ের জন্যে কোনো দিন আমাকে আদেশ করবেন না।

অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চেয়ে বাবা বললেন—দিলাম অনুমতি।

আর একবার প্রণাম করে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

দিন দুই বাদে 'On His Majesty's Service' মার্কা খামে মুলাণ্ড সাহেবের চিঠি এসে হাজির। ছোট চিঠি, সে চিঠির মর্ম হলো—আমার টাইফয়েড অসুখের কথাটা সাহেব বিশ্বাস করেননি। তাঁর ধারণা ওটা একেবারে মিথ্যে ছুতো। লম্বা ছুটি নিয়ে কলকাতায় শুধু ফুর্তি করে কাটানোর মতলব ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি যেন অতি অবশ্য আগামী শুক্রবার বেলা ঠিক দশটার সময় মেডিকেল কলেজে উপস্থিত থাকি। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মেজর গ্রীনফীল্ড নিজে আমাকে পরীক্ষা করে দেখবেন। তিনি যদি বলেন, আমি অসুস্থ তবেই ছুটি পাবো, নইলে পরদিনই আমাকে চিটাগং রওনা হতে হবে। পরীক্ষার ফিজের টাকা গভর্নমেন্ট থেকে আগেই জমা দেওয়া হয়েছে।

মাথা ঘুরে গেল আমার। চিঠি নিয়ে দৌড়লাম ডাক্তার সুশীল রায়ের কাছে। চিঠি পড়ে তাঁরও মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

বললে—ও ধীরাজ, এ যে দেখছি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো। এখন উপায়?

বললাম—তুমি ভাই চলো আমার সঙ্গে শুক্রবার। সাহেবকে একটু বুঝিয়ে বললে হয় তো পরীক্ষা না করেই ছুটি দিয়ে দেবে।

চোখ ছুটো কপালে তুলে ডাক্তার বললে—ক্ষেপেছো? মেজর গ্রীনফীল্ড ভারী কড়া আর একরোখা মানুষ। কেউ কোনো অনুরোধ করলে ঠিক তার উল্টোটি করে বসে থাকে। তবে কিনা খামখেয়ালী ডাক্তার, হয় তো তোমার দরখাস্ত দেখে এমনিই ছুটি দিয়ে দিতে পারে।

বুঝলাম খানিকটা সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া সুশীল ডাক্তারের আর করবার কিছু নেই।

বাড়ি এসে বাবাকে সব খুলে বললাম। শুনে বাবা মা ছু'জনেই বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তা ছাড়া এ ব্যাপারে ওঁদের করবারই বা কি আছে। মনে মনে ঠিক করলাম, মুখটা অন্ততঃ মেক-আপ করে খানিকটা রোগা করবার চেষ্টা করি। যদি দৈবাৎ মুখ দেখে আর পরীক্ষা না করে ছুটিটা মঞ্জুর করে দেয়। মনে মনে বেশ জানতাম ডুবে মরবার আগে তৃণ-খণ্ড আঁকড়ে বাঁচবার চেষ্টার মতো এ-ও আমার একটা মস্ত ত্বরাশা।

মাথার এক বোঝা চুল তেল না মেখে সাবান দিয়ে রুক্ষ করে নিলাম—চিরুণীর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখলাম না। সঙ্গে সঙ্গে দাড়ি কামানো বন্ধ করে দিলাম। পরদিন সকালে আয়নায় দেখলাম, একটু রুক্ষতার আভাস দেখা দিয়েছে মাত্র, হাল ছাড়লাম না। আজ সোমবার, হাতে এখনও সময় রয়েছে চার দিন—দেখা যাক। ছু'দিন বাদে কি একটা দরকারি কাজে রাস্তা দিয়ে হাঁটছি এমন সময় বাল্যবন্ধু তারানাথ মুখার্জির সঙ্গে দেখা। ওর ডাক নাম নীলা।

আমায় দেখেই উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে—তোর কি হয়েছে রে ধীরাজ?

আশায় আনন্দে মনটা ত্বলে উঠলো। মুখখানা যথাসম্ভব কাঁচুমাচু করে চেষ্টাকৃত ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম—নীলা, আমার টাইফয়েড।

বিস্ময়ে চোখ দুটো কপালে তুলে আপাদমস্তক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে নীলা বললে—তাই নাকি? একটা কথা কখনোই ভুলিস না যে, টেকনাফে সমুদ্রের হাওয়া আর মুরগীর মাংস খেয়ে দেহটাকে করে এনেছিস একটা নিটোল খাসির মতো। ছিলিম আষ্টেক কড়া গাঁজা খেয়েও কেউ বলতে পারবে না তোর দেহে কোনো অসুখ আছে।

রেগে গেলাম, বললাম—তোর সবতাতেই বাড়াবাড়ি। ধর যদি একখানা মোটা পুরু কম্বলে গলা পর্যন্ত ঢেকে, অন্ধকারে বসে মিহি সুরে কাতরাই, তাহলে?

এবার হেসে ফেললে নীলা। বললে—ব্যাপার কি বল তো?

সব খুলে বললাম।

শুনে কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে নীলা বললে—সত্যি ভাবনার কথা। তবে এখনও দু'দিন সময় আছে, চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

বললাম—তোকে কিন্তু আমার সঙ্গে শুক্রবার মেডিকেল কলেজে যেতে হবে, কারণ একা গেলে আমি হার্টফেল করে মারা যাবো।

নীলা রাজী হয়ে গেল।

পরদিন দুপুরে খেয়ে দেয়ে শুয়ে আছি, ম্যাডান কোম্পানী (অধুনা ইন্দ্রপুরী স্টুডিও) থেকে নির্বাকযুগের বিখ্যাত পরিচালক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর সহকারী জ্যোতিষ মুখার্জি গাড়ি নিয়ে হাজির। কী ব্যাপার? মুখার্জির কাছে ব্যাপারটা যা শুনলাম তা হলো এই—নির্বাক ছবি 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র অসামান্য সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে গাঙ্গুলীমশাই দুর্গাদাস ও সীতা দেবীকে নায়ক নায়িকা নির্বাচন করে 'কাল পরিণয়' ছবিটি তুলবার সব ব্যবস্থা শেষ করে ফেলেন। হঠাৎ দুর্গাদাসবাবুর সঙ্গে ম্যাডান কোম্পানীর মতান্তর হওয়ায় দুর্গাদাসবাবু কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছেন। অগত্যা তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নায়কের ভূমিকায় মনোনীত করে সুটিং-এর দিন ঠিক করেন। আজ চারদিন ধরে সীতা দেবীকে নিয়ে সুটিং-এর জন্য সবাই স্টুডিওতে অপেক্ষা করে বসে থাকে, নায়ক তুলসীবাবুর পাত্তাই নেই।

মুখার্জি কলকাতার অলিতে গলিতে কোথাও খুঁজতে বাদ রাখেনি কিন্তু তুলসীবাবু যেন হাওয়ার সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। আজ স্টুডিওতে এসে গাঙ্গুলীমশাই ভীষণ রেগে গিয়েছেন। মুখার্জিকে বলেছেন—যাকে হোক নায়ক সাজিয়ে আজ তিনি স্যুটিং করবেনই। আমার কলকাতায় আসার খবরটা কি করে মুখার্জি জানতে পেরেছেন, নাম করতেই প্রিয়নাথবাবু রাজী হয়ে গিয়েছেন। মুখার্জি আমাকে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি নিয়ে এসেছেন, আজই দুপুরে স্যুটিং।

সব শুনে বললাম—সবই বুঝলাম ভাই। এতো বড় একটা চান্স পাওয়া ভাগ্যের কথা কিন্তু আমার যে এদিকে শিয়রে সংক্রান্তি। আমার মরণ বাঁচন কালকেই স্থির হয়ে যাবে মেডিকেল কলেজে। এক এক করে সব কথাই মুখার্জিকে বললাম।

শুনে একটু যেন নিরুৎসাহ হয়ে পড়লো মুখার্জি। তারপর বললে—তুমি বাড়িতেই আছো তো? আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ঘুরে আসছি গাঙ্গুলীমশাই-এর কাছ থেকে। যদি এক ঘণ্টার মধ্যে না আসি, জানবে হলো না, অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মুখার্জি চলে গেলে ভাবলাম এতো বড় একটা চান্স পেয়ে হারালাম। নির্বাকযুগে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার পর থেকেই সীতা দেবী অসম্ভব জনপ্রিয়। তার বিপরীতে নায়ক সাজা একটা ভাগ্যের কথা। ক্ষোভে দুঃখে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছিলো।

কিছুই করতে হলো না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই মুখার্জি এসে হাজির। বললে—চলো।

সত্যি অবাক হয়ে বললাম—চলো মানে?

মুখার্জি বললে—স্টুডিওতে গিয়ে গাঙ্গুলীমশাই-এর কাছেই সব শুনবে, চলো। মোদ্দা আজ তোমাকে দিয়ে তিনি স্যুটিং করাবেনই। তোমার কালকের অগ্নি-পরীক্ষার কথাও বলেছি। শুনে বললেন—বেশ কাল যদি বিচারে তুমি দোষী সাব্যস্ত হও এবং শনিবার দিন চট্টগ্রাম রওনা হতে হয়—তাহলে তিনি আজকের স্যুটিংটা বাতিল করে দিয়ে অন্য নায়ক ঠিক করে আবার শুরু করবেন গোড়া থেকে। মোট কথা আজ স্যুটিং করা চাই-ই চাই।

এরপর আর কথা চলে না। উপরে বাবার ঘরে গিয়ে দরজায় আস্তে আস্তে ঘা দিলাম। বাবা মা ঘুমুচ্ছিলেন। একটু পরে বাবাই উঠে দরজা খুলে দিলেন। সব কথা খুলে বললাম।

একটু চিন্তা করে বাবা বললেন—যাও তুমি। যেচে এতো বড় একটা সুযোগ এসেছে তাকে ছেড়ে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

মা ক্ষীণ একটু আপত্তি তুলেছিলেন, বাবা এক ধমকে মাকে থামিয়ে বললেন—একবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে পুলিসে ঢুকিয়ে ছেলেটার সারা জীবনটাই নষ্ট হতে বসেছে, এখনও তার জের মেটেনি। এবার নিজের ইচ্ছায় যে পথ ও বেছে নিয়েছে সে পথ ধরে স্বাধীনভাবে ওকে চলতে দাও। পরিণামে দুঃখ কষ্ট যাই পাক ও একাই তা ভোগ করবে। আমরা তো আর ভুগতে আসবো না।

নিচে থেকে মুখার্জি চেঁচামেচি শুরু করে দিলে—দেরি হয়ে যাচ্ছে, কাপড় জামা কিচ্ছু পাল্টাতে হবে না। একটা ময়লা শার্ট আর কোট থাকে তো নিয়ে এসো। তাড়াতাড়ি নেমে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

স্টুডিওতে ঢুকেই দেখি বন আলো করে খোলা চুলে বনদেবী বসে আছেন। এখানে বলে রাখি ম্যাডান স্টুডিও বলতে তখন গেট-এর সামনে রাস্তায় আম গাছের নিচে ছোট দু'খানা টিনের শেড আর টালিগঞ্জ ডিপোর গা ঘেঁষে দু'খানা ছোট কোঠা ঘর এই বোঝাতো। বাকি সবটাই ছিল জঙ্গল। পথের পাশে সেই টিনের শেডের নিচে নড়বড়ে একখানা চেয়ারে বসে আছেন নায়িকা সীতা দেবী। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে, নাম 'মিস রেনি স্মিথ'। তার পাশে আর একটা টিনের চেয়ারে বসে রয়েছেন বিরাটকায় পরিচালক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী। ময়লা কাপড় জামা পরে একগাল খোঁচা খোঁচা দাড়ি আর এক মাথা রুক্ষ চুল নিয়ে নায়িকা সীতা দেবীর সামনে দাঁড়াতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিলো। কোনো রকমে মুখ নিচু করে নমস্কার জানিয়ে গাঙ্গুলীমশাই-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন—আমি সব শুনেছি

ধীরাজ, কোনো চিন্তা নেই। ছুটি না পাও আমার একদিনের কাজ নষ্ট হবে।

একটু ইতস্তত করে গালে হাত দিয়ে বললাম—কিন্তু এই এক মুখ দাড়ি—

কথা শেষ করতে পারলাম না, হো হো করে হেসে উঠলেন গাঙ্গুলীমশাই আর মুখার্জি। শুধু কিছু বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে রইলাম আমি আর সীতা দেবী।

হাসি থামিয়ে ইংরেজিতে সীতা দেবীকে বললেন গাঙ্গুলীমশাই—কি আশ্চর্য যোগাযোগ, ডাক্তারের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য মেক-আপ করলো ধীরাজ আর সেই মেক-আপ কাজে লাগালাম আমি। আবার হেসে উঠলেন গাঙ্গুলীমশাই।

ব্যাপারটা তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি। সীতা দেবীর অবস্থাও তথৈবচ।

গাঙ্গুলীমশাই-এর পরের কথাগুলোতে ব্যাপারটা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। বললেন—গল্পের নায়ক মনীন্দ্র খুব গরীব। শুধু চেহারা আর বিদ্যার জোরে ধনী শ্বশুরের একমাত্র কন্যা কিশোরীর সঙ্গে দৈবাৎ বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের কিছুদিন পরে মনীন্দ্রের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে পড়ে। সকাল থেকে পায়ে হেঁটে চাকরির চেষ্টায় চারদিকে ঘুরে বেড়ায়, চাকরি হয় না। সারাদিন হেঁটে নিরাশ হয়ে শ্রান্ত মনীন্দ্র সন্ধ্যার পর ঘরে ফেরে, সাধ্বী স্ত্রী কিশোরী স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়। এইভাবে কিছুদিন চলে। পয়সার অভাবে মনীন্দ্রের চেহারাও হয়ে উঠেছে তদনুরূপ। মাথায় এক রাশ রুক্ষ চুল, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে ময়লা কাপড় ও জামা।

সেদিনও নিয়মিত চাকরির চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে দেখে—তার স্ত্রী ও এক বছরের শিশুপুত্র নেই। পাড়ার লোকের কাছে খবর নিয়ে জানতে পারে যে, তার শ্বশুর লোকমুখে খবর পেয়ে মেয়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও একরকম জোর করেই ওদের নিয়ে গিয়েছে। রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে মনীন্দ্র তখনই ছোটে ধনী শ্বশুরের বাড়ি।

—সিনটা হলো এই। কাজেই বুঝতে পারছো, তোমার

মেক-আপ আইডিয়াল ফর দি সিন। কিছু করতে হবে না, যেমন আছো ঐভাবেই স্যুটিং হবে। আজ শুধু আপিস পাড়ায় চাকরির চেষ্টায় ঘোরাঘুরি আর বাড়ি থেকে রেগে বেরিয়ে পথ দিয়ে হেঁটে শ্বশুর বাড়ি যাওয়া, এই পাসিংগুলো নেওয়া হবে। যতীনকে ক্যামেরা নিয়ে রেডি হতে বলো মুখুজ্জে।

অধুনা বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান যতীন দাস ছবিখানি তুলছিলেন।

সারাদিন কলকাতার পথে পথে রোদ্দুরে ঘুরে ছবি তোলা হলো। বাড়ি যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। খাওয়া দাওয়া সেরে সে রাত্রে ঘুমুতে পারলাম না। একদিকে আমার শৈশবের স্বপ্ন বহু আকাঙ্ক্ষিত সিনেমার নায়ক হাতছানি দিয়ে ডাকছে, অন্যদিকে ভ্রূকুটিকুটিল প্রতিহিংসাপরায়ণ মুলাণ্ড রিভলবার হাতে শাসাচ্ছে। হাসিকান্নার টানাপোড়েনে সারা রাত ছটফট করে কাটালাম। অবশেষে কাল রাত্রি প্রভাত হলো।

শুক্রবার। কোনো বিশেষ বার যে মনে কতোখানি ভীতির সঞ্চার করতে পারে আজকের আগে তা কোনোদিন উপলব্ধি করতে পারিনি। করবার বিশেষ কিছুই ছিল না, শুধু মোটা ময়লা কম্বল একখানা যোগাড় করে ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে বসে রইলাম। স্নান করলাম না, চুলের রুক্ষতা নষ্ট হবে বলে। আর খাওয়া? out of question। ক্ষিদে তেষ্টা ছিলই না। বেলা ঠিক ন'টায় নীলা এসে হাজির। এই চেহারায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ট্র্যামে বাসে গেলে লোকে পাগল বলে ঢিল মারবে। সুতরাং ট্যাক্সি চড়েই যাওয়া স্থির হলো। মেডিকেল কলেজে নেমে প্রিন্সিপ্যাল মেজর গ্রীনফীল্ডের রুগী দেখবার চেম্বার খুঁজে নিতে দেরি হলো না। শুনলাম, সাহেব এখনও নামেননি, ঠিক দশটা থেকে রুগী দেখবেন। আরও শুনলাম, মাত্র গতকাল সাহেব বিলেত থেকে ফিরেছেন। দু' তিনজন হাউস সার্জেন ছোকরা ডাক্তার, ঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, ওঁদেরই একজনের কাছে গিয়ে নিজের নাম বললাম।

শুনে ডাক্তারটি বললেন—জানি, আপনার কেসটাই আগে দেখা হবে। আসুন সাহেব নিচে আসবার আগেই আপনাকে

একজামিন করে ফর্মটা ফিল-আপ করে রাখি। জামা কাপড় খুলুন।

হতভম্ব হয়ে গেলাম। জামা কাপড় খুলবো কি?

চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে ছোকরা ডাক্তারটি বললেন—কম্বল, জামা খুলে ফেলুন, আপনার বুক পেট পরীক্ষা করবো।

অগত্যা ভয়ে ভয়ে গায়ে জড়ানো কম্বল শার্ট ও গেঞ্জিটা খুলে চেয়ারের হাতলের উপর রেখে দিলাম। ঘরের বাইরে ওয়েটিং রুমে নীলা বসে আছে। এ বিপদে সে কাছে থাকলেও খানিকটা সাহস পেতাম।

যথারীতি পরীক্ষা শুরু হলো। স্টেথিস্কোপ দিয়ে প্রথমে অনেকক্ষণ ধরে বুক ও পরে পিঠ পরীক্ষা হলো। জোরে জোরে পেট টিপে কি পরীক্ষা করলে ডাক্তারই জানে। তারপর ডান হাতখানা ধরে ঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নাড়ীর গতি দেখলে—সবশেষে চোখের নিচের চামড়াটা টেনে ধরে দেখে পরীক্ষা শেষ হলো। একখানা ছাপানো ফর্ম টেবিল থেকে টেনে বার করে ডাক্তার পরীক্ষার ফল লিখতে লাগলেন। দেখলাম, হার্ট থেকে শুরু করে সবগুলোই লেখা হলো—নরম্যাল, শুধু আমার ফেবারে লিখলো একটি কথা—Looks ill!

হতাশভাবে বললাম—এ রিপোর্ট দেখলে সাহেব কিছুতেই ছুটি দেবে না।

খিঁচিয়ে উঠলেন ছোকরা ডাক্তার—আপনি বলতে চান আপনার ছুটির জন্য আমি চাকরি ডিপ্লোমা সব খোয়াবো? আট বছর ধরে দু' তিনবার ফেল করে কতো কষ্টে পাশ করে ছ' মাসের জন্য হাউস সার্জেন হয়েছি। মিথ্যে রিপোর্ট লিখে দিই আর সাহেব এসে পরীক্ষা করে দেখুক আট বছরে যা কিছু শিখেছি সব ভুল। তখন আমার অবস্থাটা কি হবে বলতে পারেন?

ইতিমধ্যে আরো দুটি ছোকরা ডাক্তার কৌতূহল নিয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওদের মধ্যে একজন বললে—এটা সেই চিটাগং-এর কেস, তাই না ঘোষ?

ঘোষ মাথা নেড়ে জানালে, তাই-ই। তারপর একটু নরম সুরে বললে—কিছু মনে করবেন না ধীরাজবাবু, আপনার কেস

হোপলেস! আপনাদের এস. পি. আমাদের সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু। দেখবেন চিটাগং থেকে পারসন্যাল চিঠি কি লিখেছেন তিনি? যদিও এটা দেখানো আমার পক্ষে খুবই অন্যায় হচ্ছে, তবু ফর ইওর স্যাটিসফ্যাকশন দেখাচ্ছি।

দেখলাম টেবিলে রয়েছে একটা ফাইল, উপরেই আছে মুলাণ্ডের কাছে পাঠানো আমার ছুটির দরখাস্তখানা ডাঃ সুশীল রায়ের সার্টিফিকেটের সঙ্গে পিন দিয়ে আঁটা। তার নিচে রয়েছে ডাঃ ঘোষের পরীক্ষার ফল, সবার নিচে একখানা হলদে খাম। সেই খামখানা টেনে নিয়ে তার ভিতর থেকে একখানা টাইপ করা চিঠি বার করে ডাঃ ঘোষ আমায় পড়তে দিলেন। বহুদিনের কথা, চিঠিটা একবার মাত্র পড়েছিলাম। চিঠির ভাষা হয় তো ঠিক মনে নেই কিন্তু মুলাণ্ডের বক্তব্যটুকু আজও স্পষ্ট মনে আছে। যতোদূর মনে হয়, চিঠিটা এই—

Dear Greenfield,

A. S. I. Dhiraj Bhattacherjee of my District went on fourteen day's casual leave. At the expiry of the leave he wants to prolong it for another two months on the pretext that he is suffering from typhoid, which I doubt very much. Will you please examine him minutely and let me know the result at your earliest convenience? Your usual fees are sent herewith.

With best wishes

yours

H. B. Mulland.

যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিল তাও নিবে গেল। শুধু মাইকেল মধুসূদনের বিখ্যাত কবিতার গোড়ার লাইনটি আমার হতাশ মনের দুয়ারে বার বার ঘা দিতে লাগলো—

'আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়'—

ডাঃ ঘোষের কথা কানে এল—এইবার ব্যাপারটা সব বুঝলেন

তো ? যান, বাইরে ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসুন, সাহেব আসবার সময় হয়ে গিয়েছে।

কাঠের পুতুলের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে ওয়েটিং রুমে নীলার পাশে গিয়ে চুপ করে বসে পড়লাম।

নীলা জিজ্ঞাসা করলে—কি রে, কি হলো ?

জবাব দেবার ক্ষমতা ছিল না, চুপ করে বসেই রইলাম।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। আর্দালি এসে ডাকলো—ধীরাজ ভট্‌চাজ!

হাঁড়িকাঠে মুণ্ড গলিয়ে দেবার আগে বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে কম্বল জড়িয়ে সাহেবের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। বিরাট চেহারা, বিলেতের ঠাণ্ডা হাওয়ায় লাল মুখ আরো লাল হয়ে গিয়েছে।

সাহেবের হাতে রয়েছে আমার সেই ফাইলটা। সবার উপরে রাখা আমার ছুটির দরখাস্তখানায় একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে সেইদিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সাহেব বললে—You are Dhiraj Bhattacherjee ?

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল, একরকম জোর করেই বললাম—Yes Sir.

—You want two months leave ?

—Yes.

—If I give you three months ?

সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম, ভাবলাম সাহেব আমাকে নিয়ে বোধ হয় একটু মশকরা করছেন। কি বলি ? বুকের ভিতরে হাতুড়ি পিটছিল, ভয়ে ভয়ে বললাম—If you please, Sir.

হঠাৎ সিংহের মতো গর্জে উঠলেন সাহেব। ফাইলটা টেবিলের উপর আছড়ে ফেলে এই প্রথম আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—I don't please! Don't you require three months leave after typhoid ?

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। সাহেব কি এখনো আমাকে ঠাট্টা করছেন ? ইডিয়টের মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

দেখি সাহেবের চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে হাত মুখ নেড়ে ডাঃ ঘোষ আমাকে ইশারা করে বলছেন—বলুন ইয়েস।

আপনা হতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—Yes Sir.

টেবিল থেকে ফাইলটা টেনে নিয়ে আমার দরখাস্তটার উপরে খস খস করে সাহেব লিখলেন—Countersigned. Three months leave recommended. তারপর নিচে নাম সই করে দিয়ে ফাইলটা বন্ধ করে বললেন—Next !

তবু দাঁড়িয়ে আছি। মনেই হয়নি যে, আমার দাঁড়াবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে।

তাড়াতাড়ি ডাঃ ঘোষ আমাকে ইশারা করে বাইরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বাইরে গিয়ে ডাঃ ঘোষকে বললাম—কি হলো ডাক্তার ?

অবাক হয়ে আমার দিকে চেয়ে ডাক্তার ঘোষ বললেন—এখনও বুঝতে পারেননি ব্যাপারটা কি হলো ? খামখেয়ালী সাহেব, এসেই আপনার ফাইলটা নিয়ে শুধু দেখেছে আপনার দরখাস্তখানা। ব্যস, নিচে যে আরও চিঠিপত্তোর রয়েছে, তা দেখবার দরকারই মনে করলেন না সাহেব। আপনি সত্যিই ভাগ্যবান মশায়! এরকম কেস বড় একটা হয় না।

সংশয় তখনও রয়েছে, বললাম—কিন্তু আমি দু'মাসের ছুটি চেয়েছিলাম—সাহেব তিন মাসের দিলো কেন ?

হেসে ডাঃ ঘোষ বললেন—এইখানেই আমাদের প্রিন্সিপ্যাল সাহেব যে কতো বড় বিচক্ষণ ডাক্তার তার পরিচয় পাওয়া যায়। উনি জানেন, আপনি সত্যি টাইফয়েড থেকে ভুগে উঠেছেন। বিশ্রামের পক্ষে দু' মাস ছুটি তাই মোটেই পর্যাপ্ত নয়। অন্ততঃ তিন মাস হলে তবু খানিকটা শুধরে নিতে পারবেন।

কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল। মনে মনে সাহেবের দীর্ঘজীবন কামনা করলাম।

তারপর ঢুকে পড়লাম ওয়েটিং রুমে।

অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল নীলা। আমায় দেখে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলো—কি হলো ?

কোনো জবাব না দিয়ে ওর জামার কলারটা মুঠো করে ধরে

হিড় হিড় করে টানতে টানতে বাইরে চলে এলাম। চওড়া সিঁড়ি। দু' তিনটে ধাপ বাদ দিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেট-এর বাইরে এসে চিৎকার করে ডাকলাম—ট্যাক্সি!

ভাগ্য সেদিন আমার সত্যিই ভালো। তখনই ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। নীলাকে ঐভাবে টানতে টানতে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলাম, গাড়ি ছেড়ে দিলো।

হতভম্ব নীলা খালি জিজ্ঞাসা করেই চলেছে—ব্যাপারটা কি হলো বল?

এতোক্ষণে হুঁশ হলো। কম্বলটা গা থেকে খুলে নীলার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললাম—আমি যা বলবো, সঙ্গে সঙ্গে বলে যাবি নইলে মেরে ফেলবো। ফুসফুসের সব শক্তি দিয়ে চিৎকার করে বললাম—লঙ লিভ মেজর গ্রীনফীল্ড। নীলা তবুও চুপ করে আছে দেখে পিঠে কষিয়ে দিলাম এক কিল।

দম ফুরিয়ে যাওয়া গ্রামোফোনের মতো নীলা ভয়ে ভয়ে বলে উঠলো—হিপ হিপ হুররে!

মেডিকেল কলেজ থেকে কতোক্ষণে কিভাবে বাড়ি পৌঁছলাম কিচ্ছু মনে নেই। বাড়ি এসেই মা বাবাকে প্রণাম করে ভাগ্যের এই ডিগবাজির কথা সবিস্তারে বললাম।

শুনে বাবা বললেন—ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। ভালোই হয়েছে, তবে তুমি একটা কাজ করতে ভুলো না। খুঁচিয়ে বাঘকে ছেড়ে দেওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। হয় তাকে যেভাবে হোক শেষ করে দিতে হয়, নয় তো ওর সান্নিধ্য থেকে বহু দূরে চলে যেতে হয়। শেষেরটাই করো তুমি। কেননা, এ ব্যাপারে মুলাণ্ড আরও চটবে। তবে চোরের মার কান্না, তিন মাসের মধ্যে কিছু করতে পারবে না। সুতরাং ছুটি ফুরিয়ে যাবার আগেই রেজিগনেশন দিয়ে একটা চিঠি আর সেই সঙ্গে ডাক্তারের একটা সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিও। কারণ দেখাবে যে, টাইফয়েডের পর অ্যাকটিভ সার্ভিস করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। মনে হয়, এবার আর পুলিস বিভাগ তোমায় ধরে রাখতে পারবে না।

খানিক বাদে মুখার্জি খবর নিতে এল।

সব শুনে আমায় জড়িয়ে ধরে নাচতে শুরু করে দিলে।

বললে—বাঁচালে ভাই। গাঙ্গুলীমশাইও এ খবর শুনে খুব খুশি হবেন। তোমার পথে পথে হেঁটে বেড়ানোর মেক-আপটা স্টিল ফটোয় এতো ভালো এসেছে যে, সেগুলো বাদ দিতে হলে সত্যিই দুঃখের কথা হতো। আচ্ছা, চলি ভাই, গাঙ্গুলীমশাইকে সুখবরটা দিয়ে আসি। আর একটা কথা। কাল কোনো সুটিং রাখিনি, তোমার কি হয় না হয় ভেবেই। রবিবার সুটিং। তোমার আর সীতার একটা রোমান্টিক সিন নেওয়া হবে। কালকের মধ্যে চুল ছেঁটে দাড়ি কামিয়ে ভদ্রলোক হয়ে যেয়ো।

অনেকদিন বাদে রাত্রে পেট ভরে খেয়ে আর প্রাণ ভরে ঘুমিয়ে বাঁচলাম। আঃ!
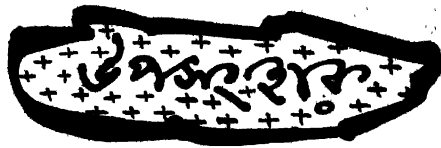
কাহিনী এখনও শেষ হয়নি, আর একটুখানি বাকি আছে।

রবিবার। সকালে ঘুম থেকে উঠে দাড়ি কামিয়ে স্নান করে খেয়ে নিতেই ন'টা বাজলো। আরশির সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিলাম, নিজের চেহারা দেখে নিজেই মোহিত হয়ে গেলাম। ভাবলাম, আজ আর হিরোইন সীতা দেবীর পাশে মুখ নিচু করে নয়, উঁচু করেই দাঁড়াতে পারবো। স্টুডিওর গাড়ি এসে গেল, বাবা মাকে প্রণাম করে নতুন কাপড় জামা পরে ফিটফাট হয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, চেনা পিওনের সঙ্গে দেখা। অভ্যাস মতো আমার কিছু আছে কিনা জিজ্ঞেস করতেই চিঠির বাণ্ডিল থেকে একখানা খাম আমার হাতে দিলে, দেখি টেকনাফের ছাপ। একটা অজানা আশঙ্কায় সমস্ত শরীর কেঁপে উঠলো। খামখানা পকেটে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলাম।

স্টুডিওয় পৌঁছে দেখি গেট-এর সামনে রাস্তায় গাঙ্গুলীমশাই পায়চারি করছেন। গাড়ি থেকে নামতেই আমার আপাদমস্তক দেখে নিলেন, তারপর খুশি হয়ে বললেন—very good। যাও ধীরাজ, তাড়াতাড়ি ভালো করে মেক-আপ করে নাও। আজ তোমার আর সীতার বিয়ের পর প্রথম লাভসিনটা নেবো। ঐটের উপরই ছবির বক্স অফিস।

মেক-আপ রুমে এসে আরশির সামনে চুপ করে বসে আছি। দু'তিনবার মনে করলাম চিঠিটা পকেট থেকে বার করে খুলে পড়ি—সাহস হলো না। নিজের মনকেই প্রশ্ন করি—কে লিখেছে? কেন লিখেছে আমায়? আমি তো টেকনাফের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছি! কোনো জবাব পাই না। আস্তে আস্তে ভেসলিনের শিশি থেকে একটুখানি নিয়ে হাতে ঘষে মুখে মাখিয়ে নিলাম। তারপর একটুখানি সবেদার সঙ্গে অল্প একটু পিউড়ি মিশিয়ে জল দিয়ে দু'হাতে ঘষে নিয়ে মুখে বেশ করে

মাখিয়ে নিলাম। আলতার শিশি থেকে আঙুলে করে একটু নিয়ে ঠোঁটে লাগালাম, খানিকটা ভুসো কালি একটা দেশলাই-এর কাঠিতে নিয়ে ভুরু আর চোখ আঁকলাম। মেক-আপ হয়ে গেল। আরশির ভিতরে 'কাল পরিণয়' ছবির নায়ক মনীন্দ্রের দিকে চেয়ে বসে আছি। আমার ভেতরের মন তিরস্কার করে উঠলো—সামান্য চিঠিটা পড়বার সাহসও তোমার হচ্ছে না? চরম কাপুরুষতার পরিচয় দিয়ে কেমন পালিয়ে আসতে পারলে! আর এতো দূরে এসেও সামান্য কয়েকটা কালির আঁচড়কে এতো ভয়? যা হয় হোক, মরীয়া হয়ে পকেট থেকে খামখানা বার করে একটা ধার ছিঁড়ে চিঠিটা বার করলাম। ছোট্ট চিঠি, বারোদিন আগের তারিখ দেওয়া। এ. এস. আই. যতীন লিখেছে টেকনাফ থানা থেকে—

"ভাই ধীরাজ—

তুমি এখান হইতে যাওয়ার দু'দিন পরেই কি ভাবে রাষ্ট্র হইয়া যায় যে, তুমি বাবার অসুখের জন্য ছুটি লইয়া যাও নাই, মাথিনকে বিবাহ করিবার ভয়ে পালাইয়া গিয়াছ। আমার দৃঢ় ধারণা সতীশই এই সর্বনাশ করিয়াছে। খবর শুনিবার পর হইতে মাথিন অন্নজল ত্যাগ করিয়া শয্যা লয়। ওর বাবা ওয়াংথিন, আমরা সবাই, এমনকি সমগ্র টেকনাফবাসীর শত চেষ্টাও ওকে জল গ্রহণ করাইতে পারে নাই। গতকল্য সকালে মাথিন মারা গিয়াছে। ওয়াংথিন পাগলের মতো হইয়া গিয়াছে। তোমার ঠিকানা জানিবার জন্য ওয়াংথিন বহু চেষ্টা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে, আমরা দিই নাই। এখন বুঝিতেছি তুমি পালাইয়া গিয়া ভালোই করিয়াছ। হরকিই যতো অনিষ্টের মূল জানিতে পারিয়া ওয়াংথিন তাহাকে মারিয়া আধমরা করিয়াছে। প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলেও অনেক দিনের জন্য বিশ্রাম লইতে হইবে। মহেন্দ্রবাবু বদলি হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার স্থলে মিঃ ভৌমিক আসিয়াছেন। আমরা ভালো আছি, তুমি—।"

আমি ভালো আছি, খুব ভালো আছি।

আর দরকার নেই, পড়বার প্রয়োজন আমার ঐ একটি লাইনেই ফুরিয়ে গিয়েছে—'গতকল্য সকালে মাথিন মারা গিয়াছে।' আমার অভিশপ্ত ভাগ্যের সামান্য ছোঁয়াচ লেগেই দুটো অমূল্য জীবন নষ্ট হয়ে গেল। মাথিন আর হরকি। কিন্তু আমার তো ভালো হলো! কন্দর্পকান্তি তরুণ সিনেমার নায়ক! আরশির ভিতরের মানুষটার দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলাম।

বোধ হয় অনেকক্ষণ বসে ছিলাম, সময়ের হিসাব ছিল না। হন্তদন্ত হয়ে গাঙ্গুলীমশাই এসে হাজির।—এতো দেরি হচ্ছে কেন? এই যে মেক-আপ হয়ে গিয়েছে দেখছি। শীগগির এসো ধীরাজ, রোদ্দুর চলে যাচ্ছে।

আস্তে আস্তে উঠে গাঙ্গুলীমশাই-এর পা দুটো জড়িয়ে ধরে বললাম—আপনি আমার বাবার বয়সী, আজ আমায় ক্ষমা করুন। আমি আজ কিছুতেই লাভসিন করতে পারবো না, শুধু আজকের দিনটা আমায় ছেড়ে দিন। কাল পরশু যেদিন বলবেন।

একবার আমার মুখের দিকে একবার হাতের মুঠোয় দলা পাকানো চিঠিটার দিকে চেয়ে কি ভাবলেন যেন গাঙ্গুলীমশাই, তারপর বললেন—তার জন্যে তুমি এতো কুণ্ঠিত হচ্ছো কেন ধীরাজ। আজ আমি সীতার ক্লোজ-আপগুলো নিয়ে সুটিং প্যাক-আপ্ করে দিচ্ছি—পরে সুবিধামতো সিনটা নিলেই চলবে। তুমি মেক-আপ তুলে বাড়ি চলে যাও, আমি মুখুজ্জেকে দিয়ে গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মেক-আপ? মনেই ছিল না, হঠাৎ মনে হলো আমার সারা জীবনটাই শুধু মেক-আপ—এমন কি মাথিনকে ভালোবাসাটাও মেক-আপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আরশির সামনে বসে নারকেল তেলের শিশি থেকে খানিকটা তেল হাতে ঢেলে নিয়ে জবজবে করে মুখে মাখিয়ে নিলাম। পুরু একখানা তোয়ালে দিয়ে ঘষে রঙ তুলতে যাচ্ছি, আরশির ভিতর দেখলাম ঘরে ঢুকলো সীতা দেবী। কোনো রকম ভূমিকা না করে আমার দিকে চেয়ে ভাঙা বাংলায় বললেন—ধীরাজ, গাঙ্গুলীমশাই বললেন তুমি নাকি খুব নার্ভাস হয়ে গিয়েছো ব্যাপার কী?

জবাব না দিয়ে রঙ তুলতে লাগলাম। খিল খিল করে হেসে

উঠলো সীতা, তারপর বললে—মুখার্জি বলছিল চিটাগং-এ তুমি অনেক অ্যাডভেঞ্চার করে এসেছো, একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে এতো ভয় ?

গাড়ি রেডি হয়েছে খবরটা দিতে মুখার্জি ঘরে ঢুকলো। সীতা বললে—মুখার্জি, এমন একটা কাওয়ার্ড স্বামী জুটিয়ে দিয়েছো, প্রেম করা দূরের কথা, কথাই কইছে না আমার সঙ্গে। আবার সেই দুষ্টুমি ভরা হাসি। গাড়ির খবরটা দিয়ে মুখার্জি তাড়াতাড়ি সীতাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তা তো গেল, কিন্তু ঘরময় ছড়িয়ে দিয়ে গেল ঐ বিষাক্ত কথাটা —কাওয়ার্ড। ঘরের দেয়াল থেকে দেয়ালে রিবাউণ্ড করে আমার চার পাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো একটি মাত্র কথা—কাওয়ার্ড! কাওয়ার্ড!! কাওয়ার্ড!!!

হঠাৎ মনে হলো আরশিতে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। রাগ হলো মেক-আপ ম্যানের উপর। ধুলো জমেছে, একটু পরিষ্কার করে রাখতেও পারে না ? আন্দাজে মুখে তোয়ালে ঘষেই চলেছি।

কাওয়ার্ড! মাথিন মরবার আগে জেনে গিয়েছে আমি কাওয়ার্ড! মৃত্যুশয্যায় শুয়ে হরকি শুধু বলছে ঐ একটি কথা— কাওয়ার্ড! কোতোয়ালির হেমদা, রাখালদা এমন কি মুলাগু দম্পতি পর্যন্ত আমার প্রসঙ্গে ঐ একটি কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারছে না—কাওয়ার্ড!

পুলিস লাইন ছেড়ে নতুন জীবনের পথে পা বাড়ালাম— এখানেও ঐ অভিশপ্ত কথা আমার পিছু ছাড়লো না। আজ গাঙ্গুলীমশাই, সীতা দেবী, মুখুজ্জে, এদের সবার কাছে আমার একমাত্র পরিচয় হলো—কাওয়ার্ড!

সবেদা আর পিউড়ি মেশানো রঙ, সামান্য একটু নারকেল তেল দিয়ে দু'বার ঘষলেই উঠে যায়। আমি কিন্তু মুখে তোয়ালে ঘষেই চলেছি। মানুষের চামড়া হলে এতোক্ষণ ছাল চামড়া উঠে যেতো কিন্তু এক ফোঁটা রক্তও পড়লো না। গণ্ডারের চামড়া কিনা!